অরুন্ধতী

ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীসুখেন্দুবিকাশ মজুমদার,
৫৪-১ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

শ্রীরামনবমী
চৈত্র—১৩৪০

প্রিণ্টার—শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায়
শ্রীকালী প্রেস
২১ নং রাজা লেন, কলিকাতা

দু' টাকা

সোদরপ্রতিম বন্ধু

শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে

দিলাম

অরুন্ধতী

এক

বগলে একখানা মোটা বাঁধানো খাতা, হাতে একগাছা বাঁশের লাঠি, প্রতাপচাঁদ বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে—দেশের কাজ করতে।

মা ডাক্‌লেন—পিতু!

প্রতাপ কট্‌মট্‌ করে' চেয়ে রুক্ষস্বরে বলে উঠ্‌লো—পিতু···কেন? দয়া করে' পেছু ডাকলে কি জন্যে শুনি?···একটা শুভকাজে বেরুচ্ছি, ছিঃ! আক্কেল বলে' কোন কিছুর সঙ্গে যদি তোমার পরিচয় হয়ে থাকে মা!···এখন বলে ফেল—কি তোমার মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে!

মা ভয়ে ভয়ে বল্‌লেন—যেখানে যাচ্ছিস্‌, সফল হয়ে ফিরিস্‌ বাবা! মা পেছু ডাক্‌লে কোনো দোষ হয় না। কিন্তু একটু সকাল-সকাল বাড়ী ফিরিস্‌ পিতু! রাত বারোটা-একটা করিস্‌নি। আমার একা থাক্‌তে ভয় করে। পাশের বাড়ীর মেয়েটা মারা যাওয়ার পর থেকে, খালি গা ছম্‌ ছম্‌ করে, একলা বাইরে বেরুলেই মনে হয়, ছুঁড়ীটা যেন ডাক্‌ছে —কাকীমা! জ্বলে পুড়ে গেল—বাঁচাও আমাকে!···আহা, হতভাগীর কি কষ্টই না হয়েছিল!

প্রতাপচাঁদ দুটি চক্ষু বিস্ফারিত করে' চাইতে চাইতে বল্লে—এ যে প্রকাণ্ড একখানা প্লট্ সুরু করেছ মা!...পাশের বাড়ীর ছুঁড়ী...গা ছম্ ছম্...জ্বলে পুড়ে গেল—এ সব কী কথা? এ কি নভেল তৈরী হবে নাকি? কোন্ ছুঁড়ি আবার মারা গেল?

মা গালে হাত দিয়ে বিস্ময়ের ভাব দেখালেন। তারপর বল্লেন—তোরই বা দোষ কি বাবা, দেশের কাজ যারা করে, তারাই ঘরের কাজ ভুলে যায়। হাঁ রে, দেশ উদ্ধার করবি তোরা এই করে'? কেন নীলু ঠাকুরপোর বড় মেয়ে চাঁপি, পরশু দিন কেরোসিন্ জ্বেলে পুড়ে মরেছে—তা শুনিস্‌নি?

প্রতাপ হাতের লাঠিগাছটা দরজার পাশেই রেখে দিয়ে, বগলের খাতাখানা বের করে' ফাউণ্টেন্ পেন্ দিয়ে খচ্ খচ্ করে' কি সব লিখ্‌তে লাগলো। এবং লিখ্‌তে লিখ্‌তে জিজ্ঞাসা করলে—কি জন্যে ম'লো? হিষ্টিরিয়া?—না স্বামীর সঙ্গে বনিবনাও হ'ত না?...তারপর আপন মনেই বল্‌তে লাগ্‌লো—আজকের মিটিংয়েই কথা তুলবো। এই পাজী মদের দোকানগুলোই আমাদের উচ্ছন্নে দিচ্ছে। দস্তুর মত পিকেটিং দরকার।...লেখা চল্‌ছে বেশ জোরে জোরে।...তারপর আবার ব'ললে—'ডেলি-পেপারে' এক্ষুণি চিঠি পাঠাবো। কাল্‌কের কাগজে বেরিয়ে যাবে।—

মা অবাক্ হয়ে' ছেলের দেশ ও সমাজ-হিতৈষীতার বুলি শুন্‌ছিলেন।

প্রতাপ বল্লে—পাজীটাকে আচ্ছা ক'রে জুতো মারলেও রাগ যায় না। সে শূয়ারটা করে কি?

মা ব'ললেন—কোন্ শূয়ার ?

প্রতাপ বিরক্ত হয়ে ব'ললে—না:, টাইম্ নেই মা ! তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর।—শূয়ারটা সেই মেয়েটার স্বামী,—যে কেরোসিনে পুড়ে' ম'লো তার—

মা গালে হাত দিয়ে ব'লে উঠলেন—ওঃ···হ্যাঁ বাবা, প্রতাপচাঁদ ! তোমাদের স্বদেশী মানে বুঝি কেবলি বিদেশীর চচ্চড়ি ?···এই পাশের বাড়ীর নীলু ঠাকুরপোকেও তুই ভুলে গেছিস্ পিতু ? তার মেয়ে চাঁপাকে তোর মনে পড়ে না ? তার আবার বিয়ে হল কবে যে, স্বামী শূয়ারটাকে ধরে' জুতো-পেটা করবি ?

—তবে চাঁপার মৃত্যুর কারণ ?

—কারণ—বিয়ে না হওয়া। গরীব বাপ, মেয়ের জন্যে বর খুঁজে খুঁজে বিরক্ত হয়ে একদিন দুঃখু করে' বলেছিল—দেশের লোকেরাই দেশের দুঃখু বুঝ্লে না, তারা আবার বিদেশীর কাছে চাওয়ার দাবী করে। মেয়ে হ'ল হ'ল, কিন্তু বেঁচে রইলো কেন ?···আহা সেয়ানা মেয়ে, দু' কলম লেখাপড়াও জানতো···মনের দুঃখে—

প্রতাপ হো-হো করে হেসে উঠ্লো। বল্লে—মনের দুঃখে—অমনি কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে ঘরের মধ্যে আগুন ধরালে বুঝি !···ও-সব কাজের কথা নয় মা !—ফ্যাসান ফ্যাসান ! আজকালকের আইবুড়ো মেয়েগুলোর ও একটা মরবার ফ্যাসান্।···বিয়ে হয় না, কে বললে বিয়ে হয় না ? এই স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে, সভ্য ভব্য সুন্দরী মেয়ে হলে, সে তো পাঁচজনে আদর করে নেবে।

মা নীরব হয়ে পুত্রের মুখপানে চাইতে লাগ্লেন। হা-রে অবুঝ

সন্তান! কড়িকাঠ ছুঁতেই হাঁপিয়ে উঠিস—আকাশের চাঁদ ধরবি তুই কোন্ শক্তি দিয়ে?···

প্রতাপ আর দাঁড়িয়ে রইলো না। যাবার সময় বলে গেল—কিছু ভয় নেই মা! ভূত বলে কোন জিনিস নেই, ও-সব কল্পলোকের কথা।···

প্রতাপ হন্ হন্ করে হাঁটতে হাঁটতে যে রাস্তায় এসে থামলো,—তার নাম চাঁপাতলার ছুতোর-পাড়া গলি। সমিতির অন্যতম মেম্বর হরলালের সঙ্গে দেখা হতেই, জিজ্ঞাসা করলে—কি হে, নতুন খবর কিছু আছে? তোমাদের পাড়ায় একটা নতুন ক্লাব হয়েচে নাকি?···তারা শুনলাম 'নরনারায়ণ' প্লে করবে? সত্যি নাকি হে? কর্ণ যে করছে সে নাকি শিশির বাবুর প্রিয় শিষ্য?

হরলাল বিরক্ত হয়ে বললে—দুঃত্তোর প্রিয় শিষ্য; ভালো লাগে না ভাই। যত সব রাজে-কাজে মাথা ঘামানো···ও আমি পছন্দ করিনে। ···মেজাজটা খিঁচড়ে রয়েছে—

প্রতাপ ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে প্রশ্ন করলে—কেন, তোমার আবার হল কি?···আজকের মিটিংয়ে যাচ্ছো তো?

হরলাল বললে—না ভাই। আজ আমার সময় হবে না। পাড়ায় একটা ট্র্যাজিডি হয়ে গেছে কাল। মন খুব খারাপ আছে।

—কি রকম?

হরলাল বল্‌লে—রকম-বেরকম বুঝি না প্রতাপ। মোট কথা,

তোমাদের দেশ-সেবা আর স্বরাজ আদায় করা,—এগুলোর চিন্তার চেয়েও বড় চিন্তা আমাদের আছে। স্বরাজ আদায় করবে দেশ-সেবা করবে, কিন্তু সমাজ যে ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে কঙ্কালসার হয়ে সারা হল!···কাল যা কাণ্ড দেখ্‌লাম···ছ্যা ছ্যা, এই সাহসের আমরা বড়াই করি!···আঠারো বছরের মেয়ে, বিয়ে হচ্ছে, হয়েও গেছে; কিন্তু বর হতভাগা রাত তিনটের আমলে বাসর থেকে পালিয়ে গিয়ে, তার বন্ধু-মহলে প্রচার করেছে,—ক'নে নাকি পাঁচমাস অন্তঃসত্ত্বা!

অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে প্রতাপচাঁদ ব'লে উঠলো—ন্যুইসেন্‌স্‌। তারপর? কিন্তু ঘটনা সত্যি নাকি হে?

—শুন্‌লাম···কিন্তু নাঃ, ধরো সত্যিই! কিন্তু তার জন্যে দায়ী কে? বাপের পয়সা নেই, সময়ে বে' দিতে পারেনি। মেয়ের ধৈর্য্য বা মানসিক বল নেই, ইন্দ্রিয়কে শাসনে রাখতে পারেনি।

—কেন পারেনি? তার পারা উচিত ছিল। ভারতবর্ষের মেয়ে, তার সহিষ্ণুতাই ধর্ম্ম। তা ছাড়া মেয়েমানুষ যে—সহ্য করতে তাকে হবেই,···সে বাধ্য।

হরলাল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে—হ্যাঁ, লক্ষবার বাধ্য! দোজবরে মাতালের হাতে পড়লেও, তাকে জেনে রাখতে হবে—সে ভারতবর্ষের মেয়ে।··· কিন্তু মেয়ের বাপের কি দোষ ভাই? তাকে কেন সমাজশুদ্ধ লোক 'ছি-ছি' করতে লাগলো?

গম্ভীর হয়ে প্রতাপ বললে—তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার ক্রটী ছিল হরলাল।··· এবার থেকে আমরা মেয়েদের বাপের কাছে পিকেটিং চালাবো,—যাতে দেশের মধ্যে আর এই সব অবৈধ প্রকার নতুন সৃষ্টি না হতে পারে।

হরলাল বললে—সেই যে পাখীওয়ালার পাখীটা বাঁধা-বুলি শিখে রেখেছিল—'তাতে আর সন্দেহ নেই!' তোমাদেরও কি সেই রকম শিক্ষা হয়েছে?…পিকেটীং…না হয় কাগজে লিখবো—না হয় লেক্‌চারে বলবো। নিজের হাতে কাজ না করে' চোখ বুজে "হরি হরি" বললে কি হরিঠাকুর ভাতের থালাখানা মুখে ধরবেন? কাজ চাই ভায়া! সকল দিকেই একটা বাঁধা-ধরা হিসেব আছে। এই যে বর পালিয়ে গেল, দুর্নামে পাড়া ছেয়ে উঠলো, বিদ্রূপ-গঞ্জনা সইতে না পেরে মেয়েটাকেও বিষ খেয়ে মেডিকেল কলেজে যেতে হ'ল—

একান্ত বিস্ময়ে প্রতাপচাঁদ অস্ফুট চীৎকার করে বললে—বিষ খেলে! তারপর মেডিকেল কলেজ?…হ্যাঁ তা যেতে হবে বই কি। কিন্তু বেঁচে গেছে তো?

—নিশ্চয়। না বাঁচলে কি ওর বাঁচোয়া ছিল? শুনলে তুমি আশ্চর্য্য হবে পিতু! বাপটাই চুপি চুপি ডাক্তারকে বলেছিল—'ও যদি মরে, তাহলে আমি বাঁচি।'

—ঠিকই বলেছে; বাঁচলে—দেশেরই অকল্যাণ হ'ত। ব্যভিচার চলতো, বেশ্যার সংখ্যা বাড়তো। তাহলে ম'রে বেঁচেছে—কি বল?

বলেই প্রতাপ হো-হো শব্দে হাসি সুরু করলে।…তারপর বললে—আমাদের পাড়াতেও এক ছুঁড়ী কেরোসিন তেলে জয়যাত্রা করেছে। বাঃ…ফার্ষ্ট ক্লাস লেডি-ভলাণ্টিয়ার তো!—মৃত্যু-স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী।—এবারকার কংগ্রেসই ছোঁয়াচ দিয়ে গেছে।…যাক্‌, তুমি চলেছ কোথা?

হরলাল বিরক্ত হচ্ছিল। প্রতাপচাঁদের অনাবশ্যক চাঞ্চল্য এবং

দেশহিতৈষীতার ভণিতা তার ভাল লাগছিল না। তবু জানালে—যাচ্ছি সেই মেয়েটির বাপের কাছে। আমার বাবার কাছে বসতবাড়ী বন্ধক রেখে পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছিল—ওই বিয়ের জন্যে। বাবার বাক্স ভেঙে সেই বন্ধকী দলিলখানা চুরি করে তাকে ফেরৎ দিতে যাচ্ছি।… দেশের কাজ পরে করবো ভাই। আগে পাড়ার কাজগুলো কিছু কিছু শেষ করে নিই।

হরলাল আর দাঁড়ালো না। বিপরীত পথ ধরে চলে গেল।…

'দেশোদ্ধারকারিণী-সমিতি'র একটা আড্ডাঘর-ছিল। প্রতাপ দ্রুত সেই দিকে পা বাড়িয়ে দিলে। আজ রাত্রি আটটায় মিটিং বস্‌বে। তাতে বিস্তর রকম কাজের কথার আলোচনা হবে। সুতরাং দেশসেবক, সমিতি-প্রেমিক প্রতাপচাঁদের তিলার্দ্ধ অবকাশ ছিল না।

'দেশোদ্ধারকারিণী-সভা'র অধিবেশন সুরু হয়েচে।

সেক্রেটারী মশায় খাতা খুলে বললেন—তিন নম্বর 'আইটেম্' বাদ দিচ্ছি তাহলে। ক্যাশে মাত্র পাঁচশো টাকা আছে। ক্লাবের ঘরখানায় অন্ততঃ গোটা দুই ফ্যান্ ফিট্ না কর্‌লে, গরমে কাজ চলবে না। তা ছাড়া একখানা বড় গোল-টেবিল কিন্‌তে হবে। খাতাপত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ; ভাল দেখে একটা গ্লাস্-আলমারী আনানো চাই। এতগুলো

মোটা খরচ চালিয়ে, দেড়শো টাকা কি দুশো টাকা থাকে কি না সন্দেহ। সুতরাং নৈশবিদ্যালয়ে সাহায্য দান আপাততঃ বন্ধ রাখা হোক।—বলেই উপস্থিত সভ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাদের কি মত ?…ও হো, ভুলে যাচ্ছি, এ ছাড়া দরকারী খরচ আরো আছে,—স্পোর্টিং ক্লাবকে শত্খানেক দিতে হবে। ক্যারম-কম্পিটিসানে—সে-ও বড় কম খরচ হবে না।

সভ্যগণ সমস্বরে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, ও সব নাইট্ ইস্কুল-ফিস্কুল এখন ধামা-চাপা থাক্। আগে 'কম্পাল্সারি,' তার পর 'অপশোনাল'।

কোষাধ্যক্ষ প্রতাপচাঁদ তখন ড্রয়ার খুলে ক্যাশ মিলিয়ে নিচ্ছিল। একখানা দশটাকার নোট বের করে দিয়ে বললে—আজ কি হবে ? রুটী-মাংস—না সন্দেশ-রসগোল্লা ?

একজন বললে—সব-আগে দু'প্যাকেট্ 'কাঁচি' আনাও বাবা ! নির্ধূম নিরিমিষ্যি সভা কি জমে কখনো ?

এমনি সময় হরলাল উপস্থিত হ'ল।

প্রতাপ উপহাসের ভঙ্গিতে ব'ল্লে—আস্তে আজ্ঞা হোক্ !…তারপর তোমার পাড়ার কাজ মিটে গেছে, হরলাল ?…বল্তে বলতে সমাগত সভ্যদের কাছে ব্যাপারটা দু'চার কথায় একটুখানি খোলসা করে' বুঝিয়ে দিতেই, সকলের উচ্চ হাসি হরলালকে আচ্ছন্ন ও উত্তপ্ত করে তুল্লে।

হরলাল ব'লে উঠ্লো—তোমাদের খাতা থেকে আমার নাম কেটে দাও ! আমি বক-ধার্ম্মিক হয়ে নাম কিন্বার সখ পুষ্তে চাইনে।

সেক্রেটারী মশায় স্মিতমুখে বললেন—চ'টে যাচ্ছো কেন হে ? প্রতাপ মন্দ কথা তো বলে নি ! বড় কাজ পায়ে ঠেলে, খুচরো কাজে সময়

মাটী করা—এ কি বুদ্ধিমানের কর্তব্য ? তোমরা সব শিল্পী মানুষ, অতকাল ইটালিতে বাস করে, পাথরের মূর্ত্তি গড়া শিখে এলে, আর মানুষের মূর্ত্তিটা-কেই স্বেচ্ছায় বিকৃত করে তুল্ছো আজ ? অন্ততঃ তোমার কিন্তু এটা উচিত হচ্ছে না। এখন দেশের ঘোর দুর্দ্দিন, অন্ধ দেশবাসীদের হাতে ধরে' আলোর রাজ্যে নিয়ে যেতে হবে। তুচ্ছ পাড়া-প্রতিবেশীর বিপদ-সম্পদ নিয়ে মেতে থাক্লে কি আমাদের চলে ভাই ?

হরলাল গম্ভীর কণ্ঠে ব'লে উঠ্লো—আপনাদের না চলুক মশায়, কিন্তু আমার চল্বে। আমি যেমন করে পারি,—চালাবো। মাস-মাস পঞ্চাশ টাকা করে' সমিতির চাঁদা দিই, এ টাকা আমি অন্য কাজে খরচা করবো।

সেক্রেটারী মহা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সমিতির সভ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে হরলালই মোটা চাঁদা দেয়। তিনি হরলালকে কাছে টেনে এনে, মিষ্টস্বরে বললেন—হঠাৎ এই দীন সমিতিটার ওপর আজ চটে উঠ্লে কেন ভায়া ? তোমরাই তো এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রেছিলে—

হরলাল বিরক্ত হ'য়ে বললে—যান্ যান্ মশায় ! ওসব ভণ্ডামি আর আমার কাছে চলবে না। সকালবেলায় যে বুড়ো বামুনটিকে পাঠিয়ে-ছিলাম, তাকে এতটুকু একটু আশার কথাও দিতে পারেন নি, অথচ আপনারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবেন !

সেক্রেটারী বললেন—কন্যাদায়গ্রস্ত সেই ব্রাহ্মণ ? হরলাল, তুমি একটি আস্ত পাগল। জিজ্ঞেস্ কোরো দেখি সেই বামুনকে—তার বিয়ে হয়েচে কি না। ওহে, অমনধারা গলে' গেলে কাজ চলে না। পাথর হতে হবে—লোহা হতে হবে।···চারধারে অশ্রুর বান্ ডেকে গেছে,—

হাহাকার-ভরা এই দেশের জন্য কাঁদার মত করে' ক'জন কাঁদচে বল তো ?

হরলাল আর সাম্‌লাতে পারলে না। ব'লে উঠ্‌লো—আপনারা সব পয়লা নম্বরের হিপোক্রিট্। আমাদেরই পাড়ায় থাকে, তাঁর মেয়েটিকে দু'বেলা দেখছি, অথচ দিব্যি হাসতে হাসতে আপনি বলে বস্‌লেন, বামুনটার বিয়েই হয়নি !—কাটুন কাটুন, এক্ষুণি আমার নাম কেটে দিন মশায় ! আমি বিদায় নিচ্ছি।···

ইতিমধ্যে জলযোগের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। খাবারের ডিস্‌খানা হরলালের সুমুখে এগিয়ে দিয়ে প্রতাপচাঁদ বললে—আত্মাকে তৃপ্ত করো, ভায়া ! তোমার তৃপ্তিতে আজ বুভুক্ষু বিশ্বাত্মার তৃপ্তি-সাধন হোক্ ! বাবা ! কী এক-রোখা ছেলে তুমি !

হরলাল ডিস্‌টা এমন জোরে টেবিলটার মাঝখান দিয়ে ঠেলে দিলে য, গোটাদুই রসগোল্লা ঠিক্‌রে মেজের 'পড়ে গেল। বল্‌লে—নেই যাও তা···

প্রতাপ হেসে উঠলো।

সেক্রেটারী মশায় গম্ভীর হয়ে গেলেন।

প্রতাপ বললে—ওহে ভায়া ! আজ এই সমাগত বন্ধু ভদ্রমণ্ডলীর সমুখে, আমি শপথ করলাম—সে মেয়ের যাতে ভালো ঘরে বিয়ে হয়, আমি তার জন্যে দায়ী থাক্‌চি। আমার পাড়াতেই একটি ভালো ছেলে আছে। যেন-তেন করে' যে-কোন আফিসে বিশ-পঁচিশ টাকার একটা চাকরী যোগাড় করে দিয়ো, তাহলে এক পয়সাও তাকে দিতে হবে না। বেচারী চাক্‌রীর কাঙাল। মূর্খ নয়,—বি-এ পর্য্যন্ত পড়েচে। কলকাতা

সহরে ছোট-খাটো একটা বাড়ীও আছে, ভাড়ার বাড়ীতেও বাস করে না। এখানকার স্থায়ী অধিবাসী।

হরলালের মনটা নুয়ে পড়লো। বললে—সত্যি কথা? দেবে ঠিক-ঠাক্ করে?

প্রতাপ বললে—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ, দেব। শপথ করছি। কিন্তু মেয়ে ভালো হওয়া চাই। সুশ্রী আর স্বাস্থ্যবতী,—এ না হলে চ'লবে না। ছেলেটির দুনিয়ায় কেউ বেঁচে নেই। একাই রাঁধে-বাড়ে, খায়-দায়, আর চাক্‌রী চাক্‌রী করে' ঘুরে মরে।

হরলাল জিজ্ঞাসা কর্‌লে—রাঁধে-বাড়ে খায়-দায়,—কিন্তু কেমন করে' খায়? চাক্‌রী নেই ব'লছো, অথচ খাওয়াটা চলে কি করে?

প্রতাপ বললে—ওঃ···তুমি সত্যিই পাগল! কেন, বাড়ীখানার আধা-আধি ভাড়া দিয়ে রেখেচে, তার টাকা পায় না?···

তিন

বেচারি ছা-পোষা গরীব বামুনের চতুর্থ কন্যা অরুন্ধতীর শুভ বিবাহের দিন স্থির হ'য়েচে —ফাল্গুনের ২২শে। হরলালের ঐকান্তিক চেষ্টায়, সমিতির কোষাধ্যক্ষ প্রতাপচাঁদই এ-বিয়ের ঘটকালী করেছে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন বিকেলের ঝোঁকে, পাত্র বাবাজীর ইচ্ছা হল—ভাবি পত্নীর মুখ-সন্দর্শন করবেন। প্রতাপচাঁদকে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে' বল্‌তেই, সে সাদরে ক'নের বাড়ীতে বরকে নিয়ে এলো।

বরের সুমুখে ক’নে এসে বস্‌লো।

বর জিজ্ঞাসা করলে—তোমার নাম কি ?

ক’নে পরিষ্কার কণ্ঠে জবাব দিলে—শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী।

বর অনেকক্ষণ চেয়ে-চেয়ে হঠাৎ ব’লে উঠ্‌লো—নাম রাখা ঠিক হয়নি কিন্তু। তোমার নাম রাখা উচিত ছিল—শ্যামাসুন্দরী।···বাপ! একি ভদ্র-ঘরের মেয়ে!

প্রতাপচাঁদ হো-হো ক’রে হেসে উঠ্‌লো।

বর ব’ললে—চলুন মশায়! ঢের হয়েচে। ভাগ্যিস দেখতে চেয়েছিলাম। সারা জীবনটাই পেত্নী ঘাড়ে নিয়ে ভোগান্তির একশেষ হত।···

তারপর আর সে বাড়ীতে দাঁড়ালো না। প্রতাপও যেতে যেতে বলে গেল—আরে ছ্যা ছ্যা, হরলালটা কানা না ঘুষখোর!···এ মেয়ের বিয়ে দিতে যাওয়া—আস্পদ্ধার কথা বটে!···

অরুন্ধতীর মা-বাপ তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। হায়রে অদৃষ্ট!—অরুন্ধতীর নাম শ্যামাসুন্দরী!···

অরুন্ধতী মনে মনে ভাবছিল—তাদের আরসীখানা কি সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে!···

২২শে তারিখে দিন হয়ে ১৯শে বিয়ে ভেঙে গেল।

হরলাল ২০শে রাত্রিতে তার বাপের সিন্দুক থেকে প্রায় হাজার দুই টাকা চুরি করে’ পরদিন টেলিগ্রাফ্‌-পোষ্টে, পার্কের গাছের গুঁড়িতে, লাইব্রেরীর নোটিস্‌-বোর্ডে বিজ্ঞাপন এঁটে দিলে—“সচ্চরিত্র সদ্বংশজাত পাত্র চাই। সাধ্যমত পণ দেওয়া হইবে।”···

আশ্চর্য্য ব্যাপার!—সেদিনের সেই বাবুটিই আবার হাসিমুখে ফিরে

এসে ব'ললে—আমিই রাজী আছি মশায়! কিন্তু দু'হাজার নগদ চাই। তা ছাড়া দান-সামগ্রী চেন্-ঘড়ি-আঙ্টী—এ-সব তো আছেই।

হরলাল একবার সুমুখের পথটা ভালো করে দেখে নিলে। তারপর হঠাৎ পায়ের চটি জুতোটা খুলেই, পটাপট্ পটাপট্ এম্নি ঘা কতক হবু-বর মশায়ের মাথায় আর পিঠে বসিয়ে দিলে, যার জ্বালায় জ্বল্তে জ্বল্তে, অন্ততঃ বছর খানেকের মত প্রজাপতির দোর-গোড়া মাড়াতে তার ভরসা রইলো না।

হরলাল মনে মনে ব'ললে—ব্যাটা ছুঁচো কোথাকার!···ছি, ছি, দেশের আর সমাজের এই লোক! এরা চায় সাম্য, একতা, উন্নতি, স্বাধীনতা!···

সন্ধ্যার সময় হরলালের বাবা, গম্ভীর কণ্ঠে ডাক দিলেন—হরা!···

—আজ্ঞে—

—আমার সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করলি—কার হুকুমে?

—আমার নিজেরই হুকুমে বাবা।

—মরণ-পাখা উঠেচে—না?···তেজ্যপুত্তুর করবো জানিস্?···টাকা ফিরিয়ে দে।

হরলাল মাথা হেঁট করে বললে—দিচ্ছি বাবা। কিন্তু তার আগে, আমায় বলতে হবে—এ-খবর আপনি কা'র কাছে পেলেন?

—তোদের ঐ সমিতির ছোঁড়ারা বলে গেছে। ওঃ···ছেলে আমার দাতার শিরোমণি—দাতাকর্ণ হয়ে গেছেন! বামুনের কন্যাদায় উদ্ধার করবেন!···ব্যাটা, তোর বাপের কন্যাদায় ক'ব্যাটায় উদ্ধার করে' গেছে শুনি? টাকা নিয়ে আয়! আমি গুছিয়ে তুলে রাখবো।

হরলাল এবার গম্ভীর হ'য়ে বললে—সে সব খরচা হয়ে গেছে বাবা !···
কিন্তু এবারকার মত মাপ করুন। আর কখনো করবো না।

পিতা পা ছ'টো বাড়িয়ে দিয়ে পুত্রকে ব'ললেন—পা ছুঁয়ে দিব্যি কর।

হরলাল পিতার পাদস্পর্শ করে বললে—দিব্যি করছি'—আর কখনো আপনাকে না বলে চুরি করবো না।······

অরুন্ধতীর বিয়ের জন্য ধার্য্য দিন ২২শে ফাল্গুন—যথানিয়মে অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু বিয়ের ফুল-কুঁড়িটা ফুটি-ফুটি করেও ফুটে উঠলো না। বেচারী গরীবের মেয়ে অনূঢ়াই রয়ে গেল।

এদিকে সম্ভবমত পণের প্রত্যাশায় যে-সব সম্বন্ধ এলো, তার একটা-কেও হরলাল পছন্দসই ব'লে ভাবতে পারলে না।

যাতে ফাল্গুনের ২৭।২৮শে—এই দুদিনের একদিন শুভকাজ সম্পন্ন হয়, তার জন্য হরলাল সাধ্যমত খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো।

অরুন্ধতীর বাপ যে আফিসে চাকরী করতেন—সেখানে বেতন পাওয়া যেত বাঙলা মাসের ২৫শে।

সেদিন ছিল শনিবার। রাত্রি প্রায় ১০টার কাছাকাছি। হরলাল বেলেঘাটা থেকে কি একটা কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরছিল। বৌবাজারের মোড়ে আসতেই, গাছতলায় পাতা বেঞ্চটার দিকে তার নজর পড়লো। দেখলে—সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা দিয়ে কে একজন বসে রয়েছে।

হরলাল লক্ষ্য করেই, 'কে-না-কে' ভেবে চলে যাচ্ছিল—হঠাৎ একটা

কাতর যাতনার ধ্বনি তার কানে এলো। ফিরে এসে দেখে—লোকটি কাঁদ্‌চে।

হরলাল জিজ্ঞাসা করলে—কে, তুমি? কাঁদো কেন?…ব'লতে ব'লতে কাছে এসেই সে এমন বিস্মিত হয়ে গেল, বোধ করি সারা কলকাতাটা বঙ্গোপসাগরের জলে নিমজ্জিত হ'য়ে গেলেও তার এত বিস্ময় আস্‌তো না!—

অরুন্ধতীর বাপ!—বেঞ্চের উপর উপুড় হয়ে প'ড়ে রোদন করছিলেন।

হরলাল কারণ জিজ্ঞাসা করতেই ব'ললেন—আফিসের এক বন্ধু তাঁকে ব্যারাকপুরে নিয়ে গেছলো। ঘোড়দৌড়-খেলায় নাকি এক ঘণ্টাতেই পাঁচটা মেয়ে পার করার টাকা মিলে যায়। তাই একটার জন্য তিনি আজ সমস্ত মাসের পারিশ্রমিক চল্লিশটি টাকা সম্বল করে' ব্যারাকপুর ময়দানে শুভ-গমন করেছিলেন,…এবং সর্ব্বস্বান্ত হয়ে, একান্ত শ্রান্ত-চরণে সমস্ত পথ হেঁটে হেঁটে, এই ঠাঁইটুকুই আপাততঃ আশ্রয়স্থল ব'লে বেছে নিয়েচেন। এখন কান্নার কারণ—সমস্ত মাস চ'লবে কিসে?—ছেলেপুলে এবং তিনি নিজেই বা খাবেন কি?

হরলাল তখন একটিও কথা কাটাকাটী করলে না। বামুনকে একখানা ট্যাক্সি ডেকে তুলে নিয়ে, বরাবর তাঁর বাড়ীর দরজায় নামিয়ে দিলে। শুধু তাই নয়, 'রেসে' হেরে-যাওয়া চল্লিশ টাকাই এই গরীব গৃহস্থের একমাত্র সম্বল, এ কথাও সে ভুলে গেল না,—চল্লিশটাকা বামুনের পকেটে গুঁজে দিলে। ব'ল্‌লে—গাছে উঠতে সবাই বলে, কিন্তু নিজের শক্তিটাই আগে বোঝা উচিত, নইলে হাত-পা ভাঙ্‌বার ভয় থাকে।…

কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হ'য়ে অরুন্ধতীর বাপ অনেকক্ষণ হরলালের চ'লে-যাওয়া পথটার পানেই তাকিয়ে রইলেন। তারপর অতি সন্তর্পণে বাড়ীতে ঢুকেই, উঠোনে থম্‌কে দাঁড়ালেন—ঠিক নিশীথ রাতের তস্করটির মত!

চার

দু'বছর আগে অরুন্ধতীর বড় বোন অনুপমার বিয়ে হয়ে গেছে।

আজ দেড় বৎসর সাধাসাধির পর, হঠাৎ খবর না দিয়ে, জামাই বাবু শ্বশুর-ঘর আলো করতে এসেচেন। তাই বাড়ীটা ধূমধামে মস্‌গুল হয়ে র'য়েচে।

ঘর দু'খানায় আলো জ্বলছিল। কিন্তু উঠোনটি ছিল বেজায় আঁধার, তাই কর্ত্তার আগমন কেউ টের পায় নি।

জেলখানার ফেরারী আসামী যেমন পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে বেড়ায়, 'রেসে'র জুয়াড়ীও টাকা খুইয়ে এসে ঠিক তেমনি আপন আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে দূরে-দূরে থাকতে চায়। আছাড় খেয়ে রাস্তার কাদায় পড়ে গেলে, পতন-যাতনার চেয়ে লজ্জার ঘা-টুকুই যেন বেশী করে বুকে বাজে।

জামাই বাবুর কাছে অরুন্ধতীও ছিল, অনুপমাও ছিল। অনুপমাকে একলা রেখে অরুন্ধতী বেরিয়ে আস্‌তেই, বাপের অচল অস্পষ্ট মূর্ত্তিটার

ওপর নজর পড়লো। চেঁচিয়ে ব'ল্লে—কে—বাবা ?…তারপর আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে নিম্নস্বরে বললে—ছোট জামাইবাবু এসেচেন।

একেই তো রেসকোর্সের ঘোড়াগুলো বেচারীর বুকের ওপর ছুটোছুটী করছিল, অরুন্ধতীর মুখে জামাতৃ-শুভাগমনের সুসংবাদ পেয়ে, সেই ঘোড়ার পদধ্বনি যেন বজ্রধ্বনির মতই তাঁর অন্তর-প্রান্তরকে মুখরিত করে তুললে।

আজ মাস ছয় ধরে' অনুপমার গহনা বাঁধা রেখে, খুব কমপক্ষে শ' দেড়েক টাকা তিনি ধার করেছেন। না করলে সংসারের সব প্রাণীগুলিকে হয়তো অনাহারে শুকিয়ে মরতে হ'তো।

অরুন্ধতী বাপের হাতখানা চেপে ধরে বললে—চলো বাবা, হাত-মুখ ধোবে।…জামাইবাবুর কে-একজন বন্ধু আস্‌বেন, মা রান্নাঘরে ব্যস্ত আছে।

…হাত-মুখ ধোয়া হয়ে গেলে, কর্ত্তা রান্নাঘরের মেঝেতে একখানা কাঠের পিঁড়ি পেতে বসলেন।

গিন্নী বললেন—অনুপমার চিরুণীখানা রেখে সাত টাকা নিয়ে এসেচি। জামাইয়ের কে বন্ধু আসবে। খাবেও নাকি আমাদের এখানেই।

কর্ত্তা দু' হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে বস্‌লেন। ফাগুনের হাওয়া আজ কোন্ হিমসাগরের বুক থেকে রাজ্যের কন্‌কনে শীত নিয়ে এসে তাঁর ভিতর-বাহির ঠক্ ঠক্ করে কাঁপিয়ে দিতে লাগলো।

গিন্নী জিজ্ঞাসা করলেন—মাইনে পেয়েছ তো?...কাল সকালেই কিন্তু চিরুণীখানা ছাড়াতে হবে।···বিপদ আর বলবো কত? —জামাই বাড়ীতে পা দিয়েই বলে রেখেচে—পঞ্চাশটি টাকা চাই।

চোখ দুটো জবাফুলের মত রাঙা হয়ে গেছে! মুখে কঠোরতার চিহ্ন ফুটে উঠেচে!—কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করলেন—ছোরা নিয়ে এসেচে তো? —টাকা নেবে কেমন করে? মেয়ের বাপের বুকের হাড় টুকরো টুকরো করে কেটে, ঝিনুকের বোতামের মত টাকা তৈরী করবার প্রথা যদি থাকতো, তা হলে জামাই-বাবাজীর মর্য্যাদা রাখতে পারতাম।

এর মধ্যে অরুন্ধতী এসে বললে—রান্না হয়েচে মা? জামাইবাবু তাগাদা দিচ্ছেন, এক্ষুণি আবার চলে যাবেন।

কর্ত্তা এতক্ষণ পর্য্যন্ত জামাতার সঙ্গে আলাপ করেন নি। অরুন্ধতীর কথায় বিস্মিত হয়ে বললেন—সে কি! এক্ষুণি যাবে কেন?—বলতে —বলতে উঠে গেলেন।

অরুন্ধতী বললে—জামাইবাবু ভয়ঙ্কর রাগ করছিলেন। টাকা না পেলে দিদিকে আর কখনও নিয়ে যাবেন না। এ নাকি তাঁর বাপের হুকুম।

মেয়ের কথা শুনে মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—দিদির কপাল! কিন্তু তাঁর অন্তরের মধ্যে হাহাকারের তীব্র প্রতিধ্বনি সাড়া দিয়ে উঠলো—'আমাদের কপাল!'···

জামাতৃ-সকাশে শ্বশুরমশায় উপস্থিত হ'য়ে বললেন—বাবাজীর সব

কুশল তো?···এই রাত্রে আবার যেতে হবে কেন? কত কাল পরে এলে—

জামাতা বললেন—টাকাগুলো নিতে এসেছিলাম, বাবা পাঠিয়ে দিলেন। বিশেষ দরকার।···তা ছাড়া গহনা-পত্রগুলোও সব নিয়ে যেতে হবে। নতুন করে গড়িয়ে দেবেন।

আকাশ থেকে বাজ পড়লো—যেন হাণ্ডারটা বাজের শক্তি এক জায়গায় হ'য়েচে!

কর্ত্তা বললেন—দিন-কতক সবুর করতে হবে বাবাজী! ছা-পোষা লোক আমি, একসঙ্গে এতগুলো টাকা···দিনকতক র'য়ে ব'সে না নিলে তো দিতে পারবো না।

জামাতা বললেন—অনেক দিন সময় নিয়েছেন, আর সময় দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষতঃ টাকা না হলে আমার মোটেই চলবে না। স্পোর্টিং ক্লাবে নাম দিয়েছি, 'টুরে' বেরুতে হবে। সাইকেল করে' আমরা ক'লকাতা থেকে বেনারস্ যাচ্ছি। দু'চার টাকার কাজ তো নয়। টাকা চাই-ই।

এ-যেন খাতকের কাছে পাওনাদারের জুলুম। একজন খেতে না পেয়ে মেয়ের গহনা বাঁধা দেয়, অন্যে সাইকেলে চড়ে দেশ-ভ্রমণে যায়। প্রয়োজন ঠিক দু'য়েরই সমান!···আশার বিশাল সৌধ তৈরী করতে মনের মধ্যে মাল-মসলার জমায়েৎ হয়, আর ভিত্তি-পত্তনের পূর্ব্বাহ্নেই ঝড়ের ঝাপ্টায় সব উড়িয়ে নিয়ে যায়!···আশে-পাশে জীবন-যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে, আর সমরসজ্জার সময়েই যোদ্ধার জীবন-লীলা সমাপ্তির সীমায় ঢলে পড়ে!···এই তো দুনিয়ার রকমফের!

কর্ত্তা ভাবতে ভাবতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। অনুপমা এসে স্বামীর পা জড়িয়ে কাঁদলে—বাবা আমার বড়ই গরীব, তোমাদেরই ভরসা করেন, তাঁকে বাঁচাও।

একটা রূঢ় পরিহাসের হাসিতে ঘর ভরে' উঠ্‌তেই, বাহির থেকে জামাতাবাবুর বন্ধু ডাকলেন—নন্তু, আছিস রে ?

অনুপমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নন্তু দোর খুলে দিয়ে বন্ধু প্রতাপচাঁদকে ভিতরে বসালে।

প্রতাপ জিজ্ঞাসা করলে—কাজ হাঁসিল ? কত টাকা পেলি ?

নন্তু বললে—ব্যাটা ভয়ঙ্কর পাজী। খালি কাঁদুনি গাইচে।

প্রতাপ হেসে বললে—আমি তা জানতাম।...এই তো সেদিন ওর ছোট মেয়েটাকে 'পার' করবার জন্যে বিশে ছোঁড়াকে নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু পাজী বলেই পেছিয়ে গেছে। তুই ছাড়বিনি।...টাকা দেওয়ার লোক আছে। আমাদের হরলালটা ভেতরে রয়েচে। তার বাপ টাকার কুমীর। আর সে-ও...ঐযে ইটিলী থেকে না কোত্থেকে ভাস্করের কাজ শিখে এসেচে না ? সেই শিক্ষার জোরে তারও উপার্জ্জন বড় কম হয় না। মাসে মাসে বিস্তর টাকা সে উপায় করে, তা ছাড়া বাপের এক ছেলে। প্যাঁচ ক'সে ক'সে নিঙ্‌ড়ে যত পারিস আদায় করে নে। শেষ পর্য্যন্ত গহনাগুলোও নিয়ে নিবি। ক্লাবের নাম রাখতে হবে।...দেশটা তো এমনি করেই উচ্ছন্নের দোরে যাচ্ছে। আরে ভাই, তুই-ই বলনা—খালি খালি মেয়ের বিয়ে, সংসারের টানাটানি—এই সব করে নাকে কাঁদার সময় কি আমাদের এখন ? মনে রাখিস, যেন-তেন করে অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকা আদায় করতেই হবে।

নন্তু বললে—সে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। টাকা না পাই, বউএর গহনাগুলোও নিয়ে যাবো।

[illegible]
পিকেটিং চালাতে হবে। আজই দলবল ঠিক করবো।

নন্তু জিজ্ঞাসা করলে—পিকেটিং আবার কেন ?

প্রতাপ বললে—হুঁঃ! তোরা সব যুব-সম্প্রদায়, অথচ ঘুমে অচেতন! ওরে হতভাগার দল!—জাগ্!—ঘোর কাটা! মুখ তুলে চেয়ে দেখ্—দেশের কী দুর্দ্দিন! পিকেটিং চালাতে হবে,—রাস্তার লোকজন যাতে ছোটলোক ভিখিরী ব্যাটাদের হাতে আর পয়সাকড়ি না দেয়। ব্যাটারা যা পায়, তার কতক পেটে খায় আর কতক নেশা করে ফুঁকে দেয়। নেশার জন্যে যা খরচ হয়, সব যায় বিদেশীর ভাণ্ডারে। দেশের এই টাকাটা যাতে অনর্থক নষ্ট না হয়, আমরা তার জন্যে কোমর বেঁধে লাগবো। পাজীর দল দু'দিন ভিক্ষে না পেলেই শুকিয়ে মরবে, তখন মদ-গাঁজা ছাড়তে বাধ্য হবে। আরে ভাই! বেকার-সমস্যার যুগ এখন। লোককে বাঁচাতে হলে এই সব খুঁটিনাটিই তো আগে দেখা চাই।

নন্তু, প্রতাপের কথাগুলো যেন গিলে খাচ্ছিল। বললে—তোমাদের ক্লাবেও তো মধ্যে মধ্যে বোতল্ টোতল আসে দেখেছি। অথচ এরই জন্যে পিকেটিং চালাতে যাচ্ছ ?

প্রতাপ আদর করে নন্তুর পিঠ চাপ্ড়াতে চাপ্ড়াতে বললে—দূর বোকা! ওতে কি দোষ থাকে ? সে-সব হচ্ছে মৃত-সঞ্জীবনী। খাঁটী আয়ুর্ব্বেদ মতে নামজাদা কবরেজ মশায়ের আড্ডায় তৈরী হয়। খাটা-খাটুনির দেহে দু' এক গ্লাস না খেলে দেহ চলে না।···যার নাম মৃতের

সঞ্জীবনী !···কিন্তু আর আমি দেরী করবো না নন্তু ! তুই বোস্। মনে থাকে যেন—টাকা চাই-ই।···

প্রতাপ চলে যেতেই, নন্তু ডাকলে—অরুন্ধতী ! শোনো তো।

অরুন্ধতী ঘরে ঢুকলো,—তার সঙ্গে সঙ্গে অনুপমা।

নন্তু বললে—তোমার বাবাকে বলো,—অন্ততঃ পঁচিশ টাকা দিতেই হবে। নইলে আমি সহজে ছাড়বো না।

একটা কথাও না ক'য়ে, অরুন্ধতী আদেশ পালন করতে বেরিয়ে গেল। অনুপমা কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে—আমি কি তোমার কেউ নই ? আমার কি এতটুকু অধিকার নেই—তোমার ওপরে ? হাত যোড় করে বলচি—বাবাকে রেহাই দাও। সবাই মিলে এম্‌নিধারা জুলুম করলে তিনি প্রাণে বাঁচবেন না।

নন্তু ক্রূর হাসি হেসে বললে—না বাঁচেন, বুঝ্‌তে হবে তাঁর পরমায়ু শেষ হয়ে এসেচে। টাকাকড়ির ব্যাপার, এসবে মা-বাপেরই খাতির রাখা যায় না। তা আবার—

অনুপমা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বেরিয়ে গেল।

নন্তু ভাবলে টাকা আদায় যদি না হয়, তাহলে ক্লাবের ছেলেরা কাপুরুষ বলবে। সাইকেল নিয়ে বেনারস যাওয়াও মাথায় উঠে যাবে।···

······অনেকখানি রাত্রে কর্ত্তা মিনতি করে' বললেন—বাবাজী, দেহের রক্ত বেচা যায় না। আজই মাইনে পেয়েছিলাম,—তার থেকে পনের টাকার বেশী আমি দিতে পারবো না।···

জামাতারূপ গৃহ-দেবতা না হয়ে' যদি আকাশের কোনো দেবতা হতো, তা হ'লে নিশ্চয়ই দেব-চক্ষু অশ্রু-কুহেলীতে ঝাপ্‌সা হয়ে উঠ্‌তো।...দয়া হ'ল না। নন্তু কঠোর স্বরে বললে—গাড়ি ডেকে দিন, আমি এখনই এদের নিয়ে যাবো।

শ্বশুর বল্‌লেন—একটা রাত্রি সময় দাও বাবাজী, কাল বেলা দশটার মধ্যে আমি গহনা-পত্র সমেত অনুপমাকে রেখে আস্‌বো। নানা গোলমালে গহনার সবক'খানাই আমাদের বাড়ীতে আপাততঃ নেই।...

জামাতা প্রচণ্ড রোষে, প্রস্থানের পূর্ব্বক্ষণে প্রণাম বা নমস্কারের বদলে মাত্র একটা কথা উচ্চারণ করে গেলেন—রাস্কেল!

শ্বশুর ভয়ে-ভয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে গিয়ে নন্তুর পকেটে দু'খানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে এলেন।

তখন অনুপমা গৃহ-কোণে বসে' বুকের ওপর হাত রেখে ভাব্‌ছিল—অদৃষ্টে যতই থাক্‌, সহ্য হয়তো হবেই; কিন্তু হে পরমেশ্বর, বাঙালী মেয়েদের এই লাঞ্ছিত জীবনের ধারাকে ভিন্নমুখী করে' দাও! এ বিশ্রী—অসহ্য!

তখন কর্ত্তা, গৃহিণীকে লক্ষ্য করে' বল্‌ছিলেন,—মাছ-ভাত খাওয়া আর সিঁদুর পরার ঘটাটুকু বাড়িয়ে দাও গিন্নী...নইলে পরে পস্তাতে হবে। ...গরীবের ঘরে মেয়ে জন্মায় শুধু বাপকে হত্যা করতে, আর মাকে বৈধব্য পুরস্কার দিতে।...

পাঁচ

রাত্রি প্রায় এগারোটার কাছাকাছি···

প্রতাপচাঁদ ক্লাবের মধ্যে প্রচণ্ড বক্তৃতা সুরু করেছে। সভ্যবৃন্দ হেসে-হেসে পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়ছিল।

বক্তৃতার মুখ্য বিষয়—অর্থনীতি ও সমাজনীতি।

—উন্নতির পথ পরিষ্কার হয়—যুগ-জীর্ণ মনের সংস্কারে। কলুষ চিন্তা মনে এলেই তা দূরে ঠেলে দিতে হয়। কাপুরুষতা সামাজিক-জীবনের কলঙ্ক। অর্থ থাক আর না থাক, বিশ্বাত্মার তৃপ্ত্যর্থে জাল-জোচ্চুরি করাও শাস্ত্র-সম্মত। কীর্ত্তি রেখে যেতে হ'লে জীবনটাকে বহুদিন জীইয়ে রাখা চাই, নইলে কীর্ত্তি গড়বে কি করে'?···অপরকে সুখী করতে হ'লে সুখের সকল উপাদানকে তনু-মন দিয়ে সর্ব্বপ্রথম নিজেকে আস্বাদ করতে হবে। কৃপণের সিন্দুক ভেঙে আগে নিজের পকেট ভরাতে হবে—পকেটে সব ধরাতে না পারলে দেশবাসীর সামনে ছড়িয়ে দিতে হবে; বিলাসীর বাগান-বাড়ী লুঠ করে' শ্রেষ্ঠ সুন্দরীটি নিজের জন্যে বেছে রেখে অপরগুলিকে পাড়া-প্রতিবাসীর মধ্যে বিতরণ কর্ত্তে হবে।···সুতরাং ভোগই হচ্ছে চরম লক্ষ্য।

এম্‌নি সময় নন্তু শ্বশুরবাড়ী-ফেরতা সভাস্থলে এসে হাজির হল। প্রতাপচাঁদও বক্তৃতা বন্ধ করে দিয়ে, ডাকলে—এদিকে—ভায়া, এদিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে—ক' শো' টাকা? গয়নাগুলো সবই বাগিয়ে আনলি—না দু'চারখানা? শীগ্‌গির শীগ্‌গির বের কর; মাথায় আগুন জ্বলচে। রাত পোহালে 'রেডিও-আফিসে' টাকা দিতে হবে। ভালো

দেখে 'লাউড্-স্পীকার' না আন্‌লে এত বড় যদুবংশ শুনবে কি করে'?

নন্তু জামার পকেট থেকে দু'খানা নোট বের করে দিয়ে বল্‌লে—কাল দশটার মধ্যে গয়নাগুলো এনে দেবে। খুব শাসিয়ে এলাম। নগদ বেশী পাওয়া গেল না।

মুখখানায় রাজ্যের বিরক্তি এনে প্রতাপচাঁদ বল্‌লে—আরে ছ্যা ছ্যা, এ-রকম বউ-পাগ্‌লা লোক নিয়ে কাজ চলে? এই সাহসে তুমি স্পোর্টস্‌-ম্যান্ হতে চাও ভায়া?...আঁচল ধরে' টানতে টানতে গাড়ীর ভেতর পুরতে পারোনি? বাড়ী এনে, দিন-তিনেক ভাত বন্ধ করলেই সব গোল মিটে যেত।

নন্তু বিশেষ কিছু বল্‌লে না।

প্রতাপচাঁদ নন্তুর দেওয়া নোট দু'খানার একখানা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বল্‌লে—দারোয়ানটা বুঝি ফেরেনি এখনো? হরলালকে ডাকতে গেছে—সে তো দু'ঘণ্টা হ'লো।

ঠিক এই সময়েই হরলাল ঘরে ঢুকলো। সেক্রেটারী এবং প্রতাপ-চাঁদ উভয়ে সম্বর্দ্ধনা কর্‌লে—এস হে ভাস্কর ঠাকুর! এস! আজ বড্ড দেরী করে' ফেলেচ। দু'একটা লেকচার তোমাকে দিয়ে দেওয়াব ভেবেছিলাম।...ও হে দারোয়ানজী, যাও তো...শিখের হোটেল থেকে মাংস সের-পাঁচ, আর 'ফিরপো'র রুটী খান্‌কতক নিয়ে এস দেখি। শিখেদের ওখানে ব'লো—রান্না ভাল না হলে দাম ফেরৎ দিতে হবে। আর পুঁটীরামের দোকান থেকে তিন টাকার রাজভোগ।...জল্‌দি আসা চাই।

হরলাল বললে—টাকাটা কি প্রতাপ বাবুই দিচ্ছেন নাকি? বড্ড দরাজ হাত দেখচি যে! কিন্তু সেক্রেটারী মশায়! আমার একটা কথা বলবার আছে। আশা করি আপনারা স্বীকার করবেন যে, আমি একজন বিশিষ্ট সভ্য; আমার প্রস্তাব এই যে, দশ-দশ টাকা বাজে খরচ না করে' কোনো সৎকাজে দান করা হোক।

প্রতাপচাঁদ দারোয়ানের হাতে টাকাটা দিয়ে তারপর প্রশ্ন করলে—সৎকাজটা কি-প্রকার শুনি?

হরলাল ঝোঁকের মাথায় বেশ বড় রকম একটা চড়া কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ বাহির থেকে কে একজন হাঁক্‌লে—হরলাল বাবু আছেন এখানে?

—"কে আপনি?" বল্‌তে বল্‌তে হরলাল এগিয়ে এসে দেখলে—ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অরুন্ধতীর বাপ! জিজ্ঞাসা করলে—ব্যাপার কি? এমন অবস্থায় যে?

বৃদ্ধ ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লেন। নন্তু প্রতাপচাঁদের পিছনে সরে' দাঁড়ালো।

বৃদ্ধ বললেন—অনুপমা পুড়ে ম'রেছে।

হরলাল একটা অস্ফুট শব্দ করে' উঠলো। নন্তু তখন আপনার পথ খুঁজছিল।

বৃদ্ধ বললেন—জামাইবাবাজী গেছ্‌লেন। মেয়ের সঙ্গে কি-সব বচসা হয়েছিল জানি না; খাওয়ার পর শুতে যাচ্ছি, দেখলাম—অনুর ঘর থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে; তারপর দোর ভেঙেই দেখি—সর্ব্বনাশ! মা-আমার জ্বালার অবসান করতে হু হু করে' জ্বলে মরছে। মেডিকেল

কলেজেই মারা গেল। এই মাত্র সেখান থেকে আস্‌চি।···আহা, গরিবের ঘরে জন্ম নিয়েছিল, মা-আমার শেষ অবধি যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করেছে।

কিন্তু প্রতাপচাঁদ বলে উঠলো—আপনি এক কাজ করুন, বার্থ-কন্‌ট্রোল সম্বন্ধে বাজারে যে-সব ভালো ভালো বই আছে, তার দু'চার খানা মন দিয়ে পড়ুন। একটি মা-ও তাহ'লে আপনার ঘরে জন্ম নিতে আস্‌বে না।

ক্লাবের সেক্রেটারী বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন—ও-সব কথা এখন না প্রতাপ। ঘরে আগুন লাগ্‌লে লোকে জলটাই আগে খোঁজে, গৃহস্থকে সাবধান হওয়ার পরামর্শ দিতে যায় না।

প্রতাপ বললে—তা বটে।···কিন্তু আপনার আর ক'টি মেয়ে আছে মশায়?

হরলাল তীব্রভাবে চীৎকার করে উঠলো—চোপ্‌ রাও! তারপর বৃদ্ধকে বল্‌লে—আপনি বাড়ী যান; হাঁসপাতাল থেকেই আমি শ্মশানে যাবার যোগাড় করছি; ঘণ্টাখানেক বাদে নিমতলা-ঘাটে যাবেন। জামাই আছে, না চ'লে গেছে?

হরলাল জানতো না যে, নন্তুই অনুপমার স্বামী। এবং নন্তুকেও সে ভালোরকম চিন্‌তো না।

বৃদ্ধ বল্‌লেন—জামাই চলে এসেচে। সেখানেও খবর দিতে হবে।···

প্রতাপ তখন নন্তুকে আড়াল করে' বসিয়ে রেখেচে। কানে-কানে বলে দিলে—যা, একপাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে, সাইকেল নিয়ে ভোঁ দৌড়···বুঝলি?

হরলাল জিজ্ঞাসা করলে—প্রতাপচাঁদ! ক'জনকে যেতে হবে বলো দেখি?

প্রতাপ বিস্মিত হয়ে বল্‌লে—কোথা? বার্ণিং-ঘাটে?—ভায়া মেডিকেল কলেজ তো?

—হ্যাঁ?

—অন্ততঃ ছ'জন দরকার।...কিন্তু একটা কথা আছে হরলাল,...বুড়ো কি তোমার আত্মীয়?

হরলাল বিরক্ত হয়ে বল্‌লে—আপন-পর নিয়ে কি তোমরা এ-সময়েও যুক্তি-বিচারের জাল বুন্‌বে? এ-কি সেই সময়?...ধরো আত্মীয়ই।

প্রতাপ দাঁত বের করে হেসে ফেল্‌লে,—তবে গোটা-পঁচিশেক টাকা ছাড়ো ভায়া!—তোমার অভাব কিসের? গরীব সমিতি আমাদের... অবশ্যই কিছু আশা রাখে। 'এস্‌টাব্‌লিস্‌মেণ্ট'-খরচা যে-রকম বেড়ে গেছে—

হরলাল চীৎকার করে উঠলো—পঁচিশ হাজার দিতে রাজী আছি—যদি কেউ এই রাস্কেল্‌টার গলা কেটে দু'টুকরো করতে পারে—

প্রতাপচাঁদ জোরে হেসে উঠলো। বল্‌লে—রাগ কর্‌লে চল্‌বে কেন দাদা! এ যে আমাদের ন্যায়তঃ প্রাপ্য।

হরলাল রাগে জ্ঞান হারিয়ে বস্‌লো। সে-যে কি করবে বা কি বল্‌বে—কিছুই ঠিক করতে না পেরে, হঠাৎ একখানা চেয়ার প্রতাপের গায়ের ওপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে, সমিতির খাতাপত্রগুলো ঘরময় ছড়িয়ে দিয়েই এক লাফে রাস্তায় নেমে পড়লো।

মেডিকেল কলেজে মহা হৈ-চৈ পড়ে গেছে। অনুপমার মৃতদেহটার সম্মুখে বিরাট এক জনতা। পুলিসের লোক নম্ভর নিকট অভিযোগ পেয়েছে—অনুপমার বাপই তার মৃত্যুর কারণ। সে এজাহার দিয়েছে—কন্যার গহনা নষ্ট করে' উল্টে তাকে নির্য্যাতন করায়, সে ধিক্কারের জ্বালা সইতে না পেরে আত্মনাশ করেছে। সুতরাং পিতা ছাড়া মৃত্যুর জন্য অন্য কেউ দায়ী নয়।···

হরলাল বিষম চিন্তিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অকস্মাৎ দেখ্‌তে পেলে—তার বাবা অরুন্ধতীর হাত ধরে এগিয়ে আস্‌চেন।

হরলাল বাপের কাছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কান্না সুরু করে দিলে—যেমন করে হোক্ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বাঁচিয়ে দিন বাবা!—উনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। আমি ওঁকে খুব ভালো রকম জানি।

হরলালের পিতা পুত্রের কথায় কান দিলেন না; অত্যন্ত গম্ভীরভাবে পুলিসের দারোগার দিকে চেয়ে, পকেট থেকে একটুক্‌রো কাগজ বের করে' ব'ললেন—এ-খানা পড়ুন তো মশায়, সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ইন্‌স্‌পেক্টর পড়্‌লেন—

"আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী আমার দেশ এবং সমাজ। সমগ্র দেশের উন্নতি-কল্পে যাঁরা প্রাণপাত করছেন, তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েও লোকে ঘরের পানে চাইতে জানে না—এইটুকুই আমাদের সব চেয়ে বড় দুঃখ! আজ আমার চিতার আলোতে, আমার দেশবাসীর চোখের অন্ধকার ঘুচে যাক্—হিম-শীতল বিষাক্ত নির্জ্জীব সমাজ-দেহে এতটুকু উত্তাপ লাগুক,—আজ এই প্রার্থনাই ভগবানের কাছে দাখিল করতে চ'ল্‌লাম।

"সর্ব্বশেষ কথা—মৃত্যুপথযাত্রী আমি, সত্য গোপনে বাসনা নাই।—

আমার পিতামাতা, স্বামী এবং শ্বশুর-পক্ষদ্বারা লাঞ্ছিত বা লুণ্ঠিত হচ্ছিলেন, —দেখে আমি স্বেচ্ছায় সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছি। ভরসা করি, কেউ বিপন্ন হবেন না।—ইতি—অনুপমা" … …

হরলাল শ্মশান থেকে বাড়ীতে এলে, তার বাবা বল্‌লেন—কি নাম রে ব্রাহ্মণের ঐ ছোট মেয়েটির ?

—অরুন্ধতী।

—খাসা নাম, খাসা মেয়ে। বুদ্ধিশুদ্ধি অত্যন্ত চমৎকার। চিঠিখানা হাতে করে' একাই আমার কাছে ছুটে এসেছিল। নইলে আমি জান্‌বো কেমন করে' ? কিন্তু ও আমাদের ঠিকানা জান্‌লে কার কাছে ?

হরলাল মুখ নীচু করে' বললে—ওদের বাড়ীতে আমাকে দু'এক-বার যেতে হয়েছিল বাবা। আমিই বোধ হয় ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম।

পিতা গম্ভীর ভাবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছেলের পানে চাইলেন। ছেলে মুখ নামিয়ে ব'সে রইলো।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ থাকার পর পিতা বললেন—কিন্তু নামিল ঘর হয়েই তো গোল বাধালে, নইলে মেয়েটাকে আমার পছন্দ হয়েছিল।

পুত্র আস্তে-আস্তে গৃহান্তরে চলে গেল।

ছয়

দিন সাত-আট পরে একদিন সন্ধ্যার সময় হরলাল তার বাপের কাছে বললে—সিন্দুকের চাবিটা কোথায় বাবা ?

—কেন ?

—টাকা চাই।

—কত টাকা ?

—পাঁচশো। আপনাকে না বলে নেব না প্রতিজ্ঞা করেছি। নইলে চুরি করতাম। অরুন্ধতীর বাপকে অনুপমার শ্বশুর বড় জ্বালাতন করছে। অনেকগুলো গহনাপত্র বন্ধক আছে।

পিতার মুখখানা অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে উঠলো। ঘন ঘন পুত্রের মুখের পানে চাইতে লাগলেন, কিন্তু টাকা দেবেন—কি—দেবেন না, সে-সম্বন্ধে একটা কথাও প্রকাশ করে বল্‌লেন না।

হরলাল ঈষৎ কুণ্ঠিত হয়ে বললে—অরুন্ধতীর বাবা অত্যন্ত গরীব, তার ওপর বুদ্ধি-শুদ্ধিও ধারালো নয়। পাঁচজনের বাজে কথায় ভুলে অনেক সময় নিজের ক্ষতি করে বসেন।...টাকা তো কত দিকেই খরচ হয়, এ-খরচটাও অপব্যয় হবে না বাবা! দেশের লোক হয়ে দেশের লোককে না দেখলে দেখবে কে ?

পিতা বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বললেন—আম-কাঁঠালের বাগানের মত আমার তো টাকার বাগান নেই হরলাল, যে দু'পাঁচশো ছিঁড়ে দিলেই হ'ল ? দেশে তো তুমি-আমি ছাড়াও হাজার হাজার রয়েচে,

সুতরাং সবাই যেমন চুপ করে’ থাকে, বুদ্ধিমানের মত তুমিও তেমনি থাকো।

হরলাল ধীরে ধীরে অথচ স্পর্দ্ধার সঙ্গে বললে—আমি কথা দিয়ে এসেচি বাবা। পাঁচশো টাকা যেমন করে হোক দেবই।...আমাকে একখানা ‘বেবি-অষ্টিন্’ কিনে দিতে চেয়েছিলেন, তা আর নেবনা, পাঁচশো টাকাতেই আমার সাধ মিট্‌বে।

পিতা চাবির ছড়াটা পুত্রের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—মনে রেখ, পাঁচশোর বেশী আর চাইতে পাবে না। আধঘণ্টা পরে যদি একটা পয়সা চাও, তা-ও পাবে না।

হরলাল তাতেই রাজী হয়ে, বাপের হুকুমে পাঁচশো টাকা সিন্দুক থেকে বের করে নিলে। তারপর চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

অরুন্ধতী বাইরের ঘরে ব’সে অদৃষ্ট-চিন্তা করছিল; তার বাবা অনুপমার শ্বশুর-বাড়ী গেছেন, আর মা পাশের বাড়ীতে বন্ধকী গহনার সুদ-আসলের হিসাব আন্‌তে গেছেন।

প্রতাপচাঁদ পথ থেকেই ডাক্‌লে—ঘোষাল মশায় বাড়ী আছেন নাকি?

অরুন্ধতী জান্‌লায় মুখ বাড়িয়ে বললে—বাবা তো বাড়ী নেই, জামাই-বাবুদের বাড়ী গেছেন।...আপনার কোনো কাজ আছে?

প্রতাপচাঁদ বললে—হ্যাঁ; কিন্তু তিনি তো নেই—অথচ জরুরী কথা! ...আচ্ছা দরজাটা খোলো তো।

অরুন্ধতীকে বাধ্য হয়ে দরজা খুলতে হল। কেননা, প্রতাপচাঁদকে সে একাধিক বার দেখেছিল।

প্রতাপ ভিতরে এসে, একখানা চৌকি টেনে নিয়ে বসলো। তারপর বললে—সেয়ানা হয়ে উঠেছ, লজ্জা করার সময় তোমার অনেককাল চলে গেছে। এখন বাপকে বাঁচাতে চাও তো যা বলি শোনো। নন্তু ছোঁড়াকে অনেক বলে' ক'য়ে রাজী করেছি। দোজবর বলে দুঃখ কোরো না, অমন ছেলে লাখে একটা মেলে। তোমার বাবা এলে ব'লো—পাওনা অলঙ্কারগুলো, আর শ' দুই টাকা দু'দিনের মধ্যে যেমন করেই হোক্ যোগাড় করেন যেন। তার হাতে দিয়ে খোসামুদির দু'চারটে বচন আওড়ালেই কাজ হাঁসিল হবে। নন্তুর বাপ ছেলের কথায় ওঠে-বসে। সুতরাং ভয় নেই।···তা ছাড়া—

অরুন্ধতী মৃদুস্বরে বললে—এসব কথা আপনিই বাবাকে বলে যাবেন। আমি কিছু বলতে পারবো না। একি আমার কাজ?—বল্‌তে বল্‌তে লজ্জায় বেচারীর মুখ লাল হয়ে উঠ্‌লো।

প্রতাপচাঁদ ভাবলে—কায়েত্ না হ'য়ে যদি বামুন হ'তাম, তা হ'লে মন্দ হ'ত না। দিনকতক সময়টা কাট্‌তো ভালো।···

অরুন্ধতী বললে—বাবা তো ওঁদের ওখানেই গেছেন।

প্রতাপ বললে—সেখানে যাওয়া না যাওয়া সমান কথা। আসল ব্যাপারটা কি জানো?—নন্তুকে কিছু টাকা না দিলে কাজ হবে না।··· আচ্ছা, আমি উঠি তা হলে। কিন্তু একটা কথা,—হরলালবাবু টাকা-কড়ি যা খরচ পত্র হবে—দিতে পারবেন তো? বলেছেন কিছু?

অরুন্ধতী মুখ নামিয়ে বল্‌লে—তা আমি জানি না।

প্রতাপ বললে—দেখ অরুন্ধতী, ছেলেই হোক্ আর মেয়েই হোক্—মা-বাপের প্রতি দু'য়েরই সমান কর্ত্তব্য। একজন ম'রে নিজে বেঁচেছে, কিন্তু মা-বাপকে বিশ হাত গভীর জলে ডুবিয়ে রেখে গেছে। তুমিও যদি এ সময় নির্ব্বোধ সেজে বসো, তা হলে বুড়ো মা-বাপই গলায় দড়ি দেবে।...সময় নেই, নইলে অপেক্ষা করে' থাক্‌তাম। ঘোষাল মশায় আমাকে ছেলের মতই স্নেহ করেন। ভেবো না তুমি। নন্তুর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবই, এ আমি মা-কালীর শপথ করে বলে যাচ্ছি।...সত্যি বল, হরলাল কত দেবে?

অরুন্ধতী অত্যন্ত সলজ্জ হয়ে বললে—যা খরচ হবে সবই তো দেবেন বলেছেন।

প্রতাপ খুসী হয়ে বললে—এইতো, এতক্ষণে আসল বুদ্ধি গজিয়েছে!...আচ্ছা আমি চললাম অরু! নন্তুকে পাঠিয়ে দেব, সে নিজেই কথা-বার্ত্তা কইবে।

প্রতাপ চলে যেতেই, অরুন্ধতীর মা বাড়ী ফিরে এলেন। অরুন্ধতী প্রতাপের আগমন ও তার কথাবার্ত্তার আসল তাৎপর্য্যটুকু মায়ের কাছে কোনো রকমে জানিয়ে রাখলে।

ঘোষাল মশায় অর্থাৎ অরুন্ধতীর বাবা, অনেকখানি রাত্রিতে বাড়ী ফিরলেন। মুখে তাঁর প্রশান্ত হাসি। যেন কালো মেঘখানা সবেমাত্র চাঁদকে মুক্তি দিয়ে গেছে।

আহারে ব'সে আপন মনে বলতে লাগলেন—আহা!—রাজা হোক্,

রাজরাজেশ্বর হোক্! অনন্ত পরমায়ু নিয়ে সুখে-শান্তিতে ঘর করুক।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করলেন—কে?···নন্তুর কথা বলছো?

—নন্তু তো ঘরের ছেলে। বল্‌ছি হরলালবাবুর কথা। বেয়াই-বাড়ী যাচ্ছিলাম, পথের মাঝখানে দেখা হতেই পাঁচশো টাকা দিয়ে দিলে। বল্‌লে—অনুপমার জিনিসপত্র ছাড়িয়ে, কালই যেন বেয়াই-বাড়ী পাঠানো হয়। তা ভগবান যখন মুখ তুলে দেখেন,—তখন শুক্‌নো গাছে ফুল ফোটে, মরুভূমিতে বান ডেকে যায়।···বেয়াই মশায় নিজে প্রস্তাব কর্‌লেন—অরুন্ধতীর সঙ্গে নন্তুর বিয়ে দিতে হবে।···কাঁহাতক আর খোঁজাখোঁজি করি, আমি রাজী হয়ে এলাম।

—দেনা-পাওনা?

—অনুর যা গহনাপত্র আছে, সেইগুলো কালই দিয়ে আসবো। টাকা তো মজুত আছে—ভয় কি?···তা ছাড়া বায়না পর্য্যন্ত করে এসেচি।

—"তার মানে?"···বলে গৃহিণী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন।

—বিয়ের আবার বায়না কি গো?

ঘোষাল মশায় হেসে বললেন—ঘরের কোণে বদ্ধ থাকো, বাইরের সভ্যতার কথা জান্‌বে কোত্থেকে? বায়না মানে অ্যাড্‌ভান্স,···অর্থাৎ বেয়াই মশায় দেড়শো টাকা হাত-খরচ বলে আগাম চাইলেন। আমিও পাঁচশোর দেড়শো দিয়ে এলাম। এ ছাড়া, আর দেড়শো দিতে পারলেই খালাস্! পাই-পয়সাটি পর্য্যন্ত অন্য কিছুতে ব্যয় হবে না। দেখ্‌লাম, বেয়াই মশায় এবার যথেষ্ট ভাল্‌মানুষি কর্‌ছেন। অনুর জন্যে খুব

কাঁদাকাটি করলেন।...যাক্, তার ভাগ্য নিয়ে সে চলে গেছে, অরুর কপালে সুখ থাকে তো···তুমি ও-বাড়ীতে গেছলে? হিসেবটা নিয়ে এসেচ?

গৃহিণী বললেন—নিয়ে তো এসেচি, কিন্তু তুমি দিলে বেয়াইয়ের হাতে টাকা, এদিকে জামাইয়ের বন্ধু এসে বলে গেল—নন্তুর হাতেই টাকা দিতে হবে। শেষটায় দু'দিক্ না যায়।

ইতিমধ্যে নন্তু সদর-দরজার কড়া নেড়ে ডাকলে—অরুন্ধতী, দোর খোলো।—আমি নন্তু।

ঘোষাল মশায় স্বয়ং দরজা খুলে জামাতাকে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল—আজ এই অতিবড় প্রিয় ব্যক্তিটিকে বুকে জড়িয়ে বলেন—এসো এসো বাবা এসো, পূর্ণিমার চাঁদ এসো, আঁধার ঘরের মাণিক এসো।···মনোভাণ্ডারের কোণে কোণে যত রকম সাধু ভাষায় কথাবার্ত্তা তাঁর লুকোনো ছিল—সব এক জোট হয়ে আজ বাইরে আস্‌তে চাচ্ছিল।

গৃহিণী জামাতাকে আহার হয়েছে কি-না জিজ্ঞাসা করতেই, নন্তু ব'ললে —সমিতিতে আজ ঢের কাজ আছে মা!···কাল এসে খাবো।—গহনা-গুলো ঠিক আছে তো?

ঘোষাল মশায় বল্‌লেন—কাল সকাল বেলায় দিয়ে আসবো বাবাজী! বেয়াই মশায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা পাকা করে এলাম। এইমাত্র আস্‌চি আমি। তাঁকে দেড়শো টাকা দিয়েও এসেচি।

—সর্ব্বনাশ করেছেন! বাবা ঐ নিয়ে ফ্‌র্ত্তি'-সে রেস্, খেলে আসবেন। আর আমি হতভাগা ফ্যা-ফ্যা করবো···নাঃ, আপনি কেন যে এত ভুল

বোঝেন !···কেন প্রতাপ দা আসেনি ? অরুকে সে তো সবই খুলে বলে গেছে। তার কথাতেই তো আমি তাড়াতাড়ি আস্‌চি।

ঘোষাল মশায় অপ্রতিভ হয়ে বল্‌লেন—তবে তো বড় অন্যায় হয়ে গেছে বাবাজী।—এখন উপায় ?

নন্তু বললে—যা হয়ে গেছে আর তা ফিরবে না। আপনাদের সঙ্গে তো নতুন সম্বন্ধ নয়। গহনাগুলো ছাড়াবার জন্যে কত টাকা মজুত রেখেচেন ?

—সাড়ে তিনশো এখনো কাছে আছে।

—সাড়ে তিনশো ?···গহনা পরে হবে, বাবার হাতে অত টাকা দিয়ে কাজ নেই, ও-টাকা আমার হাতেই দিন, সময় বুঝে যা-হয় ব্যবস্থা করা যাবে। কাল সকাল বেলাতে বাবার কাছে আর যাবেন না যেন। আপনি জেনে রাখুন,—বাবা যতই গোলমাল বাধাতে চান, আমি ঠিক থাক্‌লে কোনো ভয় নেই। বিয়ে তো আর বাবা কর্‌বেন না, সেটা আমারই কাজ।···দিন, টাকাগুলো আমি নিয়ে যাই।

ঘোষাল মশায় আর দ্বিধা করলেন না। সমস্ত টাকাই নন্তুর হাতে তুলে দিলেন।

সাত

সমিতি-ঘরে বসে প্রতাপচাঁদ নন্তকে বললে—আর ওদিক মাড়াতে যেয়ো না ভায়া, যা পাওয়া গেছে এই ঢের। হরলালটাকে এইবার জব্দ করতে হবে। তার বাপকে যা বলে এসেচি, পাই-পয়সাটি বাছাধন আর হাতে পাচ্ছেন না, বেশী গোলমাল করতে গেলেই তেজ্য-পুত্তুর হ'তে হবে।···তখন সেই ভাস্করের কাজ—পাথর খোদাই করে মূর্ত্তি তৈরী ভিন্ন বাছাধনের আর গত্যন্তর থাকবেনা। এখন কাজের কথা হোক,—সাড়ে-তিনশো টাকার সমিতিতে তুই কতটাকা দিবি বল্‌তো ?

নন্তু বল্‌লে—সমিতি আমার প্রাণ, তার উন্নতির জন্যে আমি যা পাবো সবই দেব প্রতাপ দা !···কিন্তু—

প্রতাপ ঝাঁ করে বলে উঠ্‌লো—আরে, সে-কি আর আমাদের বিবেচনা নেই নন্তু ?—তুই পঞ্চাশ টাকা—পঞ্চাশ টাকা কেন, আশী টাকাই রাখ্‌, বাকী সমিতির খাতায় জমা হোক্।

নন্তু টাকাগুলো টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বল্‌লে—জমা-ফমার ধার ধারিনে আমি। যা খুসী করগে। আমি বাবা দিনকতক থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখে আশ্‌ মিটিয়ে নিই।

প্রতাপ বল্‌লে—তা দেখ্‌ না।···আরে এখনো হাত আছে। কালই আমি পাড়ার ফেলু সরকারকে বলে রাখ্‌বো। 'প্ল্যান্টেন-শোয়িং' আফিসের বড় বাবু সে। একখানা ট্রামের মাসিক টিকিট কিনে, ফেলু বাবুর আফিসে যাওয়া-আসা করিস। যে-কেউ খোঁজ করতে গেলেই সে

ব'লে দেবে—একশো টাকা মাইনের চাকরি তোর ! বস্……দুশো মেয়ের বাপ ধরে' লোফালুফি করবে। হাজার-খানেক না হলে কিছুতেই মত দিবি নি।……কিন্তু কথা হচ্ছে—হরলালকে জব্দ করি কেমন করে ! হতভাগা ভয়ঙ্কর গোঁয়ার-গোবিন্দ। যদি উল্টো কিছু করে বসে…

সেক্রেটারী মশায় উপায় উদ্ভাবন করলেন—এক কাজ কর না হে,—পুলিশের সঙ্গে যোগসাজস্ করে' একটা স্বদেশী মামলায় আটকে দাও না। বছর খানেক জেল-ফেল হয়ে গেলেই আপাততঃ শান্তি পাওয়া যাবে। সমিতির সম্বন্ধ যখন ছেড়েই দিয়েছে, তখন ওর দ্বারা আমাদের কোনো কাজই চ'লবে না।…ওর জেলে যাওয়াই মঙ্গল।

প্রতাপ ঈষৎ চিন্তা করে' বললে—কিন্তু ওর বাপ কি আর চুপ করে থাকবে ? একটিমাত্র ছেলে, মা বেঁচে নেই, অগাধ ধন-ঐশ্বর্য্য, তাকে যেন-তেন করে জেলে পাঠানো কি চারটিখানি কথা ?…কিন্তু,…এক কাজ করলে হয়—আগে বাপের মনটিকে ছেলের ওপর বিতৃষ্ণায় ভরিয়ে দিয়ে, তারপর পুলিশের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলে চলে। স্বদেশীর ঝোঁক তো ওর পুরোমাত্রাতেই আছে, নইলে আমরা এত টাকা যুগিয়ে নিতে পারি ?… নাঃ, এ ছাড়া পথ নেই।…নন্তু, তুই বাড়ী চ'লে যা। যদি সম্ভব হয়, দিন-কতক দার্জ্জিলিং থেকে ঘুরে আয় না। তারপর বিয়ের নতুন বন্দোবস্ত করা যাবে।……

নন্তু বিদায় নিয়ে চ'লে গেলে, নির্জ্জন ঘরে বসে' সেক্রেটারী ও প্রতাপ-চাঁদের মধ্যে টাকাকড়ির আধা-আধি ভাগ হয়ে গেল।…

তার পরদিন অরুন্ধতীর বাবা দিনের মধ্যে তিনবার করে নন্তুর খোঁজ করতে লাগলেন। কিন্তু নন্তু তখন ক'লকাতার বাইরে। প্রবঞ্চিত দুঃখী

পরিবার বুকে হাত চাপ্ড়ে বড় কান্নাটাই কাঁদ্‌লে! এ ছাড়া তাদের আর কি-ই বা করবার ছিল!

আট

বিপদে হোক্—সম্পদে হোক্—ধনী-নির্ধন সকলকার দিনই কাটে। তাই ঘোষাল মশায় বা তাঁর পরিবার বর্গেরও কাটছিল।

চিনির বলদের মত সারাদিনমান আফিসে হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটে, ঘোষাল মশায় বাড়ী ফিরে আসতেন, আর যা ঘরে জুট্‌তো তাই পেটে পুরে ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুম দিতেন,—দুশ্চিন্তাটা দেহের ক্লান্তির কাছে দস্তুরমত হার মেনেছিল।

কিন্তু মেয়ের বাড়ন্ত দেহের পানে চেয়ে চেয়ে গৃহিনীর আর গলা দিয়ে জল নামছিল না। সনাতনী সমাজে এই একটা মস্ত-বড় সংস্কার আছে কিনা—পুরুষ খেটেখুটে এনে দিয়েই খালাস পায়, নারীর ভাগ্যে জোটে পরিবেশনের ভার!—দিতে হয় সকলকেই, কিন্তু ফাঁকি পড়ে সে নিজে।···

অরুন্ধতীর মায়েরও কতকটা সেই দশা ঘট্‌লো।······

কিন্তু ঘোষাল মশায় আফিসে গেলে, প্রতাপচাঁদ প্রায়ই দুপুরের সময় অরুন্ধতীর মায়ের সঙ্গে জরুরী কথা কইতে আস্‌তো। একান্ত সরল-হৃদয়া নারী, প্রতাপের অন্তরের কথা না জান্‌লেও, তাকে হিতৈষী বলেই সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাকে আত্মীয় ছাড়া 'পর' ভাবতে পারেন নি।

এম্‌নি এক দুপুরবেলায়, প্রতাপচাঁদ যখন অরুন্ধতীদের দোর-গোড়ায়

এসে ডাকাডাকি করছিল,—তখন বাড়ীর মধ্যে ঘোষাল মশায় প্রবল জ্বরে অচৈতন্য !···অরুন্ধতী নিবিষ্ট মনে পিতৃসেবায় নিযুক্ত, গৃহিণী দু' হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে, সম্ভবতঃ রোদনই করছিলেন।

প্রতাপ চাঁদ বাইরে দাঁড়িয়ে, না-হবে বার পাঁচসাত ডাক্ দিয়ে, বিরক্ত হ'য়ে ফিরে যাবে কি-না ভাবচে,—এমনি সময় দোর খুলে গেল।—সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অরুন্ধতী।

প্রতাপ জিজ্ঞাসা করলে—নাকে সরষের তেল্ দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে বুঝি ? এসেচি কি এখন !—ডেকে-ডেকে গলা ফেটে রক্ত ঝরচে আমার।

অরুন্ধতী মুখ নামিয়ে ব'ললে—বাবার খুব অসুখ...তাই—

ব্যস্ততার সঙ্গে প্রতাপ ব'লে উঠ্‌লো— সে কি !—ঘোষাল মশায়ের কী হ'য়েচে ?

—খুব জ্বর।···জ্ঞান নেই।···আপনি আসুন না।

পাপী পাপ কাজে দশ হাত এগিয়ে যায়, কিন্তু ধর্ম্মের পথে পা বাড়াতে হ'লেই তার মাথায় লক্ষ বাজের আঘাত পড়ে ! নকলের খাতির সময়ের করে আসন্নকেও ছাপিয়ে ওঠে, কিন্তু মাঝ-রাস্তায় পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই তার পতন হয়।

প্রতাপ সপ্রতিভ ভাবে ঘোষাল মশায়ের কাছে যাওয়ার সাহস পাচ্ছিল না।

অরুন্ধতী দোরটা বন্ধ করে দিয়ে, ব'ললে—চলুন না ! মা-ও র'য়েচেন।

প্রতাপ বার-দুই মাথা চুল্‌কে নিয়ে ব'ললে—তাইতো,···ঘোষাল মশায়ের হঠাৎ জ্বর হয়ে পড়লো।···এখন আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে

অরু ?···যদি উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন,—মাথায় রক্ত জ'মে যাবে।···থাক্ আমি আর যাবো না।

অরুন্ধতী ক্রমশঃই এগিয়ে যাচ্ছিল। ফিরে দাঁড়িয়ে ব'ললে—মা কিন্তু অনেকবার আপনাকে খুঁজ্‌ছিলেন।

—কেন—কেন ?···কিছু কাজ আছে ?

—বাবার অসুখটা সম্ভবতঃ কঠিন হ'য়ে দাঁড়িয়েচে, তাই ডাক্তার—

—ও,—তা...ডাক্তার বাবুকে কি ডাকা হয় নি ?

—"না" ব'লে অরুন্ধতী ঘরে ঢুক্‌লো। এবং পূর্ব্বের মতই পিতার রুগ্ন শয্যাপার্শ্বে বস্‌লো।···একটি কথাও আর ব'ললে না।

গৃহিণী মুখ তুলে চাইলেন। ইঙ্গিতে প্রতাপকে বস্‌তে ব'ললেন।

প্রতাপ অনিচ্ছায় উপবেশন করলে।

এম্‌নি সময় ঘোষাল মশায় চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—নন্তু! নন্তু! বাবা—আমি যে তোর শ্বশুর! এত বড় ছলনা কি আমার সঙ্গে করতে হয় ? একি ধর্ম্মে সইবে ?

প্রতাপচাঁদ এবং অরুন্ধতী পরস্পর মুখ চাওয়া-চাৱি করলে, অরুন্ধতী দু' হাঁটুর ফাঁকে মাথা রেখে কান্না সুরু করলে।

ঘোষাল মশায় আবার চীৎকার সুরু করলেন—অনুপমাকে মেরে ফেলেচিস্—অরুন্ধতীকে মারবার ফিকির খুঁজ্‌চিস্—তবু তোর সাধ মিট্‌লো না বাবা ?···গরীবের মাংসে চপ্-কাট্‌লেট খাবি ? ভা-রি সাধ হ'য়েচে—না ?

অরুন্ধতী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। ব'ললে—প্রতাপবাবু! আপনার

ায়ে পড়ি—ডাক্তার ডাকুন! বাবা গেলে দুনিয়ায় আমাদের যে কেউ াক্‌বে না!···আপনার পায়ে পড়ি...যান।

—যাচ্ছি,—ব্যস্ত হ'য়োনা অরু। অসুখ কঠিন নয়। আজ এগার ছর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসে করছি আমি। হাজার-হাজার রুগী ামার ওষুধ খেয়ে এক দম্ আরাম হ'য়ে গেছে। ভয় কি?—এক্ষুণি ামি ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। দু'দাগেই আরাম হবে।

ঘোষাল মশায় কট্‌মট্ করে চাইলেন। চোখ দুটো জবাফুলের মত াঙা টক্‌টকে!

ব'ললেন— কি—কি ব'লছো?—আরাম হবে? পাগল! তা কি ়খনো হয়?···দুষ্‌মন বেঁচে থাক্‌তে আরামের নিশ্বাস কি পড়ে?··· কন্তু কেন তাকে দুষ্‌মন বল্‌ছি?···হ্যাঁ—দুষ্‌মনই তো! নইলে দবতার ওপর দৈত্যগিরি ফলাতে যায়!—হরলালের করুণার দান স কঠোর হ'য়ে আত্মসাৎ করলে!···সেই···হতভাগা নষ্ট,—বেঁচে াকতে আমার আরাম হওয়ার ভরসা আছে? কথ্‌খনো নাই।···কিন্তু ়মি কে?

প্রতাপের বুকখানা ধড়ফড়্ করে উঠলো। বর্ত্তমানে অপরাধের বোঝা স কতখানি বাড়িয়ে চ'লেছে—তা বলা শক্ত, কিন্তু অতীতের অপরাধের াস্তি, সে-যে একটুও তার ভোগ করা হয় নি!

প্রতাপ ভয়ে-ভয়ে বললে—আমি আপনার পুত্রস্থানীয়।

—কিন্তু পুত্র তো নও?—পুত্রস্থানীয়।···এ-ছাড়া আর কিছু পরিচয় নই?

অরুন্ধতী ব'ললে—ইনি জামাইবাবুর বন্ধু।···অনেকবার তাঁর সঙ্গে

এসেছিলেন। আজকাল আমাদের তত্ত্ব-তলাস নিচ্ছেন, খুব ভদ্রলোক।

রোষে ক্ষোভে রোগক্লান্ত ঘোষাল মশায় শ্রান্তিতে অবসন্ন হ'য়ে উঠ্‌লেন। হাঁপাতে হাঁপাতে ব'ল্‌লেন—অর্থাৎ ছোরায় ধার দিচ্ছেন।! আর কি নেবে বাপু!···জীবনভর আইবুড়ো হ'য়ে থাক্—সমাজ পায়ে ঠেলে সরিয়ে দিক, তবু অরুন্ধতীর বিয়ের নামও মুখে আন্‌বো না।···কিন্তু সত্যি সত্যিই যদি আমাদের খোঁজ নেওয়া তোমার উদ্দেশ্য হয়,—তাহলে একটা কথার সঠিক জবাব দেবে কি?

প্রতাপ অতি-মাত্রায় বিনীত হ'য়ে ব'ললে—আদেশ করুন, আমি ভগবানের নাম নিয়ে ব'লচি—

—চুপ্ চুপ্-!···অতখানি স্পর্দ্ধা ভালো নয় বাপু!···নন্তুর বন্ধু তো? ভগবানের নাম মুখে এনো না।···হ্যাঁ, কি ব'লচি জানো?—সেই ছোঁড়াটা কোথায় ব'ল্‌তে পারো?

—কে—নন্তু?

···হ্যাঁ,—নন্তু নয় তো কি—অনুপমার কথা বলচি?

প্রতাপ ব্যাগ থেকে একখানা খবরের কাগজ বের করে খুল্‌তে খুল্‌তে ব'ললে—আপনি মুখ দিয়ে যা উচ্চারণ করলেন—সত্যিই তা ফ'লে গেছে। ···এই দেখুন—আজকের কাগজেই বেরিয়েচে, নন্তু দার্জ্জিলিং গিয়ে, একটা পাহাড়ের মাথা থেকে প'ড়ে মারা গেছে। দেহটা তার ধুলো হ'য়ে গেছে।

অরুন্ধতী ও তার মা একইসঙ্গে অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন। ঘোষাল মশায় আর কথা না ক'য়ে হাঁপাতে লাগ্‌লেন। অরুন্ধতী ব'ললে—

াতাপবাবু!—কি ওষুধ দেবেন দিন। বাবার অবস্থা দেখ্ছেন া ?

প্রতাপ শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললে—আমি নিয়ে আস্‌চি। কিচ্ছু ঠিন হয় নি। একদাগেই সেরে যাবে।

প্রতাপচাঁদ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। খবরের কাগজখানা কিন্তু নিয়ে গেলনা। সদর-দোর বন্ধ করে এসে,—অরুন্ধতী কাগজ খুলে াড়লে। সত্যই নন্তুর মৃত্যু-সংবাদ ছাপার অক্ষরে সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত য়েচে।

কিন্তু "এক্ষুনি ওষুধ নিয়ে আস্‌চি," বলে প্রতাপচাঁদ চ'লে গেল, ঘণ্টা াতীত হয়ে গেলেও তার আর সাক্ষাৎ মিল্‌লো না!

ক্রমে সন্ধ্যা এল। ক'লকাতার রাস্তায়-রাস্তায় গ্যাস জ্বলে উঠলো।

অরুন্ধতী মাকে জিজ্ঞাসা করলে—কি হবে, মা?

গৃহিণী অশ্রু-সজল-চোখে রোগকাতর স্বামীর মুখপানে চেয়ে, মাথা ীচু করলেন। আজ যেন অকূল সাগরের বুকে প'ড়ে কূলের সন্ধান তাঁর াম্পূর্ণভাবেই হারিয়ে গেছে।

ঘোষাল মশায়ের একটুও জ্ঞান নেই। দৃষ্টি—উদাস—অর্থহারা! চোখ টো কোটরগত,—কণ্ঠে ভাষা নাই,—যেমন-তেমন প্রলাপোক্তিও নাই!

অরুন্ধতী ডাক্‌লে—বাবা! বাবা!

ঘোষাল মশায় কথাও কইতে পারলেন না, এবং বাহ্যজ্ঞান না থাকায় কন্যার পানে চাইতেও সমর্থ হলেন না।

অরুন্ধতী পিতার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে রোদনস্ফীত-কণ্ঠে ডাকতে াগলো—বাবাগো!—কথা কও বাবা আমার!

ঘোষাল মশায় বারকতক উচ্চারণ করলেন—নন্তু! নন্তু!…জোচ্চোর নন্তু!…অনুপমা!—অনু!…

অরুন্ধতী সহসা স্থির হয়ে উঠে ব'সলো। তারপর গলা ঝেড়ে ডাক্‌লে—মা!…ধৈর্য্য ধরতে পারবে না মা?

মাতা মুখ তুলে চাইলেন মাত্র, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করলেন না।

অরুন্ধতী চোখ মুছে পরিষ্কার কণ্ঠে ব'ললে—বিপদ যখন আসে, তখন সে দল পাকিয়ে বিবেচনাশূন্য হয়ে আসে।…ধৈর্য্য ছাড়া পথ নেই মা! তুমি বাবার কাছে ব'সো,—আমি চ'ললাম—

গৃহিণী ভীত হ'য়ে ব'ললেন—কোথা চ'ল্‌লি?—কেন?

—যাবো—হরলালবাবুর কাছে। তাঁর বাড়ীটা তো সেদিন দেখে এসেচি—

—কিন্তু প্রতাপ তো এখনো ফিরলো না অরু!

—আর তাকে ফিরতে হবে না। যদি আসে, আমার মাথার দিব্যি রইলো মা! কদাচ দোর খুলে দিয়ো না। ভণ্ড সব!…সত্যিই সব জোচ্চোরের দল!

গৃহিণী কিন্তু প্রতাপকে দোষী ভাবতে কষ্ট বোধ করছিলেন। ব'ললেন—সে আসবে মা!…যখন বলে গেলো—

—কিন্তু রাত ক'টা জানো? আস্‌বে কখন? এখনো কি তুমি সেই জোচ্চোরের ভরসা করে আমাকে থাকতে ব'লছো মা?…ভেবে দেখ—বাবার যদি কিছু হয়,—রাস্তার লোকে এসে আমাদের মুখে জুতো মেরে যাবে। ব'লতে ব'লতে সহসা অরুন্ধতী কেঁদে উঠে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ব'ললে—বাপের মেয়ে না রাজার মেয়ে!…কিন্তু কপালে আমার কি-যে আছে—

মাতা কন্যার মুখখাসা আপন বুকের কাছে টেনে এনে ব'ললেন—
ভগবানকে ডাক্ অরু !···সুখ-দুঃখ তাঁরই দেওয়া ।

অরুন্ধতী ব'ললে—সহ্য করার ক্ষমতা আর নেই মা !—ডাকার মত
ডাকও বুঝি কণ্ঠে নেই !···কিন্তু আর তো আমি দেরী করতে পারি না ।
উপায় হারিয়ে ফেল্‌লে, আর কি-তা খুঁজে পাবো মা ?···আমি
চ'ললাম ।

—কোথা—হরলালের ওখানে ?

—হ্যাঁ, তিনি ছাড়া আজ তো আর কারুর কথাই আমার মনে পড়চে
না মা ! ঐ যে ভগবানের নাম করলে—হয়তো তাঁর কথাও হরলাল-
বাবুর চেয়ে আজ আমি বেশী ভাবিনি ।···আজ কি মনে হচ্ছে জানো মা ?
—আমাদের সকলকার চেয়ে দিদিই বুঝি বেশী সুখী হয়েচে ।···তার বুকে
তা একটুও জ্বালা আসেনি মা !—জ্বলে পুড়ে মরার চেয়েও এ-জ্বালা যে
লক্ষ গুণ বেশী !—এ যে তুলনায় আসে না !···কিন্তু আর আমি দেরী
করবোনা,···সাবধান !—বাবার কাছ-ছাড়া হ'য়োনা যেন ।

মাতা ম্লান হাসি হাস্‌লেন !···হায়রে স্নেহ,—নিজের অন্তরে নিজেই
স্তোকবাক্যের জাল বুনে চলে !

অরুন্ধতী যেতে-যেতে ব'লে গেল—যাবার সময় তোমাকে আর-
একবার সাবধান করে দিচ্ছি মা !—সেই হতভাগাটা যদি আসে—যদি
চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে তার গলা ফেটে রক্ত বেরোয়, তবু দোর খুল্‌তে যেয়োনা ।

অরুন্ধতী বেরিয়ে যাওয়ার পর, দরজা বন্ধ করে গৃহিণী যখন ঘরে
ফিরে এলেন—তখন ঘোষাল মশায় আর একবার গোটাকতক কথা
কহিলেন—নন্তু ! নন্তু !—এ কি মানুষের কাজ বাবা ?

নয়

খুব সন্তর্পণে পা ফেলে-ফেলে অরুন্ধতী যখন হরলালদের বাটীর ফটকে এসে থাম্‌লো, তখন সুমুখের বড় আলোটা নিভে গেছে। দেউড়ীর দারোয়ানজী চিৎ হয়ে শুয়ে-শুয়ে ভজন-গান সুরু করেছে।

অরুন্ধতী ঢুক্‌তেই উঠে ব'সে দারোয়ান ব'ললে—কাঁহা যাতা ?

অরুন্ধতী সহসা হাত দুটো যোড় করে ব'ললে—আমার বড় বিপদ, —এক্ষুণি একবার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

দারোয়ান আর কিছু ব'ললে না।

অরুন্ধতী অন্দরের পথ জানতো না, একদিন মাত্র এ-বাড়ীতে সে এসেছিল—তা-ও হরলালের সঙ্গে দেখা হয়নি, হরলালের বাপের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়—বৈঠকখানা-ঘরে। সুতরাং বৈঠকখানার দোরে এসে, রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে সে মাথাটায় হাত রেখে সেখানেই চুপ করে ব'সে পড়লো।

শূণ্য বৈঠকখানায়—কেউ নাই খাঁ-খাঁ কর্‌ছে!…আলোটাও আর জ্বলে না।

আশ্চর্য্য—অতবড় বাড়ীতে একটা চাকর-দাসীর সঙ্গেও অরুন্ধতীর সাক্ষাৎ হ'ল না। অথচ বাপ তার অন্তিম-শয়নে! বিপদে অধৈর্য্য হ'য়ে কালহরণ করবার মেয়ে অরুন্ধতী নয়—সে সাহসে ভর করে ডাক্‌লে —বাড়ীতে কে আছেন ?

কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না।

আবার ডাক্‌লে—দয়া করে একবারটি বেরিয়ে আসুন!···হরলাল বাবু!

বাড়ীর সরকার বেরিয়ে এসে ব'ললে—কে তুমি? কাকে চাও—?

—হরলালবাবুকে।···

সরকার বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কোনো প্রকারে জবাব দিলে—তিনি নেই বাড়ীতে।

অরুন্ধতীর অবস্থা যা হ'ল,—তা দুনিয়ার যে-কোনো লোকেই অনুধাবন করতে পারবে।

সরকার জিজ্ঞাসা করলে—তোমার বাড়ী কোথা? কোথেকে আস্‌চো?

অরুন্ধতী করযোড়ে ব'ললে—সে-সব পরে বলবো,—আপনার পায়ে পড়ি—একটিবার কর্ত্তাবাবুর কাছে আমায় নিয়ে চলুন।

—আজ আর হবেনা বাছা! তাঁর মন খুব খারাপ, সম্ভবতঃ দেখা করবেন না।

—করবেন, আমাকে দেখ্‌লেই তিনি চিন্‌তে পারবেন।···আপনার পায়ে পড়চি,—দয়া করুন···

সরকার ডান-দিকে হাত বাড়িয়ে ব'ললে—ঐ যে সিঁড়ি—সোজা তেতলায় উঠে যাও···সুমুখের বড় বারান্দাওলা ঘরে।

আর এক সেকেণ্ডও অরুন্ধতী নীচে অপেক্ষা করলে না।

গড়গড়ার নলটা হাতে রয়েচে, বাঁ হাতখানা গালে দিয়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কর্ত্তাবাবু। চিন্তার কুঞ্চিত রেখা ললাটে আঁকা! মুখের ভাব —কি-জানি কেমন ধারা!

অরুন্ধতী ধীরে-ধীরে ঘরে ঢুকে, কর্ত্তার খাটের নীচে বসে পড়লো। তারপর অতি নিম্নকণ্ঠে অথচ অকুণ্ঠ হ'য়ে ডাক্‌লে—বাবা!

কর্ত্তাবাবু ধড়মড় করে উঠে বসলেন। হাত থেকে তাঁর নলটা মাটীতে পড়ে গেল।

অরুন্ধতী ব'ললে—আমাকে চিন্‌তে পারেন, বাবা?

কর্ত্তা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে বাঁ হাত দিয়ে চোখ মুছলেন, তারপর গম্ভীর হয়ে ব'ললেন—মুখখানা দেখা-দেখা—কিন্তু নাম তো মনে নেই বাছা!···

—আমি অরুন্ধতী।

—অরুন্ধতী!···এত রাত্রে!—এখানে?···আবার তোমাদের কি হ'ল?

—হরলালবাবু···

—চুপ কর মা!···কী হয়েচে বল্‌!

—হরলালবাবু···

—আ র!···ঐ কথা ব'লতে এসেচিস্‌? তবে চ'লে যা অরুন্ধতী! আমার দেহ আজ ক্লান্ত।

অরুন্ধতী এক বিন্দুও বুঝতে পারলে না যে হঠাৎ এ-ভাবান্তর কেন! ঠিক যেন মস্তিষ্ক-বিকৃতি!

ব'ললে—আমার বাবার খুব ব্যারাম।···বাঁচেন কি-না সন্দেহ, সারাদিন বিনা চিকিৎসায় প'ড়ে আছেন।

কর্ত্তার কণ্ঠ কর্কশ হ'লেও তাতে কারুণ্যের উষ্ণ-প্রস্রবন ছিল। ব'ললেন—কিন্তু আমি তার কি করবো বাছা!···যদি না-ই বাঁচেন, মানুষে তার করবে কী? যা সংসারের দস্তুর তা-যে হ'তেই হবে। কিন্তু কি ব'ললে—বিনা চিকিৎসায় সারাদিন প'ড়ে আছেন?

—আজ্ঞে।

—কেন? এতখানি পথ রাতের বেলায় একা আসতে পারলে, আর একটা ডাক্তারের বাড়ী যেতে পারোনি?···যত সব চাকরের কাজ বুঝি হরার জন্যে? হরা নেই।···সে যাবে না। ডেকে কেঁদে বুক চৌচির হ'য়ে গেলেও তার যাবার হুকুম নেই।···যদি আমি ডাকি তবু সে যাবে না।···কিন্তু সত্যি বলছো অরুন্ধতী···ডাক্তার ডাকা হয় নি?

—না বাবা! পয়সা নেই, আজ দু'দিন আমরা অনাহারে রয়েচি, ডাক্তার কি দিয়ে ডাক্‌বো?

কর্ত্তা ভয়ানক অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলেন। এবং অন্যমনস্কতার ভিতর ডান হাতটা বাড়িয়ে গড়গড়ার নল খুঁজতে লাগলেন।

অরুন্ধতী নলটা তাঁর হাতে দিয়ে পা-তলার কাছে ব'সে পড়লো। তারপর খুব কাঁদ-কাঁদ হয়ে ডাক্‌লে—বাবা!

কর্ত্তা তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—হরাকে এখন আর পাওয়া যাবে না। আজ সন্ধ্যেবেলা সে গ্রেপ্তার হয়েচে। হাজত-বাস করছে। যেতে পারবে সেখানে?

একটা প্রবল আর্ত্তনাদের স্বর অরুন্ধতীর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো। একথা শোনার পর আর দ্বিতীয় কথা বলবার স্পর্দ্ধা বা আকাঙ্খা অরুন্ধতীর কোনো রকমেই মনে এলো না।

কর্ত্তা বললেন—পুলিশে আমার ছেলের, রাজারাম মুখুয্যের ছেলের হাতে হাতকড়ি লাগায়—দুনিয়াটা আজকাল কি-তালে চলচে জানিস্ অরুন্ধতী ?

—কিন্তু কেন বাবা ?—কেন তারা তাঁকে ধরলে ?

—স্বদেশী দলের দলপতি না-কি—এমনি একটা অপরাধ করেছিল বুঝি।

চোখ মুছ্তে মুছ্তে অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কেন প্রতীকার করলেন না বাবা ?...বিনা বিচারে—

—বিচার ব'লে কোন জিনিস এ-রাজ্যে নেই মা !...অবিচার আছে।...সত্যিই আমি প্রতীকার করিনি অরুন্ধতী !...করতে পারলাম না।...কিন্তু কেন জানিস্ ? আমি তাকে পই-পই করে বারণ করেছিলাম।

মাথা হেঁট করে অরুন্ধতী ব'ললে—কিন্তু এখনো তো সময় আছে বাবা ! আপনি আর অভিমান ক'রে ব'সে থাকবেন না।...এখনো সময় আছে।

জোরে জোরে কর্ত্তাবাবু তামাক টান্তে লাগ্লেন

বারান্দায় একটা বড় ঘড়ি টাঙানো ছিল, তাতে ঢং ঢং ক'রে এগারোটা বাজ্লো।

অরুন্ধতীর বুকখানায় কে-যেন দমাদ্দম্ হাতুড়ির ঘা মারতে সুরু করলে।

তার দু'টি চক্ষুর পুরোভাগে ভেসে উঠলো তার মৃত্যুছায়ামলিন পিতার মুখ, আর শৃঙ্খলিত লাঞ্ছিত বন্দী হরলালের প্রশান্ত হাস্যমণ্ডিত অম্লান সৌন্দর্য্য !...সুখ কোনোখানেই আজ পাওনা নাই, সান্ত্বনার ভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেছে ! নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনু-পরমানুর বুক থেকে

অধীর ব্যগ্রতায় বেরিয়ে আস্‌তে চায়—হাহাকার! ব্যর্থতা! অকরুণ ব্যবহারের তীব্র কালিমা!

অকস্মাৎ কর্ত্তাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন।

ভীতা অরুন্ধতীর কণ্ঠে ভাষা ফুট্‌লো না; অথচ সে এসেছিল বাপের জীবন রক্ষার আয়ু খুঁজ্‌তে! আজ তার মাথায় জ্বলন্ত বাজ, বুকে ধারালো বর্শা! অপদার্থ দেহটা তবু প্রাণহীন হওয়ার সৌভাগ্য পায় না! ...প্রাক্তনের লীলা!

কর্ত্তাবাবু অধীরকণ্ঠে ডাক্‌লেন—অরুন্ধতী!

—কেন বাবা

—'নিয়ে আয় তো আমার চাবিছড়াটা।' ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে তিনি লোহার সিন্দুকটার সুমুখে এসে দাঁড়ালেন।

অরুন্ধতী ব'ললে—চাবি কোথায় আছে, আমি তো জানি না বাবা!

—জানিস্ না?...কিন্তু সে জান্‌তো। অথচ একটা দিনও এক-আধলা না ব'লে নিত না। বারণ করেছিলাম কিনা,...বালিশের তলে—গদির নীচে...শীগ্‌গীর নিয়ে আয়—

অরুন্ধতী চাবিছড়া কর্ত্তাবাবুর হাতে দিতে গেল যখন, তখন তাঁর মুখখানা ছাই-এর মত সাদা হ'য়ে গেছে! ধীরে অথচ অতি করুণ কণ্ঠে ব'ললেন—মা! অরুন্ধতী! বড় অবিচার করলাম যে মা!

অরুন্ধতীরও চোখ ছল্‌ছল্‌ করছিল। ব'ললে—কি বাবা? কি করলেন?

কর্ত্তাবাবু সহসা অরুন্ধতীর মাথায় হাত দিয়ে প্রগাঢ় স্নেহে তাকে কোলের কাছে টেনে এনে ব'ললেন,—অবিচার—আগাগোড়াই

অবিচার করেছি মা। তার ওপরে,—তোর ওপরেও,···কিন্তু আর না,—অনেক দেরী হ'ল।···নে—খোল্ দেখি সিন্দুকটা—

চাবিছড়া বাড়িয়ে দিয়ে, অরুন্ধতী ব'ললে—আপনিই খুলুন বাবা! আমি তো কখনো লোহার সিন্দুক খুলি নি,—কি ক'রে খুল্তে হয় তা জানি না।

কর্ত্তা তাড়াতাড়ি সিন্দুক খুলে—এক তাড়া নোট বের করে, অরুন্ধতীর আঁচলে বাঁধ্তে বাঁধ্তে, ব'ললেন—সহরের সেরা ডাক্তার নিয়ে আস্বি। টাকা অনেক রইলো। কাল সকালে যেন খবর পাই।

অরুন্ধতী জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্লো।

কর্ত্তা চীৎকার করে উঠ্লেন—রামভজন!—দীনুয়া!—

···ভৃত্য ছুটে আস্তেই ব'ললেন—জল্দি মোটর গাড়ী!···বহুৎ তুরন্ত!

আধঘণ্টা পরে মোটর গাড়ী ফিরে আসার শব্দে সচকিত হ'য়ে, কর্ত্তাবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

অরুন্ধতীর পিতার অবস্থা জ্ঞাত হওয়াই তাঁর ইচ্ছা ছিল; কিন্তু মন এতই অবসন্ন যে, অন্যমনস্কতার আবরণে অভিপ্রায় চাপা প'ড়ে গেল।

সমস্ত রাত্রিই তাঁর নিদ্রা হ'ল না—একটা প্রবল অস্বস্তির সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধে ক্রমশঃই অধিক রাত্রে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লেন।

একমাত্র মাতৃহীন পুত্র কারাগারে বিনাদোষে বন্দী,—স্নেহের ফল্গু, কর্ত্তাবাবুর বুকের শিরায়-শিরায় উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করছিল।

এ-যেন একান্ত অসহ, জ্বালার অসীমতায় মৃত্যু কামনা করতে প্রাণ আকুলি-বিকুলি ক'রে ওঠে!

তন্দ্রার ভাব ছুটে গেল—একটা আকস্মিক গোলমালে।

অনেকগুলো চাকর-বাকর বকাবকি করতে করতে ভিতরে ঢুকছিল।

খাটের উপর উঠে ব'সে, আপন মনেই কর্ত্তাবাবু ব'ললেন—স্বেচ্ছায় সুখের মাথায় পয়জার মেরেছি, বড় অভিমানে চ'লে গেছে সে, দুঃখ ছাড়া গতি কি?···তারপর ঘর থেকেই চীৎকার করলেন—অত গোল হচ্ছে কেন রে?···ব্যাটারা এত চেঁচায়,···একটু যদি ঘুমুতে দেবে।···

একজন ভৃত্য এসে ভয়ে-ভয়ে সংবাদ দিলে—সদরদোরে একটি মেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে ছিল—এইমাত্র তাকে বাড়ীর ভিতর আনা হ'য়েচে। মেয়েটির এখনো জ্ঞান হয় নি।

কর্ত্তা একান্ত বিস্মিত হ'য়ে খানিকক্ষণ নীরবে রইলেন, তারপর ব্যস্ততার সঙ্গে ব'ললেন—শীগ্‌গীর নিয়ে আয় তাকে,—এই আমার ঘরেই নিয়ে আয়!···ব্যাটারা সব অকর্ম্মার দল, এতক্ষণ করছিলে কি? আগে সংবাদ দিতে পারিস্ নি?··

যতটুকু তাড়াতাড়ি সম্ভব, ততটুকু তাড়াতাড়ির সঙ্গে জ্ঞানহীনা তরুণীকে যখন আনা হ'ল, তখন কর্ত্তাবাবু ঘরের মেঝেটাকেই গড়েরমাঠ ভেবে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

কিন্তু একি!—কল্পনাই তাহলে বাস্তবে এসেচে! আশঙ্কা সত্যের মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে তাঁর চোখ দুটোকে ছলনা করতে এলে না তো!

জ্ঞানহীনা অরুন্ধতী···

কিন্তু কেন ?···তার বাপের অবস্থা···

কর্ত্তা চীৎকার করে উঠ্‌লেন—ডাক্তার কোথায় ?

সরকার সুমুখেই দাঁড়িয়ে ছিল, ব'ললে—ডাক্তার ডাক্‌বো কি ?

কর্ত্তা তীব্র তিরস্কার করে উঠ্‌লেন—না, তা কেন ডাক্‌বে, আমার ঘাড় মট্‌কে রক্ত চুষে খাবে।···যত সব গোমুর্খের দল! মেয়েটার জ্ঞান নেই, তবু ডাক্তার ডাক্‌তে হবে কি-না তা জানো না ?

ঠিক পনের মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার এলো এবং তার মিনিট কতকের মধ্যে অরুন্ধতী সংজ্ঞা ফিরে পেলে।

ডাক্তার বিদায় নেওয়ার সময় আশ্বাস দিয়ে গেল, ভয়ের কারণ নাই।

বৃদ্ধ কর্ত্তাবাবু স্নেহাশ্রিত পুত্রের মুখখানাই তখন ভাবছিলেন।

এই অরুন্ধতী এবং তার মা-বাবা সবাই হরলালের একান্ত প্রিয়পাত্র এবং আশ্রিত ছিল।···আজ বিশ্বের লক্ষ দুয়ার উন্মুক্ত থাক্‌লেও অরুন্ধতী যে এই-বাড়ীর দোর-গোড়ায় জ্ঞানহারা হ'য়ে লুটোপুটি খাচ্ছিল—এও আশ্রিত থাকারই প্রধানতম কারণ।

ভিড় কমিয়ে দিয়ে, কর্ত্তাবাবু বাঁ-হাতে চোখ দুটো একবার ভাল করে মুছে নিলেন ; তারপর অরুন্ধতীর মাথার কাছে ব'সে, তার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে ডাক্‌লেন—মা!

অরুন্ধতী সহসা কর্ত্তাবাবুর হাত দু'খানা চেপে ধরে, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে উঠ্‌লো, তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসে ব'ললে—সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে বাবা—

কর্ত্তাবাবু ব'ললেন—যা হ'য়েচে তা কি আর ফিরবে মা ?...

তিনি ভেবেছিলেন, অরুন্ধতীর বাপ সম্ভবতঃ ইহজগত থেকে চিরবিদায় নিয়ে গেছেন।

অরুন্ধতী ব'ললে—ফিরবে না জেনেই তো আজ দুঃখ রাখবার ঠাঁই পাচ্ছি না বাবা!...কিন্তু উপায় ক'রে দিন।...অনাথিনীর এ-বিপদে আর তো কেউ হাজির নেই বাবা! সঙ্গে-সঙ্গে মা-ও পালিয়ে গেছেন! তাঁদের কারুর সঙ্গেই যাবার সময় আমার দেখা হয় নি।

—কিন্তু তোর মায়ের অসুখ ছিল,—সেকথা তো আমায় বলিস্‌নি ?

—মার কিছু হয়নি তো!···মা আমার স্বেচ্ছায় জ্বালা নইতে না পেরে, আফিং খেয়ে···

ব'লতে ব'লতে, অরুন্ধতী কর্ত্তাবাবুর দু'পায়ের মধ্যে মাথা দিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লো।

কর্ত্তাবাবু সান্ত্বনার বাণী কণ্ঠে খুঁজে পেলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন —কেমন করে জান্‌লি—আফিং খেয়েই—

অরুন্ধতী মুখ না তুলেই জবাব দিলে—বাবার আফিংএর কৌটোটা পাশেই খালি হ'য়ে প'ড়ে রয়েচে।···তাছাড়া আমি যখন পৌঁছুলাম তখনো মা আমার পালাতে পারে নি, ছট্‌ফট্‌ করছিল।···হয়তো মাকে বাঁচানো যেতো,···কিন্তু পোড়াকপালি আমি, তাই মোটর-খানা বিদেয় করে দিয়েছিলাম।

—ডাক্তার ডাকা হয় নি ?

—বাবার জন্যে ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়ে, আমি বাড়ী চ'লে গেলাম, মোটরও এখানে রওনা হ'ল।—ডাক্তারবাবু যখন গেলেন—তখন বাবার তো অনেকক্ষণ সব শেষ হ'য়ে গেছে, মা-ও বেঁচে

নেই।···আমার যে কেউ বেঁচে রইলো না বাবা! কে আমাকে দেখবে?

কর্ত্তাবাবুর চোখ বেয়ে টস্ টস্ করে অশ্রু ঝরছিল। কণ্ঠ পরিষ্কার করে ব'ললেন—শোক করবার সময় নয় মা! বুকে শক্তি ধরতে হবে,···ওরে মা!—এ-যে মাতৃ-পিতৃ শোক,—এ শোকে কি সান্ত্বনা আছে?···সহ্যই করতে হবে শুধু।

অরুন্ধতীর চোখ দুটো সহসা শুষ্ক হ'য়ে উঠলো। শোকের দুঃসহ জ্বালার পর অন্তরটা বুঝি পাষাণ হ'য়ে গেছে! ধীরে ধীরে অথচ সুস্পষ্ট ভাবে ব'লতে লাগলো—সহ্যই করতে হবে শুধু! কিন্তু কত সইবো? দেখছো বাবা?—একবার এই মুখখানার পানে চাও দেখি,—কত সহ্য করে র'য়েচি!···অপমান, লাঞ্ছনা, তিরস্কার, অত্যাচার ···সব গা-সহা, তবু বুকের কল-কব্জাগুলো বিকল হ'য়ে যায়নি বাবা!··· কিন্তু আর তো পারি না,—সংসারের সব আশ্রয় যার ঘুচে যায়, —সে কেমন করে বেঁচে থাকে!···সইবো কত আর?

কর্ত্তাবাবু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। আস্তে আস্তে অরুন্ধতীর হাত ধরে তুললেন। তারপর বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে আপন মনেই বললেন—হরাদের সমিতিতে একটা খবর দেব নাকি!···

অরুন্ধতী ব'ললে—তুমি যাবে না, বাবা?

কর্ত্তাবাবু জবাব না দিয়ে ভাবছিলেন হরলালকে সেখানকার লোকেই তো তাঁর কাছে অপরাধী করতে এসেছিল। তারা যে ভণ্ড তার প্রমাণ হরলালের গ্রেপ্তার হওয়াতেই জানা গেছে।

অরুন্ধতী মিনতির সুরে ব'ললে—যাবে না বাবা!···তুমি যদি না যাও,

আমি কার কাছে...কী ব'লে দাঁড়াবো? ··তোমার পায়ে পড়ছি বাবা।

কান্নার হাসিতে কর্ত্তাবাবুর কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ললেন—আমি যাব না একথা তুই ভাবলি কেমন করে মা?···আমারও যে আজ কেউ নেই অরুন্ধতী।···দুঃখ রাখবার ঠাঁই আজ যদি আমার থাকে তো তোরই কাছে মা!···যাবো যাবো অরুন্ধতী! আমি যাবো,···কিন্তু ভাবছিলাম কি জানিস্ মা?···হরলালদের একটা সমিতি আছে, সেখানে নাকি অনেক সৎকাজ হয়। তাদের খবর দেব কি না···কিন্তু তারাই আবার হরলালকে ধরিয়ে দিয়েছে মা! পুলিশ তাদের কথাকেই বড় ভেবেছিল। প্রতাপচাঁদ বলে একটা গুণ্ডা—

—ও-নাম আর উচ্চারণ ক'রো না বাবা! সর্ব্বনাশ যা হবার তা হয়েইছে, এরপরও কি সইবার শক্তি থাক্‌বে? তাকে আমরাও জানি বাবা! মর্ম্মে-মর্ম্মে জানি। লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মূল তো সেই-ই। আগে বুঝিনি, যখন বুঝলাম, তখন হয়তো না বুঝলেও ক্ষতি ছিল না।

একটা কথাও আর কর্ত্তাবাবুর মুখ থেকে বেরুলো না। মাত্র দু'টি কথা জোরে কইলেন—"মোটর্-কার।"

তখন রাস্তার গ্যাস নিভানো হচ্ছিল।

রাজারাম মুখুয্যের মোটর গাড়ী অরুন্ধতীদের বাড়ীর দোরে গিয়ে থাম্‌লো।

মৃদু অন্ধকারে কর্ত্তাবাবুর নজর চ'ল্লো না বটে, কিন্তু অরুন্ধতী স্পষ্ট দেখতে পেলে—প্রতাপচাঁদ পাশের গলি দিয়ে হন্ হন্ করে চলে যাচ্ছে।

দশ

বৃদ্ধ রাজারাম মুখুয্যে তখনি লোক পাঠিয়ে নিজের পাড়া থেকে মৃত-সংকারের ব্যবস্থা করলেন বটে, কিন্তু আসল গলদটুকুই তার খেয়াল রইলো না।

তাঁর সরকারবাবু যখন স্মরণ করিয়ে দিলে—অরুন্ধতীর বাপের না-হয় ব্যারামে মৃত্যু হয়েচে, বিশেষতঃ যখন ডাক্তার ডাকা হয়েছিল, তখন সার্টিফিকেট মিলবেই, কিন্তু অরুন্ধতীর মাতা অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করেছেন—এ-দেহ নির্ব্বিবাদে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, তখন রাজারাম মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন।

অরুন্ধতী কাঁদ্তে কাঁদ্তে ভাবলে—সন্তানের ওপর মা এমন শত্রুতাও করতে পারে!...মা নিজের সুখ দেখতে আত্মহত্যা করলেন, ম'রে সকল জ্বালা জয় করে গেলেন। কিন্তু অভাগী মেয়ের ভাবনা একবারও ভেবে দেখলেন না। কিন্তু তখনি তার মনে হ'ল—মা আমার বড় জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে শান্তির আশায় মৃত্যু বরণ করেছেন। হে ভগবান, মাকে আমার শান্তি দাও, তাঁর সকল দুঃখের আগুন তোমার চরণজলে নির্ব্বাপিত করো।

বর্ত্তমানের দুনিয়া অর্থের ক্রীতদাস। তাই রাজারাম অল্প আয়াসে, জন্মদুঃখী দম্পতীযুগলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করতে সমর্থ হলেন।

চিতার আগুনে অরুন্ধতীর জ্বালা লক্ষ গুণে বেড়ে উঠলেও, তার মাতাপিতার সকল দাহ শ্মশানাগ্নির দাহিকায় শীতল হ'য়ে গেল।

রাজারাম অনাথা অরুন্ধতীর হাত ধরে, তাঁর আপন ভবনে ফিরে এলেন।

অরুন্ধতী যেন পাষাণময়ী, তার দেহে যেন আর কিছুরই অনুভূতি নাই!

জ্বালার উপর শত জ্বালার সৃষ্টি হ'ল—যখন সে শুনতে পেলে, বিচারকের সুবিচারে হরলাল অস্থায়ীকালের জন্য সুদূর অঞ্চলে নির্ব্বাসিত হ'য়েচে। অন্তরীণের ব্যবস্থা! সে যে কবে ফিরে আসবে, হয়তো স্বয়ং বিচারকই জানতেন না।

সেই দিনই অনেকখানি রাত্রে রাজারাম অরুন্ধতীকে ব'ললেন—তোর সেই টাকাগুলো কোথায় রেখেছিলি? এ-বাড়ী আসার সময় আনিসনি তো?

অরুন্ধতী টাকার কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত, হ'য়েছিল। এতক্ষণে তার খেয়াল হ'ল। ব'ললে—ধনে-প্রাণে মারা-যাওয়া—এ-কথাটা কানেই শুনে এসেছি বাবা! আজ আমি আমারই জীবনে তার প্রমাণ পেলাম। কিন্তু কত টাকা দিয়েছিলে বাবা? তোমার মনে আছে?

—শত্ খানেক হবে।—কিন্তু কোথায় রেখেছিলি?...

—আঁচল থেকে খুলে একখানা নোট ডাক্তারবাবুকে দিয়েছিলাম, আর বাকীগুলো মায়ের মাথার কাছে রেখে তাঁর বুকে-পিঠে হাত দিয়ে যখন দেখি প্রাণ আছে কি নেই, সেই সময় ডাক্তারবাবু বিদায় হ'য়ে যান।

তারপর একটুখানি পরেই এ-বাড়ীতে ছুটে চলে আসি। টাকা সেখানেই প'ড়ে ছিল।

—তাহ'লে চুরি হ'য়েচে। কিন্তু এতবড় পাষণ্ড কি ভগবানের রাজ্যে আছে মা? দু-দু'টো মৃতদেহের শিয়র থেকে টাকা নিয়ে পালাতে পারে? এই পাপেই আজ জগতের এই দুর্দ্দশা! জানিস্ মা অরুন্ধতী! শুধু এই হীন কাজের জন্যেই ভগবান তাঁর চোখ-দুটো সংসার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন। তাঁর লজ্জা রাখ্‌বার ঠাঁই মেলে না তো! ...এ-ও কি সহ্য হয় মা! আপন হাতের তৈরী সন্তান-সন্ততি, স্রষ্টার এ-হেন অপমান করতে পারে!

অরুন্ধতী চিন্তা করতে করতে সহসা বলে উঠ্‌লো...কিন্তু চোর আমি ধরে দিতে পারি।

—সে কি...কারুর ওপর সন্দেহ হচ্ছে?

—সন্দেহ নয়—আমার বেশ মনে পড়চে, আমি তাকে স্বচক্ষে দেখেচি।...কে জানো? সেই প্রতাপচাঁদবাবু! আমি ব'লছি বাবা, সে ছাড়া আর কেউ নয়।

—ভগবান তাকে মার্জ্জনা করলে সে মার্জ্জনা পাবে। আমরা কিন্তু তাকে অপরাধী করে রাখবো না মা! সে টাকা নিয়ে যা-খুসী করুক। কথা কি জানিস অরুন্ধতী? সাপে মানুষ কামড়ায় বলে সাপ দেখ্‌লেই মানুষ সকল সময় তাকে মারতে পারে না। মনে আতঙ্ক আসে—পাছে সে ছোবল দেয়!

অরুন্ধতী ব'ললে—কিন্তু ঘরে সাপ পুষে তো কেউ নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিশ্বাস ফেল্‌তে পারে না বাবা! মিনিটে-মিনিটে ছোবলের ভয় হয় ব'লেই

সাপুড়ে ডাকে, অথবা নিজেই প্রতীকার করতে দাঁড়ায়।···প্রতাপচাঁদকে আজ যদি ছেড়ে দাও বাবা! কাল সে ছোবল দিতে আবার এগিয়ে আস্‌বে।···তাকে পুলিশে ধরিয়ে দাও!

বিরক্তির সুরে রাজারাম ব'ললেন—ঘেন্না ধরে গেছে মা! হরাটার পরিণাম দেখে, পুলিশের ওপর আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে। চোর হোক্‌, বাটপাড় হোক্‌—যাই হোক্‌, তবু সে পরিচিত।··শত্রুর হাতে তাকে দিই কি করে?

—শত্রু তুমি কাকে ব'লচো বাবা? কে শত্রু—পুলিশ? ভুল কথা বাবা! পুলিশ শান্তিরক্ষক, তারা মিত্র। শত্রু যদি কেউ হয় তো ঐ প্রতাপচাঁদই। যদি আজ তেত্রিশ কোটী দেবতার সাক্ষাৎ পেতাম বাবা! তাঁদের চরণ ছুঁয়ে শপথ করে ব'লতাম, প্রতাপচাঁদের দোষেই এ-হেন সর্ব্বনাশ হ'য়েচে।

রাজারাম গালে হাত দিয়ে ব'সে-ব'সে বহুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর অরুন্ধতীকে ব'ললেন,—দেরাজটা খোল্‌ তো মা! চিঠি লেখা কাগজ-পত্র আছে, বের ক'রে দে।

তারপর প্রকাণ্ড একখানা দরখাস্ত লিখে, বার-কতক প'ড়ে প'ড়ে ভাঁজ করে রাখলেন।

অরুন্ধতী কোন কথাই জিজ্ঞাসা করলে না।......

...দিন পাঁচেক পরে, একদিন সংবাদপত্রে দেখা গেল—ছুতোর পাড়ার 'দেশোদ্ধারকারিণী-সমিতি'র গয়ায় পিণ্ডি লাভ হ'য়েচে এবং অনেক ভদ্র-সন্তান জাল জোচ্চুরীর দারুণ অপরাধে অভিযুক্ত হ'য়ে পুলিশ-পাহারায় হাজতে বাস করছে।...পাণ্ডার নাম প্রতাপচাঁদ।...

রাজারাম জিজ্ঞাসা করলেন—কাজটা কি ভাল হ'ল মা ?

বিস্মিত হ'য়ে অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা করলে—কোন্ কাজটা বাবা ?

—এই সমিতির উচ্ছেদ আর প্রতাপচাঁদের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে ?

—লক্ষ-লক্ষবার ভাল হ'য়েচে বাবা। ধ্বংস-পথকে শ্রেষ্ঠ পথ ভেবে যদি মানুষেই বেছে নিতে পারে তো তাকে ফিরিয়ে আনার ভারও মানুষকেই বইতে হয়।

অরুন্ধতীর মাতৃ-পিতৃ-শ্রাদ্ধ সুশৃঙ্খলায় শেষ হ'য়ে গেলে, রাজারাম অরুন্ধতীকে ব'ললেন—বুড়ো ছেলের একটা অনুরোধ আছে মা! শুনতে হবে।

অরুন্ধতীর বুকখানায় কান্না ঠেলে উঠছিল। বললে—অনুরোধ কেন ব'লছো বাবা!—আমার পাপের বোঝা ভারী হ'লে কি সুখ পাবে তুমি?...অনুরোধ ব'লোনা—বলো আদেশ।...কিন্তু শুনবার জন্যে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত হয়ে রয়েচি বাবা!—কি আদেশ বলো ?

ছল-ছল চোখে রাজারাম বলতে লাগলেন—হরলালকে আপাততঃ হারিয়েছি কিনা, তাই তার স্নেহটাও তোরই ওপর এসে পড়েচে,—একসঙ্গে তুই এখন আমার পুত্র-কন্যা।...তাই সকল কিছু করবার আগে তোর যুক্তিটাও আমাকে নিতে হবে। কিন্তু তারও আজ ব্যতিক্রম ঘটে গেছে মা!—আমারই দোষে—

অরুন্ধতী বলে উঠলো—আমি যদি তোমার মেয়ে না হ'য়ে ছেলে হতে পারতাম বাবা!...

রাজারাম ব'লে উঠলেন—ভালো হ'ত না অরুন্ধতী,—হয়তো এত স্নেহ তোকে করতে পারতাম না।…ওরে অভাগী!…সে-যে বড় আশায় আমার মুখপানে চেয়ে নিরাশ হ'য়ে চাঁদমুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল!… তার সব সাধ ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিলাম—নামিল ঘর ব'লে!…নইলে আজ অরুন্ধতী—মা আমার!—তুই এই মুখুয্যে-বংশের কুললক্ষ্মী হয়ে…

রাজারাম আর বলতে পারলেন না। রোদনের ভারে কণ্ঠ তাঁর ভারি হ'য়ে উঠলো।

অরুন্ধতীর মুখখানা অধীর আনন্দে আর দুঃসহ বেদনায় ফুলে উঠলো! ভূমিকম্পে মরুভূমির বুকে বারি-স্রোত বয়, আবার নদীর কিনারে আগ্নেয়-প্রস্রবন ছোটে!

রাজারাম ব'ললেন—কি করেছি জানিস্ মা! তোর পরামর্শ না নিয়ে একটা পল্লীগ্রামে অনেক টাকার সম্পত্তি কিনে ফেলেচি। সে-একটা বিপুল জমিদারী!—রাজার হালে জীবন কাটবে!—কিন্তু সে হতভাগার ভোগে লাগলো না!

অরুন্ধতী মুখ নামিয়ে, অশ্রু গোপন করতে করতে বললে—ব্যস্ত হয়ো না বাবা!—তিনি ফিরে এসে—

রাজারাম ব'লে উঠলেন—তা আর হয় না মা!…পুত্র যদি স্বেচ্ছায় তার পিতার বুকে আঘাত করে, সে-আঘাত পিতার বুকে ঠিক বজ্রাঘাতের মতই বাজে। সে একখানা চিঠি লিখেচে আমাকে।

অরুন্ধতী ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাইলে।

রাজারাম ব'ললেন—চাইলে আর তা মিলবে না অরুন্ধতী। সে অবাধ্য সন্তানের রূঢ় পত্র আমি টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলেচি।

—তিনি কি লিখেছিলেন ?

—আবার সে-কথাও ব'লতে হবে ?

—দোষ কি বাবা ?—তিনি আপনার পুত্র।

—কিন্তু কুপুত্র মা !—বাপের মার্গ্য যে বজায় রাখলে না—সে আমার কুপুত্র। কি লিখেছিল জানিস ? লিখেছিল—দুনিয়ায় ভগবান—ঠাকুর—জগন্নাথ—নেই !—জগন্নাথ সত্যিসত্যিই ঠুঁটো !—এত-বড় পাষণ্ড নাস্তিক সে !—লিখেচে—সমাজ—দেবতা—ব্রাহ্মণ—এসব কথার কথা! নারায়ণ—মানুষ,—মানুষকে নমস্কার করতে না জানলে—নারায়ণকে চাবুক মারা হয় !···ছিঃ—এ-কথাও আজ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে হ'ল মা !—এত-বড় বর্ব্বর ছেলের বাপ আমি ! জগন্নাথ ঠুঁটো ! তাঁর হাত পা নেই ! তুচ্ছ মানুষকে সেবা করবার ইচ্ছা না হ'লেই তাঁকে চাবুক মারা হবে !

অরুন্ধতী মুখ নামিয়ে ধীরে ধীরে ব'ললে—হয়তো তাঁর মাথার ঠিক ছিল না বাবা !···যে-কোনো নির্য্যাতন সইতে গেলেই মস্তিষ্ক ঠিক রাখা সম্ভব নয়।

—উন্মাদ হলে মানুষ অখাদ্য খেতে পারে অরুন্ধতী, কিন্তু দেহে অস্ত্রাঘাত করতে পারে না। যন্ত্রণার ভয়, তার জীবন শেষ না হলে যায় না। দেবতাকে বিদ্রূপ করা আর আপন দেহে গলিত কুষ্ঠের অভ্যর্থনা করা—সমানই কথা মা !···এই নতুন সম্পত্তি থেকে আমি তাকে বঞ্চিত করেছি। কিন্তু তুই আমার আসল সাধ অপূর্ণ রাখিস্‌নি মা !—যে বিশাল সম্পত্তি আমি তোরই নামে খরিদ করলাম—সেখানকার রাণী হ'য়ে আপন মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ হ'তে দিস্‌নি। মনে রাখিস্ মা ! জগন্নাথ

জগতের নাথ। তিনি যা করাবেন তা হবেই হবে। তাঁর তুষ্টিতেই জগৎ তুষ্ট,—জগতের তুষ্টিতে তাঁর তুষ্টি নয়। সেবা-পরিচর্য্যা-ভক্তি-শ্রদ্ধা পাবার আশাতেই লোকে সন্তান কামনা করে,—মানুষ মাত্রেই জগন্নাথের সন্তান। সন্তানের সেবাই তাঁর সর্ব্বান্তঃকরণে কাম্য।

অরুন্ধতীও একথা মনে মনে স্বীকার করতো, আজও করলে।

রাজারাম ব'ললেন—সেখানকার রাণী তুই,—সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে, আমার জগন্নাথের মন্দির তৈরী করিস্ মা! বিশাল গগনচুম্বী মন্দির।...সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিত, সর্ব্বরূপের আধার—জগতের নাথ জগন্নাথ তাঁর মুর্ত্তি—কিন্তু পাষাণের,—পাষাণ মূর্ত্তি তাঁর সে-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিস্!—ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা জীবনভর মেনে নিস্—প্রজাদের মধ্যেও যেন এ-নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটে।

অরুন্ধতী ব'ললে—তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব কাজ করবে বাবা।—আমায় ভার দিলে কি হবে?—আমি তো তোমার ছেলে হ'য়ে জন্মাতে পারিনি বাবা!

সগর্ব্বে সতেজে রাজারাম ব'লে উঠ্লেন—কিন্তু তুই আমার পুত্রবধূ ...নাঃ—হয়তো এ-অদৃষ্টে তা সইলো না! তুই আমার কন্যা—প্রাণের চেয়েও বেশী মমতার।...জীবনে আমার ধিক্কার এসেচে অরুন্ধতী,—এ সংসারের নিশ্বাস আর আমি নিতে পারি না! রুদ্ধ বায়ুতে তো বাঁচবো না বেশীদিন, তাই মনের সাধ তোর কাছেই প্রকাশ করে রাখলাম। পরলোকে আমার বুভুক্ষু আত্মার সদ্গতি তোকেই করতে হবে মা!...কিন্তু আর কি করেছি জানিস্?

—কি বাবা?

—ক'লকাতার এই বাড়ীখানা আর ব্যাঙ্কের হাজার-কতক টাকা তার নামে জমা রেখে, আমরা মায়ে-পোয়ে সেই পাড়াগাঁ-অঞ্চলে বাস করবো।—কাল সেখানে বড় কণ্ট্রাক্টর পাঠিয়েচি। প্রকাণ্ড অট্টালিকা তৈরী হবে।

—ক'লকাতা কি তোমার ভাল লাগ্‌চে না বাবা?···বেশ তো ছিলে, এতকালের বাস—

—বাসভূমির চারধারে যদি বেড়া-আগুন জ্বলে ওঠে অরুন্ধতী, তা হলে আজন্মের বসবাসও উঠিয়ে দিতে হয়।···যেখানে বাস করতে করতে বুকের কল্‌জে হারিয়ে যায়, সেখানে কোন্ পরাণে থাক্‌বো মা?···কিন্তু তোর সেই নতুন বাড়ীখানা, যা তৈরী হচ্ছে,—তার নাম কি রাখবো জানিস্ মা? কিন্তু নামটা আমি রাখবো, না তুই রাখ্‌বি?

—তুমিই রেখো বাবা!...গরীবের অনাথা মেয়ে ছিলাম—কপালের লেখায় তোমার পায়ে আশ্রয় পেয়েছি!···আমি তো কোনো কিছুই শিখিনি কখনো।

—আমাকে সে-বাড়ীটার নাম রাখতে তুই অধিকার দিবি?

অরুন্ধতী হাতযোড় করে ব'ললে—পায়ে পড়ি বাবা! এখনো কি আমার মুখ চেয়ে তোমার দয়া হবে না? এত নিষ্ঠুর তুমি হ'তে পারো? ···আমি কি-বা জানি যে মনের মত নাম রাখবো?

গম্ভীর হ'য়ে এবং বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে রাজারাম ব'ললেন—বাড়ীখানার নাম রাখতে হবে—"হরধাম"।

সহসা অরুন্ধতী রাজারামের হাত দুটো চেপে ধ'রে কেঁদে উঠ্‌লো—

বাবা! বাবা!—এত কষ্ট তোমার—এ-যে সহ্যের অতীত হ'য়ে আস্‌চে বাবা!…এত দুঃখী তুমি!

রাজারাম হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে, জোরে হেসে উঠ্‌লেন।

এগারো

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছ'মাস কেটে গেছে।

পল্লীগ্রামের বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মাণও শেষ হ'য়ে এল,—এরই মধ্যে অরুন্ধতীকে সঙ্গে নিয়ে রাজারাম দু'বার তাঁর নতুন জমিদারী ও ভবিষ্যৎ বাসভূমি দেখ্‌তে গেছ্‌লেন। হ্যাঁ,—বাস করবার মত জায়গা বটে,… প্রশস্ত সবুজ ময়দান, সুনির্ম্মল হাওয়া, স্বচ্ছ কালো জল…সবতাতেই সজীবতার আভাস!…

…পাকা এক বৎসর পরে, বৈশাখের এক শুভদিন ঠিক করা হ'ল,—নতুন জমিদার ও তাঁর কন্যা অরুন্ধতী তাঁদের নবনির্ম্মিত অট্টালিকায় প্রবেশ করবেন।

তার একদিন আগে ক'লকাতা থেকে রওনা হওয়ারও দিন ঠিক হ'য়ে গেল।

যাত্রার দিন-সাতেক পূর্ব্বে রাজারাম ক'লকাতার বাড়ী ও টাকাকড়ি সম্বন্ধে সরকারের সঙ্গে যথারীতি পরামর্শ ক'রে, হরলাল ফিরে আসা পর্য্যন্ত যাতে সুশৃঙ্খলে সবদিক বজায় থাকে, সে-ব্যবস্থাও ক'রে দিলেন।…তাঁর

দৃঢ় পণ,—এ-জীবনে এই হট্টগোলের হট্টমন্দির ক'লকাতায় যেন আর ফিরে আস্‌তে না হয়। যার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে জাল-জোচ্চুরি আর শয়তানি মতলবের বীজ ছড়ানো আছে, সেখানে বাস করা তাঁর অসম্ভব! যেখানে পিতার মন থেকে ও বুক থেকে প্রাণসম পুত্রকে ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেখানে পিতা হ'য়ে তিনি কেমন করে টিকে থাকবেন?……

একদিন সকাল বেলায় বিছানা ছেড়ে হাত-মুখ ধোয়ার পর, রাজারাম অরুন্ধতীর খোঁজ ক'রলেন, কিন্তু সে তখন গঙ্গাস্নানে গেছে।

রাজারামের আদেশ, ইচ্ছা ও উপদেশের ফলে, অরুন্ধতীর দেবতা-ব্রাহ্মণে অচলা ভক্তি হ'য়েছে।

রাজারাম ব্যগ্র হ'য়ে অরুন্ধতীর প্রতীক্ষা করছিলেন—এম্‌নি সময় ভৃত্য সংবাদ দিলে—জনৈক ভদ্রলোক সাক্ষাৎ-প্রার্থী।

রাজারাম ইদানিং সাংসারিক কোনো কাজই দেখ্‌তেন না বা কারুর সঙ্গে কোনো-কিছুর প্রয়োজন হ'লে, অরুন্ধতীর সঙ্গে পরামর্শ ব্যতীতও তাতে অগ্রসর হ'তেন না। এক-কথায় অরুন্ধতী তাঁর ডান হাত—তাঁর শেষ-বয়সের যষ্ঠী।

ভদ্রলোক সাক্ষাৎ-প্রার্থী, কিন্তু কেন, তাই ভৃত্য দ্বারা জান্‌তে পাঠিয়ে রাজারাম ভাবছিলেন—মেয়েটা রোজকার চেয়ে আজ যেন দেরী ক'রছে…

ভৃত্য ফিরে এসে ব'ললে,—বাবুটি কেন দেখা করবেন—তা ব'লতে চাইলেন না।

রাজারাম মুহূর্ত্তকাল চিন্তার পর ব'ললেন,—বৈঠকখানায় ব'স্‌তে বল্‌—আমি যাচ্ছি,…কিন্তু তোর দিদিমণি এসেচেন?

ভৃত্য জানালে—অরুন্ধতী তখনো ফিরে আসে নি।

রাজারাম আস্তে-আস্তে বৈঠকখানায় হাজির হ'লেন। আগন্তুক ভদ্রলোক আসন ছেড়ে তাঁকে নমস্কার করলে।

রাজারাম জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনার কি দরকার?

ভদ্রলোক অতি বিনীত হ'য়ে পকেট থেকে একখানা দরখাস্ত বের ক'রে রাজারামের হাতে দিলে, তারপর করযোড়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

রাজারাম দরখাস্ত পাঠের পূর্ব্বে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভদ্রলোকটির আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

ভদ্রলোক মাথা হেঁট করলে, কিন্তু যুক্তকর মুক্ত করলে না।

রাজারাম পড়লেন,—দরখাস্তে লেখা আছে—"আমার ষোড়শবর্ষীয়া কন্যা এখনো অবিবাহিতা, আমি পথের ভিখিরী, আপন অন্নসংস্থানের সঙ্গতি নাই,—আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কন্যাদায় হতে উদ্ধার ক'রে দিয়ে, আমার জীবন্মৃতদেহে জীবনী সঞ্চার করুন!...বাজে কাজে কত পয়সা কত দিকেই তো খরচ হয়, সৎকার্য্যের জন্য এই দান—ভগবানের খাতায় 'মহাদান' বলে লিখিত হবে।"

পড়া শেষ হ'য়ে গেলে, রাজারামের মনটা বেদনায় খচ্-খচ্ করে উঠ্‌লো।—হরলালও অরুন্ধতীর বিবাহের জন্য তাঁর কাছে কত দরবার ক'রতো।...সাধের 'বেবি অষ্টিন্' পর্য্যন্ত সে কিন্‌তে রাজী হয় নি।

ভদ্রলোককে অবশ্যই কিছু দেওয়ার জন্য তাঁর সমস্ত অন্তর উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠ্‌লো, খবর নিয়ে জান্‌লেন—অরুন্ধতী সবে মাত্র গঙ্গাস্নান থেকে বাড়ী ফিরেচে।

ভদ্রলোককে অপেক্ষা করতে ব'লে, তিনি ভিতরে ঢুক্‌লেন। কিন্তু

দোতলায় যেতেই নজরে পড়লো—বৈঠকখানা-ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দার রেলিঙএ ভর দিয়ে অরুন্ধতী সিক্তবসনেই দাঁড়িয়ে রয়েচে।

রাজারামকে দেখে, সে আস্তে-আস্তে ত্রিতলে উঠ্‌লো। রাজারামও উঠ্‌লেন।

অরুন্ধতী তার কক্ষে প্রবেশ করতে করতে ব'ললে,—আমায় কিছু ব'ল্‌বে বাবা ?...

—হ্যাঁ মা !—একটি ভদ্রলোক এসেচেন,—

—"কাপড়খানা ছেড়ে আমি আস্‌চি বাবা !" ব'লে সে ঘরে ঢুক্‌লো। এবং খুব সংক্ষেপ সময়ের মধ্যেই রাজারামের কক্ষে ফিরে এসে ব'ললে—কি ব'লছিলে বাবা ?—কে এসেচেন ?

—একটি ভদ্রলোক, কন্যাদায়গ্রস্ত, ষোলবছরের মেয়ে গলায়, আহা ! বেচারীর বড় কষ্ট মা !...তারপর আত্মগত হ'য়ে ব'ললেন,—হরলাল থাক্‌লে আজ আমার কাছে ওর জন্যে কত কান্নাই না কাঁদ্‌তো। বুঝ্‌লি মা ?—আমি এই সব লোকদের সাহায্য করতাম না, সেই হতভাগাই এ-শিক্ষা আমাকে দিয়ে গেছে।

অরুন্ধতী পিঠের এলোচুলটা সাম্‌লে নিয়ে গম্ভীর হ'য়ে ঘরের মেঝেয় ব'সে পড়লো। তারপর গম্ভীরভাবেই ব'ললে—কি ব'ললে বাবা ?—ভদ্রলোক,—কন্যাদায়গ্রস্ত ?

—হ্যাঁ মা !

উত্তেজিত হ'য়ে অরুন্ধতী ব'লে উঠ্‌লো—ওরই মেয়ে ?...কিন্তু ওকে কি তুমি চেননা বাবা ! ওযে সেই প্রতাপচাঁদ !...কস্মিন্‌কালেও বিয়ে করেনি !...তারপর চীৎকার করে ডাক্‌লে—ভজনরাম !

তাড়াতাড়ি রাজারাম ব'লে উঠ্লেন—কেন মা? ভজনরামকে ডাক্‌ছিস্ কেন?…সত্যি-সত্যি ও প্রতাপচাঁদ?

—হ্যাঁ বাবা! মর্ম্মে মর্ম্মে আমি যেমন চিনি, তেমন করে ওকে কেউ চেনে না।…ভজনরামকে ডাক্‌ছি—ভণ্ডটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে।

ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে রাজারাম টল্‌তে টল্‌তে নীচে নামছিলেন—যেতে যেতেই ব'ললেন—ওকে পুলিশে দেবো আমি।…কিন্তু কী আশ্চর্য্য! দেহটা এমনি বদ্‌লে ফেলেচে!

অরুন্ধতী দাঁতে দাঁত চেপে ক্রুদ্ধা ফণিণীর ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলো। অন্তরে তার প্রতিহিংসার ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে।

…কিজানি কেমন করে গোলমালটা প্রতাপচাঁদ শুনতে পেয়েছিল।

রাজারাম ফিরে এসে দেখলেন—বৈঠকখানা-ঘর শূন্য!

মহাসমারোহে রাজারাম অন্ধরুতীকে নিয়ে তাঁর জমিদারীতে শুভ-পদার্পণ করলেন। সেখানকার আবালবৃদ্ধবণিতা বিপুল ঐকান্তিকতার সঙ্গে তাঁদের অভিনন্দন জানালে।

অনেকগুলি পল্লীর আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে অধিবাসীদের গুরু-গম্ভীর শব্দ উত্থিত হ'ল—জয়—রাজা-রাণীর জয়! জয় মাতা অরুন্ধতীর জয়!

সে-স্বর রাজারামের কানের ভিতর দিয়ে মর্ম্মের দুয়ারে আঘাত করলে। বুকখানা দু'হাতে চেপে ধরে তিনি মনে মনে ব'ললেন—হরা! হরা!—আর কতদিন পরে ফিরে আসবি বাবা? ওরে আর কত দিন!

চাকর, দারোয়ান্, দাসী, গোমস্তা, তহশীলদার, ম্যানেজার—সব এখানকার নবনিয়োজিত। ক'লকাতার বাড়ীর একটা-কিছু চিহ্নও এ-বাড়ীতে খুঁজে মেলে না। যেন রাজারাম তাঁর অতীত জীবনকে জোর করে ভুল্‌বার জন্যই এই পল্লীবাসের আয়োজন করেছেন। আর অরুন্ধতীরও জীবনযাত্রার নতুন রকম আয়োজন হয়েছে। সৃষ্টির বৈচিত্র্য বজায় রাখতে পুরাতন—অতীতে মিশেচে,—নবীন এসেচে—বর্ত্তমান-ভবিষ্যের নিশানা হাতে ধরে।

অরুন্ধতী আজকাল প্রতিদিন দু'টি ক'রে ব্রাহ্মণ ভোজন না করিয়ে জলগ্রহণ করে না। দেশ-দেশান্তরের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ঘরে-ঘরে বিদায়ের ব্যবস্থা হয়েছে, তা ছাড়া ব্রাহ্মণদের আহারের সঙ্গে সঙ্গে মোটা মোটা দক্ষিণারও সুব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজারামের প্রবল ধারণা—দেবতা-ব্রাহ্মণই পরকালে মুক্তি দেওয়ার মালিক। তাঁরা যদি অসন্তুষ্ট হন, তাহ'লে নরক ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

এসব ছাড়াও, রাজারামের ইচ্ছাক্রমে অরুন্ধতী মনে-মনে সংকল্প করে রেখেচে,—অতি শীঘ্রই অট্টালিকার অনতিদূরে জগন্নাথদেবের

শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হবে এবং দেবতা প্রতিষ্ঠা হবে।···কাজ যদিও আরম্ভ হয়নি,—তবে হতেও বেশী দেরী নাই।

কিন্তু অদৃষ্টে সুখশান্তির সুব্যবস্থা যদি অদৃষ্ট-বিধাতা সুচারুরূপে শেষ করে রাখতেন, তা হ'লে বিধাতা বলে হয়তো কেউ তাঁকে মান্‌তো না। বিপদের ঘূর্ণিতে পড়ে 'মধুসূধন' বলেও মানুষে হাত যোড় করে কাঁদতো না। সৃষ্ট মানবের কাছ থেকে এ-যেন স্রষ্টার সুদ সমেত ভক্তি আদায় করার অত্যাশ্চর্য্য ফন্দী!

অরুন্ধতীর এত সুখের মাঝেও অন্তর ছিল মরুভূমি! অন্তরের গোপন পুরে প্রশান্ত মন্দির ছিল—কিন্তু দেবতা ছিলেন অনুপস্থিত!—চোখের কোণে অশ্রু চিরস্থায়ী বাসা বেঁধেছিল,—মুখখানা বিষের কালিমায় কালিমাখা!···হরলাল···সে কি আর আস্‌বে না?···তেমনি করে ডাক্‌বে না—আশ্রয়দাতার সর্ব্ববিধ আশ্রয়ে থেকেও এ-হেন নিরাশ্রয়া হ'য়ে অরুন্ধতী আর কত কাল জীবনযাপন করবে?

কিন্তু অদৃষ্টের চাকাটা আর-একটা ভিন্নপথ ধর্‌লে!—

হঠাৎ দু'দিনের জ্বরে রাজারাম ইহলোক থেকে চিরবিদায় নিতে বাধ্য হ'লেন। তাঁর মহাপ্রস্থানের পর অরুন্ধতী সর্ব্বাংশে হয়ে গেল একা!—সম্পূর্ণ অসহায়া—আত্মীয়-কাঙালিনী।

মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে রাজারাম তাঁর শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গেছেন—

"হরলাল ফিরে এলে, তার প্রতি আমার আদেশ রইলো—পবিত্র, নির্ব্বিরোধি, ধর্ম্মভাবাপন্ন জীবনযাপন করতে হবে।

"তুচ্ছ মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে দেবতা-পূজার প্রভেদ আকাশ-পাতাল।

"দেবত্ব শয়তানীতে পর্য্যবসিত হয় কেবল মানুষের হৃদয়ে। মানুষ নিয়ে, মানুষের সেবার ভার নিয়ে দেবতার সেবা করা চলে না। যেহেতু স্বার্থ-বিজড়িত নর-সহবাসে মানবের ধর্ম্ম এবং মর্ম্ম উভয়ই কলুষিত হ'য়ে পড়ে।"

যথোপযুক্ত ব্যবস্থায় ভীষণ ধূমধামের মধ্য দিয়ে জমিদার রাজারাম মুখুয্যের শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হ'য়ে গেল।

অরুন্ধতী রাজারামের আর-একটা অতি প্রয়োজনীয় আদেশ পেয়েছিল —সেইটাই এখন তার জীবনের পরম ও চরম কর্ত্তব্য হ'য়ে দাঁড়ালো।— সেটা জগন্নাথের শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা।

দেশের সহস্র সহস্র লোক যখন সর্ব্ববিজয়িনী মহিমময়ী মহারাণী অরুন্ধতীর 'জয় হোক্' বলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতো—তখন অরুন্ধতী তাদের ডাক কানে তুল্‌তো কি-না তা স্বয়ং জগন্নাথই ব'লতে পারেন। যেহেতু তিনি স্বয়ং জগন্নাথ—জগতের নাথ!

বারো

আরো পাকা দুটী মাস পরে হরলাল রাজ-কারাগার থেকে মুক্ত হ'য়ে ক'লকাতায় ফিরে এলো এবং বাড়ীর সরকারের মুখে পিতার স্বর্গারোহণ সংবাদ শুনে শোকে-দুঃখে মুহ্যমান্ হ'য়ে মাসখানেক বাড়ী থেকে বাইরে পর্য্যন্ত বার হ'ল না।

অরুন্ধতীর এ-বাড়ীতে আশ্রয়লাভ, পল্লীরাজ্যের রাণীত্ব প্রাপ্তি—সকল সংবাদই হরলাল পেয়েছিল, কিন্তু পিতার মহা-ইচ্ছার কথা সরকারের মুখেই যখন সে জানলে যে,—মানুষের সেবা করা মহাপাপ—ভগবানকে ভুলে মানুষকে বড় করায় অপরাধ আছে, এবং সে যদি তার ব্যতিক্রম করে তা হ'লে পিতার বিন্দুমাত্র বিষয়ও তার পাওনা নাই, তখন বাস্তবিকই অন্তরে অন্তরে তার সত্যাগ্রহ করবার সাধ জেগে উঠলো। স্বর্গগত পিতৃ-আত্মার উপর তীব্র অভিমান করে দরিদ্র হতভাগ্য মানুষ-নারায়ণের সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করলে। সে পিতার ভ্রান্ত ধারণাকে জীবনের কর্ম্ম দিয়ে—আসল সত্যের পথে ফিরিয়ে আন্‌তে কৃতসংকল্প হ'ল।

অরুন্ধতীকে সে ফিরে আসার সংবাদ দিলে না, সেখানে যেতেও চাইলে না। সমগ্র সদিচ্ছা তার একত্রীভূত করে নিয়োজিত করলে নরের সেবায় দেবতার প্রসাদ লাভ করতে।

অরুন্ধতী

একদিন আষাঢ়ের সন্ধ্যায়, ভরা বাদরে পথঘাট জলে-জলে জলময় হ'য়ে গেছে। এলোমেলো হাওয়া আর জলের ঝাপ্‌টা—দুয়ে মিলে পথিকের পথ-চলা দায়। এমনি সময় হরলাল তার পাথর খোদাই করে মূর্ত্তি তৈরীর কাজ সমাপনান্তে বাড়ী ফিরছিল। আজ-কাল সে এই ব্যবসাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করতে সংকল্প করেছিল।

চ'লতে চ'লতে একটা সরু গলির মোড়ে এসেচে, এমন সময় এত জোরে বৃষ্টি নামলো যে, হরলালকে বাধ্য হ'য়ে কোনো-এক খোলার বাড়ীর দরজায় আশ্রয় নিতে হ'ল।

অনেকক্ষণই সে দাঁড়িয়ে ছিল। পেছন থেকে একটি কঙ্কালসার—ছিন্নবসন-পরিহিত প্রৌঢ় কাঁদ-কাঁদ হ'য়ে তার সুমুখে এসে জিজ্ঞাসা করলে—মশায়! আফিংএর দোকানটা কোন্ দিকে—আমায় দেখিয়ে দেবেন?

হরলাল ফিরে চেয়েই চম্‌কে উঠ্‌লো!...কী বীভৎস পরিণাম!—এ-যে প্রতাপচাঁদ!

হরলাল জিজ্ঞাসা করলে—এর মানে কি প্রতাপচাঁদ? আজকাল আফিং ধরেচ নাকি?...কিন্তু আমার তো দেখবার ভুল হয় নি—তুমি কি সত্যিসত্যিই সেই প্রতাপচাঁদ? কিন্তু আফিং কি হবে?

প্রতাপচাঁদ ব'ললে—আর সইতে পারি না ভাই! পাপের জীবন আর বইতে পারি না! নেশার জন্যে চাই না,—চাই মৃত্যুর জন্যে!...আফিং না হোক্—যে-কোনো একটা বিষ, যাতে শান্তি পাওয়া যায়।...

হরলাল থম্‌কে দাঁড়িয়েই ভাবতে লাগলো। আস্তে আস্তে করুণ দৃষ্টি দিয়ে প্রতাপচাঁদের পানে চাইলে। সহসা তার নয়নের সম্মুখে ভেসে

উঠ্‌লো—এক মর্ম্মপীড়িতা হতভাগিনীর রোরুদ্যমান আত্মা!...যেন সমস্ত বিশ্বচরাচর ঘুমের ঘোরে চেতনাহারা, শুধু জগন্মাতা তাঁর লাঞ্ছিত সন্তানকে নিয়ে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন! আঁধার বাদল-রাতে কারুর সাড়া মেলে না—সবাই সংজ্ঞাহারা,—নিদ্রা নাই শুধু তাঁরই ব্যথাহত আঁখি-পল্লবে!

তেরো

একদিন ভোর-বেলায় অরুন্ধতী স্বপ্ন দেখ্‌লে—স্বয়ং জগন্নাথ তাঁর গুপ্ত বাহু ব্যগ্রভাবে বাড়িয়ে তাকে ডাক্‌ছেন—উঠে পড়্ মা! এ কি তোর ঘুমিয়ে থাকার সময়? আমার যে পূজোর লগ্ন ব'য়ে যায়! 'দিকে দিকে আমার সেবার সমারোহ জাগিয়ে তোল্—পরকালের কাজ কর।...

অরুন্ধতী চোখ কচ্‌লে উঠে বস্‌লো।

—উষার স্বপন...কিছু-না-কিছু সত্যিই।...কিন্তু একটুও তার ভুল হয় নি—ছেলেবেলায় যখন মা-বাপের সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিল—তখন তো জগন্নাথের হাত ছিল না! আজ ঠুঁটো ঠাকুর হাত পেলে কেমন করে?

বিচিত্র মায়া এই ঠাকুর-দেবতার!—সাধ্য কি যে তৃণাদপি তুচ্ছ অরুন্ধতী তার নাগাল্ ধরে!

দু'দিন পরেই ষ্টেটের ম্যানেজার বাবুকে হুকুম দিলে—আমাদের এই নবগ্রামের উত্তর কোণে, চারিদিকে সান্-বাঁধানো খুব বড় একটা

পুকুর তৈরী করতে হবে ; অবিকল পুরীর নরেন্দ্র-সরোবরের মত হওয়া চাই। আর সেই সরোবরের ধারে প্রকাণ্ড মন্দির হবে, তার চূড়াটী যেন আকাশের মেঘ ছুঁতে পারে,—ঠিক শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরের মত।

হতভম্ব ম্যানেজার মাথা নুইয়ে হুকুম পালনের সম্মতি জানালে বটে, কিন্তু তখনি চ'লে গেল না। কিছু বল্‌বার আশায় মাথা চুলকোতে লাগলো।

অরুন্ধতী বললে—বাবা থাক্‌তে তিনি একা-একাই সমস্ত দেখা-শুনো করতেন,—'ম্যানেজার' বলে কোনো লোক আমাদের ছিল না। আপনি নতুন লোক ; কিন্তু জেনে রাখুন—দেবতা-ব্রাহ্মণের তুষ্টিসাধনই এ-বংশের সনাতন রীতি।...খরচপত্র কিছু বেশীই হবে।

ম্যানেজার বল্‌লে,—কিছু বেশী নয় মা !—অনেক বেশী। সম্ভবত অত টাকা আমাদের তহবিল যোগাতে পার্‌বে না।

অরুন্ধতীর মনোমন্দিরের তোরণে তখন বোধনের বাঁশী বেজে উঠেচে। কল্প-লোকের যাত্রী সে, যাত্রা-পথের ঝড়-তুফানে তার সংকল্প শিথিল হবে না। বল্‌লে—কিছু সম্পত্তি না-হয় বিক্রী করুন !...এক বছরের মধ্যে মন্দির আর পুকুর সম্পূর্ণভাবে তৈরী হওয়া চাই-ই। এ আমার জীবনের সব চেয়ে বড় কাজ জান্‌বেন।

ম্যানেজার আদেশ পেয়ে চলে যাচ্ছিল—অরুন্ধতী ডেকে বল্‌লে,—কিন্তু খুব সাবধান, ঋণকে আমি মহাপাপ মনে করি। সর্ব্বস্ব বিক্রী করতে হয় বরং ভালো ; কিন্তু আধ্‌লা-পয়সাও ঋণ গ্রহণে আমার নিষেধ রইলো।...

উঃ সে কী বিরাট ব্যাপার ! বাংলা দেশ কুড়িয়ে পাকা শ' দুয়েক

হিন্দু রাজমিস্ত্রী, উড়িষ্যা আর মাদ্রাজ থেকে জনকয়েক স্থপতি আর অসংখ্য মজুর যোগাড় করে আনা হয়েচে। কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার আর ওভার-সিয়ারের অধীনে তারা কলের মত দিনরাত খাট্‌চে। এর সঙ্গে আবার ভিটে-বাড়ীর প্রজারা সবাই ভুঁইয়ের কাজ ফেলে রেখে পালা করে বেগার দিচ্ছে। চারখানা গ্রাম ভরে মন্দিরের মাল্‌-মশ্‌লা ছড়িয়ে পড়েচে। একটা নগরের প্রচণ্ড ব্যস্ততা যেন এই শান্ত পল্লীর কুঞ্জে দানবের মত স-হুঙ্কারে নাচন্‌ সুরু করে দিয়েচে!...

বছর খানেক ধরে আশে-পাশের অন্ততঃ পঞ্চাশখানা গাঁয়ের লোক ফি-দিনই ছুটোছুটি করে আস্‌তো—এই মন্দিরের ভিত্তি-নির্ম্মাণ দেখ্‌তে।...

কিন্তু রাজা যদি প্রজার দৈন্যকে উপেক্ষা করে, তবে সে কষ্ট প্রজার মরণ-সমান হয়।...অরুন্ধতী দেবতা-প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বস্ব পণ কর্‌লে, কিন্তু সর্ব্বস্ব যাদের কাছে থেকে তার লাভ হয়েছিল, তাদের দুঃখকে আমল্‌ দিলে না।

ম্যানেজার প্রজামহলে বেজায় জোর জুলুম সুরু করলে।—কড়াক্রান্তি খাজনা বাকি রাখা হবে না এবং সকলকে মন্দির-নির্ম্মাণকার্য্যে অবস্থা অনুযায়ী দান কর্‌তে ও তদুপরি মাসে পাঁচছয় দিন করে বেগার খাট্‌তে হবে।

প্রজাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা তো বহুদিন থেকেই মন্দ হয়ে রয়েচে। ফি-বছর ম্যালেরিয়া আর কলেরা-বসন্ত-ইনফ্লুয়েঞ্জার শ্রীচরণ-পরশে গ্রামবাসীর মন-কোকনদের মধু বিন্দু-বিন্দু করে ক্ষয়িত হয়ে গেছে এবং যাচ্ছেও। কিন্তু যে-জ্বালা নিত্যকার অতিথি—যা সহ্য হয়ে গেছে,

তার আক্রমণ তত কষ্টের নয়; আকস্মিক আঘাতটুকুর ব্যথাই সব চেয়ে বেশী যাতনা দেয়।

এবারকার চাষ-আবাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আষাঢ়ের প্রথম দফায় দুচার দিন মেঘাড়ম্বর হয়েছিল—বৃষ্টিও নেহাৎ কম হয়নি। ফলে অধিকাংশ লোকের ধান-জমির রোয়া-কাজটা কোনো রকমে শেষ হয়ে গিয়েছিলো, যদিও ওই সময় জমিদারদের বেগার দিতে গিয়ে কারো কারো কপাল একেবারে পুড়ে গিয়েছিল।

অরুন্ধতীর মন্দির-প্রতিষ্ঠার ধুমধামটুকু প্রথম প্রথম অন্য সকলেও আরামে ভোগ করছিল। আরাম বে-আরামে পরিণত হ'য়ে গেল সেইদিন, যেদিন ম্যানেজার জুলুমের রুদ্র অভিনয় সুরু করলে।

প্রজারা কি আর করবে, চোখের জল অলক্ষ্যে মুছে ফেলে, জমিদারের মন জোগাতে সচেষ্ট হ'ল। জমিদার-কর্ম্মচারীরা জানালে—এক সঙ্গে রাজ-কার্য্য আর দেবকার্য্য,—টাকা দিতেই হবে। দিলে ইহকালে গতি, পরকালে মুক্তি।

প্রজারা ভাবলে—দেবের কার্য্য মানবের বুকে লোহার মুগুর মার নয়, আশীর্ব্বাদের ফুল ছড়ানো! এ-কাজ দানবের—পাষণ্ডের!...যেহেতু আশ-পাশে তখন চাপা-গলায় আর্ত্তনাদের সুরে শোনা যাচ্ছিল—আর এক দেবতার আগমন-সংবাদ,—তাঁর নাম দুর্ভিক্ষ!

বৃষ্টি আর হয় না।...অসংখ্য লোক তাদের বুভুক্ষু দৃষ্টি দিয়ে আকাশটাকে যেন গিলে খেতে বসেচে। কোথাও নেই—এক ফোঁটা মেঘের চিহ্ন!

যেখানে যত খানা, ডোবা, বিল ছিল, সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে শুক্‌নো হয়ে গেল। তাদের ফাটা বুক দেখে বিশ্বনাথের চোখ দিয়ে এক ফোঁটা

জলও ঝর্‌লো না। ধান বাঁচাতে চাষীর দল তৃষ্ণা ভুলে গিয়ে, পাত্‌কুয়া, ইন্দারা, দীঘির তলায় যতটুকু জল বেঁচেছিল, তারও সৎকার কর্ত্তে লেগে গেল। পাড়ায়-পাড়ায় গ্রামে-গ্রামে উৎসাহের বাণী প্রচার হ'তে লাগলো—জলসেক করে' আগে ফসল বাঁচাও! নতুবা দুর্ভিক্ষ তার পাগলা মাথার খেয়াল খুলে দেবে।…

চিরন্তনীর দুয়ারে আশাই ধর্ণা দিয়ে বসে থাকে। তপ্ত মরুভূর বুকের মাঝে আশাই 'ওয়েসিসে'র সংবাদ জানিয়ে যায়।

প্রবল উৎসাহে 'জলসেক' কাজ চল্‌ছিল। চাষীদের খেতে শুতে অবসর নাই, চব্বিশ ঘণ্টাই তাদের 'দুনী' চলেছে।…

হিন্দুস্থানী মজুরদের বস্তীর মধ্যে ওলাবিবির দয়া একটু উঁকিঝুকি মারতেই, মজুরদের চাকে ভাঙন্ ধর্‌লো। শেষে অরুন্ধতীর জন-মজুরের একান্ত অভাব হ'ল। পাইকের দল বাড়ী বাড়ী ঘুরেও নবগ্রামে লোক পেলে না। তখন অগত্যা ভিন্‌-গাঁ থেকে বিস্তর বেকার চাষীদের যোগাড় করে আনা হ'ল। দেবকার্য্যের বিঘ্ন হ'ল না।

এরই মধ্যে একদিন রাতের বেলায় অরুন্ধতী স্বপ্ন দেখলে—জগন্নাথ তাঁর পুষ্পক-রথের ঘোড়াদুটোকে চাবুকের ঘায়ে লাল্ল করে দিয়েছেন!—স্বর্গ থেকে এই মর্ত্ত্যের মন্দির-মধ্যে আস্‌বার জন্য তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ হয়েচে!—অথচ দুষ্টু ঘোড়া এমন এক্‌রোখা যে, আস্তে ছাড়া জোরে চল্‌তে জানে না!

স্বপ্ন দেখার পর হ'তেই দ্বিগুণ উৎসাহে দেবকার্য্য চল্‌তে লাগলো। …ভগবান স্বয়ং ঘোড়া ছুটিয়ে আসচেন, আর হীনমতি অরুন্ধতী তাঁর বিশ্রামের ঠাঁইটুকু এতদিনেও তৈরী করে উঠ্‌তে পারলে না!

একটি বছর ক্রমাগত জলের মত অর্থব্যয় করেও যখন সব কাজ শেষ হল না, তখন মণি-মুক্তা-হীরা-জহরৎ-সোনাদানা বিক্রী করে এবং দু'চার খানা লাভের মহাল পর্য্যন্ত বিক্রী করে মন্দিরের অসমাপ্ত কাজটুকু শেষ হ'তে চল্‌লো।

অরুন্ধতীর মনের আশে-পাশে হাসির ফিন্‌কি ছুট্‌ছিল!—তৃপ্তির বাতাস পেয়ে তা চারিধারে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লো।···আহা! প্রভু! তুমি এসো—এসো! তোমার পূজোয় জীবন-মন সমর্পণ করি!

প্রজার দলও তখন বুকের পাঁজরা ভেঙে ফেলে আর্ত্তনাদের ব্যথায় ডাকছিল—দীনবন্ধু, কৃপা করো!···এসো এসো···

রাজারামের বিস্তীর্ণ জমিদারী সঙ্কীর্ণ হয়ে চলেছে, সাধের পল্লীরাজত্ব নষ্ট হতে চলেছে—তবুও ভ্রূক্ষেপ নাই, অন্তরের মধ্যে প্রবল আশা—প্রভু জগন্নাথ আসিচেন! দীনা অরুন্ধতীর পার্থিব বাসনা-কামনাকে রিক্ত করে দিয়ে, প্রভু জগন্নাথ চরণছায়ার স্নিগ্ধতা দানে তাকে ধন্য করবেন্! ...ছার্ ধন-সম্পত্তি-জমিদারী! তুচ্ছ মান-সম্ভ্রম, দরিদ্রের ক্রন্দন—প্রজার অশান্ত ব্যাকুলতা! দেবতা স্বয়ং যার ভক্তিডোরে বাঁধা, ঘৃণিত নরপশুদের অন্তর-বাহিরের জ্বালা উপলব্ধি করার সে বহু উচ্চে! কী গরজ তার মলিনতাময় মর্ত্ত্যের দুঃখ-কাহিনী শুনতে?

—'রথে তু বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'...শাস্ত্রের বচন মিথ্যা হবার নয়।

একবার নয়, বার-কতকই অরুন্ধতী মনে মনে উচ্চারণ করলে 'রথে তু বামনং দৃষ্টা' ···

তারপর কর্ম্মচারীদের জানিয়ে দিলে—আগামী রথযাত্রায় সে শ্রীক্ষেত্রে যাবে।

সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। ঝি, চাকর, দারোয়ান, পাড়া-প্রতিবেশী, আশ্রিত বহু-বহু দেবদর্শনপ্রার্থীর দল বড়-আশায় পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধলে। ...যাত্রার আর দু'দিন বাকী, অরুন্ধতীর মত বদ্‌লে গেল—সে যাবে না।

কৈকিয়ৎ চাইবার সাহস করে, এমন লোক গ্রামে নাই। অরুন্ধতী তাই আপন কৈফিয়ৎ আপনার কাছে পেশ কর্‌লে—কি জন্যে যাবো? আমার জগন্নাথ আর পুরীর জগন্নাথ—সবই এক!—প্রভু স্বপ্নে দেখা দিয়ে, তার যত্নে-গড়া সাধের মন্দিরে বাস কর্‌তে আস্‌চেন। আর সর্ব্বত্যাগিনী আমি, তাঁকে দেখতে চলেছি তেপান্তরের দেশে; যার আঁচলে বাঁধা ভগবৎ-প্রসাদ, সে ত্রিভুবন জয় করতে পারে। তুচ্ছ শ্রীক্ষেত্র-দর্শনেই বা তার কিসের ব্যগ্রতা! নবগ্রামেই তো আমি দ্বিতীয় শ্রীক্ষেত্র সৃষ্টি করেছি!

অরুন্ধতীর মনে পড়ে রাজারামের প্রশান্ত মুখ—তাঁর বড় সাধের মন্দির-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা! অরুন্ধতী কায়মনোবাক্যে পিতৃ-আদেশ পালন করবে! এ-ভক্তি তাকে কে শিখিয়েছিল—রাজারামই তো,—নইলে জগন্নাথকে অরুন্ধতী কি চিন্‌তে পারতো?......

মন্দির নির্ম্মান সম্পূর্ণ হয়ে গেছে; কিন্তু জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহ তৈরী হতে এখনো প্রায় পক্ষাধিক কাল দেরী। বাঙলার বিখ্যাত ভাস্কর পাষাণ খোদাই করে জগন্নাথের শ্রীমুত্তি আঁক্‌ছেন।

গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করা হয়েচে—পূর্ণিমায় প্রভুর শ্রীবিগ্রহের অভিষেক হবে।

আনন্দের সহস্র-ধারা শ্রাবনের অশ্রান্ত ধারার মতই অরুন্ধতীর

মানস-প্রাঙ্গনে দিবানিশি ঝরুচে।—এইবার তার ধন-সম্পত্তি-হীরা-জহরৎ বিক্রয় সার্থক হবে! সে কাচস্বরূপ হেয় কাঞ্চন বিনিময়ে সুদুর্ল্লভ স্পর্শমণির সন্ধান পেয়েছে।

প্রায় চব্বিশখানা গ্রাম জুড়ে তখন দারুণ হাহাকার! পরণে বসন নাই, চালে খড় নাই, পেটে অন্ন—তাও বোধ হয় আর নিত্য যায় না! অন্ন কোথায়?—স্বয়ং অন্নপূর্ণা মাতা অরুন্ধতী আজ মুখ ফিরিয়ে রয়েচেন। নির্য্যাতনের দণ্ড হাতে করে নিরীহ দরিদ্রকে বিধ্বস্ত করাই তাঁর ব্রত।

পূর্ণিমা নিকট হয়ে এলো। মন্দির-প্রাঙ্গন এবং তার চারিদিক লতা-পাতা-ফুলে শোভিত হয়ে উঠেচে। প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের মাথায় নহবৎ বাজচে; চারিদিক্ আলোয়-আলোয় ভরে গেছে! উৎসবের সূচনার শোভাই দুর্ভিক্ষ-ভীত গ্রামবাসীর চোখে চমক লাগিয়ে দিলে।

কিন্তু গ্রামবাসীদের তখন ভালো করে দেখবার অবসর নাই। ফসল বাঁচাতে হবে, নইলে খাবে কি? মাথার মধ্যে শোণিতোচ্ছ্বাস, আনন্দোচ্ছ্বাসের স্থান নাই সেখানে।

দিবারাত্রি দুনী চলেছে। গভীর দীঘিগুলো পর্য্যন্ত জলহীন হয়ে গেছে। কাদা জল—তা-ও পড়ে রইলো না। প্রাণের দায়ে আশালুব্ধ চাষীর দল সব জল জমির বুকে ঢেলে দিলে।

গ্রামের লোক মিটিং করে মাঠের কিনারায় একটা বড় পুকুর জলপূর্ণ রেখেছিল। একখানা নয়—পাঁচখানা গ্রামের জীবনীশক্তি সব এক জায়গায় করে' যেন এই পুকুরটার মধ্যে জিইয়ে রাখা হয়েচে—যেমন রূপ-কথার রাক্ষসীর প্রাণ ভোম্‌রার মধ্যে জিয়ানো ছিল। মানুষ, গরু, মহিষ ইত্যাদির পানীর জল, নিত্য আচরণের জল এই পুকুর ছাড়া আর কোনোখানে মেলে না।

তা ছাড়া, জল থৈ-থৈ কর্‌ছিল অরুন্ধতীর দেব-সরোবরে! কাকচক্ষুর মত নির্ম্মল পবিত্র জল দেব-সেবার্থ মজুত! মানুষের বাহুশক্তির বা ইচ্ছাশক্তির এতোটুকু সাহস নাই—এই জল স্পর্শ করে' দেবতার অপমান করে।

প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষ, ভদ্র-অভদ্র সকলকেই মাঠের সেই পুষ্করিণী থেকে নিত্য ব্যবহারের জল বয়ে আন্‌তে হ'ত। অরুন্ধতীর বৃহৎ সংসারের জন্যও এখানকার জল নিয়ে যাওয়া হয়।

পানীয় জলের পুকুরটায় তখনও দুনী পাতা হয়নি। সমস্ত গ্রাম-বাসীরা এদিকে কড়া নজর রেখেছিল। কিন্তু দুরাশামত্ত চাষার দল, পুকুরের পাশাপাশি জমিতে সেই জলই একটু একটু করে তুলে দিতে লাগলো।—নিশীথ রাত্রিতে জনমানব ঘুমে অজ্ঞান হয়ে গেছে, বিরামহীন জনকতক লোক আজ ক'দিন ধরে চুপি চুপি দুনী মাথায় করে আসে, আর ঘণ্টা কতক খানিক-খানিক জল তুলে জমির ফসলে ছড়িয়ে দিয়ে চলে যায়।

বহু লোকের নিত্য ব্যবহারে আর নিশীথ সময়ের এই গুপ্ত ব্যয়ে পুষ্করিণীর জল-ভাণ্ডার ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আধা-আধি

হয়ে গেল—অরুন্ধতীর বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার মহাসমারোহ ব্যাপারে ঃ—নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিতের সংখ্যা গুণে শেষ হয় না, অথচ তাদের প্রয়োজনীয় জল ঐ একটিমাত্র পুষ্করিণীর বুক থেকেই নেওয়া! মন্দিরসংলগ্ন সরোবরের চারিদিকে কড়া পাহারা, পাছে কোনো বর্ব্বর ঠাকুর-দেবতার ভোগের জন্য নির্দ্দিষ্ট জল অশুচি ক'রে ফেলে। জগন্নাথের পূজারী আর জনকতক মন্দির-পরিচারক ব্রাহ্মণ ছাড়া, সরোবর-তীরে খোদ মালিক অরুন্ধতীরও যাওয়া বন্ধ।

দেশ-বিদেশ থেকে বহুলোক এসেছিল বটে, কিন্তু সকলেই গ্রামের জলকষ্ট, অধিকাংশ প্রজাদের পারিবারিক দুর্দ্দশার দৃশ্য চোখে দেখে চোখের জল আটকে রাখতে পারে নি।

দরিদ্রের কন্যা অরুন্ধতী, রাজারামের মন্ত্রদীক্ষিতা হ'য়ে দরিদ্রের ব্যথা ভুলে গেছে! তার অতীতের কথা আর মনে পড়ে না। মনে আছে শুধু জগন্নাথ—আর সেই জগন্নাথের মন্দির!

সে দেব-সেবায় মেতে উঠেচে। ঠাকুরের যেখানটিতে যা দিলে মানায়, সেখানটিতে সেই জিনিসই দেওয়ার জন্য তার প্রবল ঝোঁক চেপে গেছে।

মন্দির পরিচালনের জন্য সমিতি তৈরী হয়েছিল। সমিতির সকল সভ্যই ব্রাহ্মণ আর অতিরিক্ত গোঁড়া। প্রত্যেকেরই নামের পর ন্যায়রত্ন, সাংখ্যতীর্থ, স্মৃতিতীর্থ ইত্যাদির সংযোগ আছে; এদের মধ্যে অনেকেই দূরগ্রামবাসী। অরুন্ধতীর অনুরোধে তার এই অপার্থিব জমিদারীর শোভা-সম্পদ বর্দ্ধনের জন্যই শুভাগমন করেছেন। এবং তারা এই গ্রামেই স্থায়ীভাবে বাস করবেন—এমন আশ্বাসও অরুন্ধতীকে দিয়ে ফেলেচেন।

চৌদ্দ

রাত পোহালে—ঝুলন-পূর্ণিমা।

অরুন্ধতী বোধ হয় সমস্ত রাত্রিটাই ঘুমোতে পারেনি। তীব্র উৎকণ্ঠার আক্রমণে উত্তেজিত মন তার কেবলই আশঙ্কা করেছে—দেবকার্য্য হয়তো শৃঙ্খলার সঙ্গে সমাপ্ত হবে না। আবার মনকে আশ্বাস দিয়েছে—এ দেবতার কাজ, দেবতা কি বাদী হ'তে পারেন? তাঁর মুখ তিনিই রক্ষা করবেন।

চতুর্দ্দশীর চাঁদ চক্রবালের কোলে ঢ'লে পড়েছে। প্রভাতী বাতাসে পচা পাঁকের গন্ধ ভেসে আসছিল। চারিদিকে খানা-ডোবা-পুষ্করিণীর জল তুলে ধানের ক্ষেতে ঢেলে দেওয়ার পর, খানা-ডোবার পাঁক রৌদ্র-তেজে শুকোতে সুরু করে' বেশ একটা নতুন রকমের গন্ধ সৃষ্টি করেছিল; সে-এক বিশ্রী দুর্গন্ধ।

অরুন্ধতী দু'জন পরিচারিকার সঙ্গে স্নান করতে বেরিয়েছিল। অন্য দিনও সে ভোরে স্নান করে, কিন্তু আজ প্রতিদিনের চেয়ে প্রায় ঘণ্টা-খানেক পূর্ব্বে বেরিয়েচে। বাড়ীর সীমানা ছাড়িয়ে গ্রাম্যপথের ধূলোয় পা দিতেই, পচা পাঁকের বিকট দুর্গন্ধ তার নাকের কাছে বাসা বেঁধে নিলে। ঘৃণায় তার নাসিকা কুঞ্চিত হ'য়ে উঠলো; পরিচারিকা বললে —নাকে কাপড় দিন্, দিদি ঠাক্রুণ। ঘাটের মড়া হাড়-হাভাতে চাষারা সব মরেছে যেন! এ-যেন নির্বংশের ব্যাটাদের মড়া-পচার গন্ধ।

কাঁধের তোয়ালেটা প্রায় পাঁচ-সাত ভাঁজে ভেঁজে নিয়ে, অরুন্ধতী তার নাকের কাছে চেপে ধর্‌লে। পরিচারিকাদের তীব্র মন্তব্যে গরীব কৃষকদের ওপর তার রাগের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল।

যেতে হবে সেই মাঠের পুকুরে। নেহাৎ কাছে নয়। জগন্নাথদেবের স্নান-পূজা-ভোগের জন্য যে প্রকাণ্ড সরোবর তৈরী হয়েছে, তার নতুন নাম—'সুধাসমুদ্র'।

অরুন্ধতী সুধাসমুদ্রের ধার দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালো। পুকুরের উঁচু পাড় অতিক্রম করে' তখন সবে তারা নীচের পথে পা দিয়েছে।

পরিচারিকা প্রশ্ন করলে—থাম্‌লেন কেন?

অরুন্ধতী আঙুল দিয়ে দূরের উঁচু পাড়টা দেখিয়ে বললে—ঐ দেখ্‌! তারপর এক-পা এক-পা করে' এগিয়ে চললো।

চাঁদের জ্যোতি ম্লান হয়ে এসেচে। ফ্যাকাসে আঁধারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, ততদূর পৌঁছুতে অরুন্ধতীর সতেজ দৃষ্টিশক্তি পরাস্ত হয়ে গেল। মানুষ বটে, কিন্তু কে? এবং তার হাতে ও কী?

একজন পরিচারিকাকে তাড়াতাড়ি কোনো এক ভৃত্য বা দারোয়ান্‌কে ডেকে আন্‌বার হুকুম দিয়ে, অপরটীর সঙ্গে ক্রমশঃই সেই অস্পষ্ট মনুষ্য-মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লো।

কী সর্ব্বনাশ!

রাত পোহালে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হবে। সহস্র কুম্ভ সুধা-সমুদ্রের জল সর্ব্বপ্রথম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিতঠাকুর স্বহস্তে উত্তোলন ক'রে জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে ঢেলে দেবেন—স্বর্গগত রাজারামের

...উল্লসিত হ'য়ে উঠবে। অরুন্ধতীর স্বপ্ন-দর্শন ও দেবতা-আবাহন সার্থক হবে!—কিন্তু এ কি হ'ল!...সমস্ত রাত্রির চিন্তিত আশঙ্কা উষার বন্দনা-গীতির আসরে এমন স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে—কে ভেবেছিল!

অরুন্ধতী অবশ্য চিন্‌লে না—কে-একজন কুদর্শন নীচ জাতীয় পুরুষ প্রকাণ্ড এক মাটীর কলসী কাঁধে ক'রে সুধা-সমুদ্রের জল ভরে আন্‌চে। অরুন্ধতীর ক্রোধে ক্ষোভে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা হ'ল। তার মনে হ'ল, লোকটা সুধা-সমুদ্রের জল না তুলে তার বুকের রক্ত দিয়ে কেন মৃণ্ময়-কলস পূর্ণ করে নিলে না! সে-ও যে ছিল ভালো। তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এ কাজ কেন কর্‌লি?

লোকটি কল্‌সী নিয়ে চলে' যাবার উদ্যোগ করতেই, অরুন্ধতী নিজেই তার পথ আগ্‌লে দাঁড়ালো। বল্‌লে—ছোটলোকের আস্পদ্ধা দেখ। চলে যাচ্ছিস্ যে পাজী?...জল ছুঁতে গেলি কেন বল্?

লোকটা গম্ভীর এবং অবিচলিত হয়ে জবাব কর্‌লে—না ছুলে লোকের জীবন যায়!...তিন তিনটে ওলাউঠার রোগী জল-জল করে' গলা ফাটিয়ে ফেল্‌চে...কারু ঘরে একরত্তি জল খুঁজে পেলাম না।

অরুন্ধতীর রাগ সপ্তমে উঠলো, হয়তো নিজের হাত দু'খানাই সে নিজের মুখে কামড়ে ধর্‌বে। বল্‌লে—জল নাই তো মাঠের পুকুরে যেতে কী হয়েছিল?—এ তুই করলি কি হতভাগা! আজ যে আমার ঠাকুর-প্রতিষ্ঠার দিন,...আর তুই...

অরুন্ধতীর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝর্‌তে লাগলো।

লোকটা বল্‌লে—মাঠের পুকুরে যাবার সময় পাইনি। কলেরার

রোগীতে পাড়াটা ছেয়ে ফেলেচে। এই কলসীর জল সবাইকে একটু-একটু দেব। তারা কখন আছে কখন নেই।

অরুন্ধতী তীব্র রোষে বলে উঠলো—মরুক সব মরুক, উচ্ছন্নে যাক্। ···ছোটলোক—পাজী বেহায়ার দল!—এতটুকু যদি জ্ঞানগম্যি থাকে!··· একে ছোট জাত, তার ওপর কলেরা-ছোঁয়া। এখন আমি করি কী?··· চাষার দল কিনা,—মাথায় এটুকু ঢুক্‌লো না যে, ঠাকুর-দেবতার জল ছুঁলে রোগীর আরো অকল্যাণ হবে?

ছোটলোক চাষার মুখ থেকে তখন সতেজ প্রতিবাদ বেরিয়ে পড়্‌লো—অকল্যাণ কে কর্‌বে? যিনি তৈরী করেছেন, তিনি তো? সুধা-সমুদ্রের জল যদি তাঁর জন্যেই রাখা হ'য়ে থাকে, তা হলে আজ তা যথার্থ কাজে লাগলো। জগন্নাথের মাথায় ঢালার আগে জগন্নাথের আপন হাতে-গড়া মানুষের পেটে যদি পড়ে তো সে জলেরও ভাগ্য, জগন্নাথেরও কম আহ্লাদের কথা নয়।

উদয়াচল ফাগের রঙে রাঙা হয়ে উঠেচে।

রাস্তায় ভিড় জমে উঠ্‌চে দেখে অরুন্ধতী স্নানের জন্য আর পুকুরে গেল না। বাড়ীতে ফিরে এলো। জমিদার-বাড়ীর পাইক-বরকন্দাজ থেকে সুরু করে' দারোয়ান্-গোমস্তা-ম্যানেজার—কেউ বাদ পড়েনি, প্রায় প্রত্যেকেই সুধা-সমুদ্রের ধারে জমায়েৎ হয়েচে। সকলের মুখে একটা সভয় উৎকণ্ঠার চিহ্ন।

অরুন্ধতীর সাম্‌নে দিয়েই নির্লজ্জ অপরাধী যখন জলভরা কল্‌সী নিয়ে চলে গেল, তখন তার ইচ্ছা হয়েছিল—একখানা জতুগৃহ তৈরী ক'রে, তার জমিদারীর প্রত্যেক অপদার্থ লোকগুলোকে ধরে নিয়ে এসে সেই

ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়।…ছি ছি, একটা সামান্য ছোটলোককে আট্‌কাতে পার্‌লে না! যে অপরাধের মার্জ্জনা নাই, চোখের সামনে সেই অপরাধে অপরাধী হয়েও লোকটা জলের কল্‌সী মাথায় নিয়ে সটান্ চলে' গেল!…

শুধু চলে যাওয়া নয়—আবার যাবার সময় বলেও গেল,—জানি আমার এ-অপরাধের বিচার হবে—কঠোর সাজাও হবে। কিন্তু একটু সময় দাও, আমি জলের কল্‌সীটা রোগীর বাড়ীতে পৌছে দিয়েই ফিরে আস্‌চি। সব চেয়ে বড় শাস্তি আমি মাথায় করে নিতে রাজী থাক্‌লাম।

বাড়ীতে এসে তাড়াতাড়ি তোলা-জলে স্নান শেষ করে' আন্‌মনা অরুন্ধতী কাপড় ছাড়্‌তেও ভুলে গেল!…হায় হায়, আজ এ-কি অঘটন ঘটে গেল! দু'হাত যোড় করে' সিক্তবস্ত্রেই অশ্রু-গদগদ কণ্ঠে জগন্নাথের উদ্দেশে প্রার্থনা জানালে—হে ঠাকুর! হে ক্ষমাময়! তোমার কাজ তুমিই করিয়ে নিয়ে বেড়াও। তুচ্ছ মানুষ বড়াই করে—"আমি কর্‌চি" বলে'। আমার লক্ষ-ত্রুটীর জন্য বুকের রক্ত নাও, অপ্রসন্ন হ'য়ো না—আমার সাধের মন্দিরে শুভাগমন করো!

মন্দিরের প্রকাণ্ড প্রাঙ্গনে 'মন্দির-সমিতির' বৈঠক বসেচে। আলোচ্য বিষয়—সুধাসমুদ্র অপবিত্র হয়েচে, তাকে পবিত্র করে' নেওয়ার জন্য শাস্ত্রে যে-সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা লিখিত আছে, তারই আলোচনা।

অপরাধীকে কাছারী-বাড়ীর সংলগ্ন একটা ছোট অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ রাখা হয়েচে। তার বিচার করবে স্বয়ং প্রভু জগন্নাথের নামে দেবী

অনেকক্ষণ অনেক বাদানুবাদের পর ঠিক হল—যে পা'ড় দিয়ে উঠে যে-স্থান থেকে জল তোলা হয়েচে, সেই পাড়ের সেই স্থানটুকুর আধ হাত পরিমিত গভীর করে' মাটী তুলে ফেল্‌তে হবে, আর ঘাটের সোপান-চত্বর ভেঙে নতুন তৈরী করতে হবে। শুধু তাই নয়, এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আজ সমস্ত দিনব্যাপী শান্তি-স্বস্ত্যয়ন এবং গীতাধ্যয়ন ও চণ্ডীপাঠ চল্‌বে। শান্তি-স্বস্ত্যয়নের প্রধান ঋত্বিক হবেন—মাধাইপুরের ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুর।

স্মৃতি-তীর্থ-ন্যায়চঞ্চু-খেতাবধারী অনেকেই সমিতির সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত থাক্‌লেও আসল যিনি, সেই স্বাত্বিক ন্যায়ালঙ্কার মশায় এখনো খাতায় নাম লেখাতে বাকী আছেন।

তাঁর মত কাব্যালঙ্কারে মহাপণ্ডিত, শ্রেষ্ঠ বিধানদাতা এ-অঞ্চলে দ্বিতীয় কেউ নাই। তাঁকে যেমন করে হোক্—এ-গ্রামে স্থায়ীভাবে রাখ্‌তেই হবে।

অশ্বারোহণে লোক ছুটলো। তার পেছনে চল্‌লো—ষোলজন বেহারা সমেত মখমল্‌-মোড়া পাল্কী। অরুন্ধতী ন্যায়ালঙ্কারের জন্য ষোড়শোপচারে অর্ঘ্য সাজাতে বসলো।

তখন সবে আটটা বেজেচে। পণ্ডিতেরা জানালেন—বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার যতগুলি শুভযোগ লিখিত আছে, তার মধ্যে নিশীথ রাত্রিই সব চেয়ে উত্তম। ন্যায়ালঙ্কার পৌছানোর পর, যথারীতি শাস্ত্রীয় আচার-নিয়ম শেষ করে' প্রায়শ্চিত্তের দরুণ হোম-যজ্ঞ হ'তে হ'তেই রাত্রি হয়ে যাবে। তার পর শুভসময়ে শ্রীমুর্ত্তির পাষাণ-দেহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কিন্তু বেলা দশটা হ'তে হ'তেই সুধাসমুদ্রের চারিধার জনতায় ছেয়ে গেল। ছেলেবুড়ো, তরুণ-তরুণী বৃদ্ধা-প্রৌঢ়া—সে যে কত, ঠিক করে বলা চলে না। নবগ্রাম এবং তার চার-চাক্‌লার সকল গাঁয়ের লোকই হাতে এক-একটা কল্‌সী নিয়ে জল তুল্‌তে এসেচে! কেউ মানা শোনে না, কেউ লাঠির ঘাকে গ্রাহ্য করে না, ম্যানেজারের রক্তচক্ষু—রাণী অরুন্ধতীর সহস্র নিষেধাজ্ঞাকে কেউ মান্য কর্‌তে চায় না। সব তারা মরিয়া!···বেঁচে থাকার মহাসুখ থেকে যে আজ বঞ্চিত কর্‌বে, সে স্বয়ং ভগবান হ'লেও নিস্তার নাই, বিদ্রোহী পিপাসার্ত্ত প্রজাকুল আজ জলের জন্য নির্ম্মম দেবতাকেও রেহাই দেবে না। হোক্ তারা ক্ষুদ্র, থাক্ তারা দলিত বিপর্য্যস্ত হয়ে' সহস্র প্রতাপান্বিত জমিদারের চর্ম্মপাদুকাতলে—তবু আত্মরক্ষার্থ নগণ্য কীটও দংশনের জ্বালা না দিয়ে মরে না।

জমিদার-বাড়ীর বরকন্দাজ-পাইকদের সঙ্গে প্রজাদের দাঙ্গা বেধে গেল। কণ্ঠতালু-শুষ্ক ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্রের হাহাকার, আর রাজভোগপুষ্ট রাজ-পুরুষদের শাসনের উচ্চ চীৎকার—ত্রস্ত অরুন্ধতীকে সুধাসমুদ্রের ধারে টেনে আন্‌লে। সে দেখ্‌লে—মারামারিও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান-চণ্ডাল-বাগ্দী থেকে যে যেখানে ছিল—সকলে তার বড় সাধের সুধাসমুদ্র থেকে কল্‌সী-কল্‌সী জলও তুলে নিয়ে চলেছে। আজ শাসন করতে এসে মূর্খ প্রজাদের অবিমৃষ্যকারিতার কাছে সেই-ই শাসিত হয়ে গেল!

অরুন্ধতীর আগমন মাত্রই যারা বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারা সম্মান দেখিয়ে মাথা হেঁট করলে। অসংখ্য নতচক্ষুর অশ্রুতে সুধাসমুদ্রের জল লবণাক্ত হ'য়ে উঠলো। কিন্তু অরুন্ধতীর নয়নে তীব্র অগ্নিশিখা ধক্‌ধক্ করে জ্বলে যাচ্ছে!

মুহূর্ত্তকাল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে, সে হুকুম দিলে—যারা যারা দেবতার জল অপবিত্র করেছ, যদি সর্ব্বনাশের ভয় রাখো তবে হাত তুলে দাঁড়াও।

আশ্চর্য্য! মৌন প্রজাকুল 'দারুভূত-মুরারী' হয়েই দাঁড়িয়ে রইলো। হাত তুলে দাঁড়ানো দূরের কথা, একটি প্রাণীও হাতখানা নড়াচড়া করলে না!

অরুন্ধতী আবার বল্‌লে—যারা জল তুলেছ, তারা অপরাধ স্বীকার করো।

দলের মধ্যে একজন উত্তর করলে—প্রাণ বাঁচাবার জন্যে পানীয় নেওয় যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমরা সে-অপরাধ স্বীকার কর্‌লাম। কিন্ত মনে রাখ্‌বেন,—জল আমরা অপবিত্র করিনি।...সমস্ত বিশ্বসংসারকে যে ধুয়ে-মুছে পবিত্র করে, তাকে অপবিত্র করবার সাধ্য কি? জল সাক্ষাৎ নারায়ণ। সে-তো কারুর হাতের স্পর্শে অপবিত্র হবার অপেক্ষ রাখে না!

অরুন্ধতী সবিস্ময়ে চেয়ে দেখ্‌লে—বক্তা আর কেউ নয়, অপরাধী স্বয়ং —যে ভোর বেলায় সর্ব্বপ্রথম সুধাসমুদ্র অপবিত্র করেছিল। উদ্ধতকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তোকে ছাড়্‌লে কে?

অপরাধী তেজোদৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিলে—ছাড়্‌লে আমার অন্তরাত্মা তারই প্রেরণায় এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে আমি তুচ্ছ কয়েদখানার দরজা ভে বেরিয়ে আস্‌তে পেরেছি।...'বন্দী থাক্‌বো না'—বল্‌লে, কে এম শক্তিধর আছে যে, জোর করে' তাকে আট্‌কাতে পারে? তুমিই কি পেরেছ রাণী—অসংখ্য তোমার প্রজাদের অস্পৃশ্যতা থেকে দেবত

জন্যে নির্দ্দিষ্ট সুধাসমুদ্রকে পবিত্র রাখতে? অন্তর চাচ্ছে—তার অভাব!—সে নেবেই। ভগবান এই জেদের দৌলত দিয়েই মানুষকে মানুষ করেছে, পশুকে করেছে পশু।…যে পাবে না, সে মরবে, তবু অভাবের জ্বালা সইবে না।

কী স্পর্দ্ধা—এই ছোটলোকের—তারই প্রজা হ'য়ে…

অরুন্ধতীর মনের মধ্যে তুফান উঠেছিল। কম্পিত অথচ বিরক্তিপূর্ণস্বরে সে প্রশ্ন করলে—মাঠের পুকুরে সব গেলে না কেন?—সেখানে তো ঢের জল ছিল?

—থাক্‌লে কি আর প্রজা হয়ে রাজার বিরাগভাজন হই? গত রাত্রিতে কতকগুলো চোরে সমস্ত জল চুরি করে' তুলে নিয়ে ধানের ক্ষেতে ছড়িয়ে দিয়েছে। ভিজে কাদা খেয়ে ক'টা মানুষ কতক্ষণ বাঁচে? তা ছাড়া দেবতা-প্রতিষ্ঠার ঝোঁকে পড়ে' তুমি মা হয়েও সন্তানের দুর্দ্দশা চোখে দেখ্‌ছো না! অনাহারের জ্বালা, পিপাসার অত্যাচার—সব একজোট্ হয়ে' গ্রামের অভাগাদের ধ্বংস-পথের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। কলেরায় প্রতিদিন দু'-তিন জন করে' যমপুরী পালাচ্ছে, অথচ কেউ প্রতীকারের পথ খুঁজ্‌বে না, খোঁজ্‌বার সাহসও নেই—শক্তিও নেই।

অরুন্ধতী বল্‌লে—ক্রোশ-তিনেক দূরেই তো নদী, নদীর বালি খুঁড়েও জল পাওয়া যায়, সেখানে গেলিনি কেন? আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে—এ-দুর্ম্মতি তোদের মাথায় কেন এলো?

—দুর্ম্মতি নয় রাণী, যদি একটিবার তোমার অত্যাচারিত প্রজাদের উঠোনে গিয়ে দাঁড়াও, তাহলে দেখ্‌তে পাবে—কতবড় জ্বালার ব্যথা

সইতে না পেরে, তারা বাঘের মুখে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। দেবতার রোষে পড়্‌লে সর্ব্বনাশ হয়,—এ-কথা কে না জানে? কিন্তু তেত্রিশ কোটী দেবতার মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি উপবাসী জগতের হাত থেকে দুধ-ক্ষীর-ননীর ভোগ আদায় করবেন, আর ভোগজড়িত কণ্ঠে 'বর' দেবেন—'সর্ব্বনাশ হোক্ তোমাদের, অস্তিত্ব লোপ পাক্ তোমাদের!' মানুষের অস্তিত্ব লোপ পেলে দেবতার দেবত্ব কে বজায় রাখ্‌বে? প্রজা যদি উচ্ছন্নের দোরে চলে যায়, তাহলে রাজার দুর্ভর পেট কে ভরিয়ে দেবে?...তুমি কি জানো না রাণী!—ভবিষ্যৎ-হত্যার উদ্দেশ্য নিয়েও কসাই তার প্রাণী-শিশুর মুখে আহার দেয়—পানীয় দেয়?...আজ যদি তোমার শতসহস্র প্রজা একমুষ্টি অন্নের অভাবে, একবিন্দু জলের অভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, দেবসেবার উৎসাহে আজ যদি তুমি তাদের ব্যথার কথা কানে না তোলো, তাহলে তুমিই বা বাঁচবে কি নিয়ে, আর তোমার দেবতার মন্দিরই বা চল্‌বে কিসের জোরে? তোমার জগন্নাথ কি শুধু তোমার এই বহুমূল্য মন্দিরের লোভেই তাঁর জগত ভুলে থাক্‌বেন? না তুমিই তাঁকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে পারবে? জগতের নাথ ব'লেই যে তাঁর নাম জগন্নাথ!

অরুন্ধতীর আর সহ্য হল না। অন্তরে তখন দুর্জ্জয় চাঞ্চল্য এসেছিল। বুকখানাও থেকে থেকে দুল্‌তে সুরু করেছিল। ন্যায়রত্নদের একজন বলে বস্‌লেন—মূর্খের তর্ক-যুক্তিতে শাশ্বত শাস্ত্রের বিধান উল্টে যায় না।...উদ্ধত অবাধ্য এ-প্রজার কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত।

মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় অরুন্ধতী অপরাধীকে প্রশ্ন করলে—তোমার নাম কি? বাড়ী কোথা—এই গাঁয়ে?

অপরাধী কপট বিনয়ের সঙ্গে অবজ্ঞার সুর মিশিয়ে জবাব করলে—আমার বাড়ী এ-গাঁয়েও নয়, কাছাকাছি কোনো গায়েও নয়। জেনে রাখুন—আমি আপনার প্রজা নই!

—তবে?

—আমি ভাস্কর। পাষাণ খোদাই করে' দেবতার প্রতিমা গড়ি আমি। পাথরের বুকে পদ্মফুল ফোটাই। কিন্তু তোমার এই তর্কচঞ্চু-পুরোহিত ঠাকুর মশায়দের মত মানুষের ভেতর দানবের মূর্ত্তি আঁকিনে।—তাতে আমার বিবেক বিদ্রোহী হয়ে ওঠে!···আজ ছ'মাস হতে চল্‌লো—এই গ্রামে বাস কর্‌ছি, এখানকার প্রত্যেক ছেলেটি পর্য্যন্ত আমার বুকের কলিজা। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য এই পরাধীন প্রজাদের, তারা রাজার কাছে অভাব জানাবার অধিকার-হারা! কিন্তু আর আমি তর্ক করতে চাইনে। যেখানে উপেক্ষা আর অবজ্ঞা বর্ত্তমান, সেখানে তর্ক-যুক্তির ঠাঁই থাকে না।

তারপর হঠাৎ সে আপনার হাত দুটো এক করে' দিয়ে একজন দারোয়ানকে বল্‌লে—নাও চট্ করে বেঁধে ফেলো। বিচার এখনও শেষ হয় নি। আমি আবার কয়েদখানায় ফিরে যাবো।

তখন অধিকাংশ লোক সুধাসমুদ্র খালি করে' আপন আপন কল্‌সী পূর্ণ করে নিয়েছে।

পনের

ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুর মাহেন্দ্র-ক্ষণেই শুভ পদার্পণ করলেন। অরুন্ধতী গলায় আঁচল জড়িয়ে পাদ্যার্ঘ্য নিয়ে তাঁর পদবন্দনা কর্‌লে। চারিদিকে লোকজন ছুটোছুটি করতে লগেলো।

শান্তি-স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হ'তে আর বেশী দেরী নাই।

সুধাসমুদ্র অপবিত্র হওয়ার কথা শুনে, ন্যায়ালঙ্কার সবান্ধবে স্মৃতির পাতা উল্টাতে উল্টাতে, এক জায়গায় থেমে গেলেন। তারস্বরে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে' করে' অরুন্ধতীকে তার বাঙ্‌লা অর্থ বুঝিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—চণ্ডাল ও ম্লেচ্ছের স্পর্শে যে-জল অপবিত্র হয়েছে, তা হিন্দুর অস্পৃশ্য—দেবতার অপেয়; কিন্তু সুধাসমুদ্রকে যদি ক্ষীর-সমুদ্র কর্‌তে পারো মা, তবেই তার দোষ খণ্ডন হবে, নইলে নয়। ক্ষীর-সমুদ্র কর্‌তে হ'লে—একশো আট কল্‌সী দুধ আর সোয়া মণ চিনি ঐ সুধাসমুদ্রের জলে ঢেলে দিতে হবে। তারপর তার চতুর্দ্দিকে হোম ক'রে, জ্বলন্ত যজ্ঞকাষ্ঠ জলে নিক্ষেপ কর্‌লেই সেই জল অবিকল গঙ্গাজল তুল্য পবিত্র হয়ে যাবে।

অরুন্ধতী চিন্তিত হয়ে' বল্‌লে—কিন্তু এই সংক্ষেপ সময়ের মধ্যে এ-কি সম্ভব হবে ঠাকুর মশায়? আমার গ্রামে অত দুধ তো যোগাড় করতে পারবো না!—বল্‌তে বল্‌তেই তার অন্তরটা সহসা শঙ্কিত হয়ে উঠলো। —দুধ যদি প্রজারা না দিতে চায়? যাদের বিপদের সময় সে এক

কল্‌সী জল দেয় নি, জুলুম করে' খাজনা আদায় করেছে, অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে মন্দির-প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করেছে,—আজ সুযোগ পেয়ে তারা যদি প্রতিশোধের দণ্ড হাতে নিয়ে দাঁড়ায়? কী এমন সামর্থ্য আছে—যার জোরে সে গ্রামের মধ্যে দুগ্ধ-সংগ্রহের জুলুম জারী করে দেবে?—অপরাধী ভাস্করের কথা তখন স্মরণে এলো—'কসাই তার হত্যার জন্য রক্ষিত প্রাণীর মুখেও আহার যোগায়।'…সে তার সকল সৌভাগ্যের মূল—প্রজাদের মুখে আহার দেওয়া দূরে থাক্, তাদের কষ্ট-সঞ্চিত মুখের আহার অত্যাচার করে' কেড়ে নিয়ে নিজের পেট ভরিয়েছে। …কিন্তু এ যে দেবকার্য্য! মানুষ আর দেবতা!…

অকস্মাৎ মাথায় বুদ্ধি গজালো। তখনি হুকুম দিলে—ভাস্করকে মুক্তি দাও, আমি তাকে চাই।…

ভাস্কর করযোড়ে অরুন্ধতীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হেসে বল্‌লে—বধ্য-ভূমিতে যেতে হবে কি রাণী?…কিন্তু হঠাৎ ছেড়ে দিলে যে?

অন্তরে অন্তরে লজ্জিত হয়ে অরুন্ধতী বল্‌লে—দেখ, দেবতা-প্রতিষ্ঠার কাল ব'য়ে যায়,—এ-সময় আমার মনের ঠিক নেই। তুমি ভাস্কর, পাথর খোদাই করে' আমার প্রাণের প্রভুকে সাকার করেছ; আজ তুমি তাঁর অভিষেক-ক্রিয়ার উপকরণ যুগিয়ে দাও। নইলে আর কেউ পারবে না। তোমার হাতে-গড়া জিনিস—তাতে দেবতার আবির্ভাব হবে।…

ভাস্কর হেসে বল্‌লে—মজুরী নিয়ে জিনিস তৈরী করাই আমার

পেশা। পাথর কেটে আমি দেবমূর্ত্তিও যেমন গড়ি, দরকার হ'লে বাঁদর গড়্তেও তেমনি পারি। মাটীর হাঁড়ি-কলসীতে মোহর রেখে দিলেও, কুম্ভকারের কিছু লাভ নেই।—গ'ড়ে, বেচার পরেই তার সঙ্গে সর্ক্ল সম্বন্ধ শেষ হয়ে যায়। দুর্গন্ধ ময়লা-ভরতি কল্‌সী দেখেও তার কোনো দুঃখ হয় না, সুধাপূর্ণ ভাণ্ড দেখেও তেমনি বুকখানা তার দশ হাত ফুলে ওঠে না। আমার খোদাই করা মূর্ত্তি আজ যদি তুমি সুধাসমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দাও, তাতেও আমার লাভ নেই, আবার দেবতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে দেবকার্য্যের দোহাই দিয়ে দানবী-লীলার অভিনয় আরম্ভ করলেও প্রতিবাদের গরজ নেই। তবে দুঃখ হয় এই অত্যাচারিতদের দুর্দ্দশা দেখে।

সহসা অরুন্ধতী মিনতির সুরে বলে উঠলো—আমি শপথ করছি, এবার থেকে তাদের বিপদে-সম্পদে সহায় হবো।···কিন্তু তার আগে চাই আমার বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা।

ভাস্কর উত্তেজিত হয়ে বল্‌লে—দেবতাকে দেবতা বলে ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্মান কে দেখাবে রাণী? মানুষ তো?···নির্জ্জন বনে, জীর্ণ মন্দিরের ভেতর অর্দ্ধভগ্ন শিবলিঙ্গ এক-গণ্ডূষ জল পায় না—পূজো হওয়া দূরের কথা! বিবেকহীন পশু নিঃশঙ্ক হয়ে সেই দেবাদিদেবের প্রস্তর-লিঙ্গে মূলত্যাগ করে। কিন্তু মানুষের নজরে এলেই তবে শিবলিঙ্গ বিল্ব-পত্র-গঙ্গাজলে নিত্য পূজো পায়, পশুর অত্যাচার থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।···সেই মানুষকে বঞ্চিত করে দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করা! এ দেবতাকে সম্মান নয় রাণী—এ তাঁর অপমান! আজ তুমি দেবতার সম্মান চাইছো না—চাইছো আপন সম্মান।

অরুন্ধতী আকুল কণ্ঠে বলে উঠ্‌লো—ভাস্কর! তুমি আমাকে মার্জ্জনা করো—ক্ষমা দাও! আজ আমার বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন এনো না।

ভাস্কর মাথা নত করে দাঁড়ালো।

অরুন্ধতী বল্‌লে—আমি অনুরোধ কর্‌ছি, ভাস্কর! তোমাকে মিনতি জানাচ্ছি—যেমন করে পারো একশো আট কুলসী গো-দুগ্ধ আমাকে যোগাড় করে এনে দাও। আমি জানি এ-কাজ যদি কারো সামর্থ্যে কুলিয়ে ওঠে—তবে সে তোমারই।···অপবিত্র সুধাসমুদ্রকে পবিত্র কর্‌তে হলে এই দুধই আগে চাই।

তেমনি নমিত মুখ নিয়েই ভাস্কর বল্‌লে—কিন্তু আমি তো তোমার প্রজা নই রাণী···এখানকার অধিবাসীও নই।

অরুন্ধতী বল্‌লে—তবু তুমি এখানকার সব। আমি আগে খোঁজ রাখিনি, মাত্র আজ শুন্‌লাম—দশখানা গাঁয়ের রাজা তুমি। এদের অন্তরে তোমার সিংহাসন; আনন্দ তোমার খাজনা; সেবা ও প্রেম তোমার শাসনমন্ত্র!···দোহাই ভাস্কর, আমি আজীবন কেনা হয়ে থাক্‌বো,—ভিক্ষা দাও।···

ভাস্কর চিন্তিত হয়ে উঠ্‌লো। গম্ভীরভাবে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর জিজ্ঞাসা কর্‌লে—একশো আট কল্‌সী দুধ সুধাসমুদ্রের জলে মিশিয়ে দিলে, অপবিত্র জল পবিত্র হবে?—এ কা'র দেওয়া বিধি জান্‌তে পারি রাণী?

অরুন্ধতী বল্‌লে—শুধু তাই নয়, দুধের সঙ্গে সোয়া মণ চিনি আছে। বিধি দিয়েছেন স্বয়ং ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুর।···তাঁর কথার ওপরে আর কথা নেই ভাস্কর।

ভাস্কর বিকৃত মুখভঙ্গি করে বল্‌লে—হ্যাঁ, তা নেই বটে, চতুর্ব্বেদ ঐ ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুররেই মুখের কথা কিনা।···কিন্তু দুধ আমি যোগাড় করে দিতে পারি, তবে সর্ত্ত আছে, যদি রাজী হও—

অরুন্ধতী ব্যগ্রকণ্ঠে বলে উঠ্‌লো—আমি রাজী—রাজী, ভাস্কর! এই মহাদায় থেকে উদ্ধার পেতে আমি সকল সর্ত্তেই রাজী রইলাম।

ভাস্কর আবার গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লো। জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আমি এখন মুক্ত না বন্দী?

অরুন্ধতী বল্‌লে—মুক্তির ডাক তোমার কণ্ঠে-কণ্ঠে আপনিই ধ্বনিত হয়ে উঠেচে ভাস্কর! তুমি মুক্ত! কিন্তু মিনতি জানাচ্ছি, দেবতার বন্দীত্ব থেকে আমাকে মুক্তি দিয়ো।

ভাস্কর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।···

ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুর নবগ্রামে বসবাস করতে মত দিয়েছেন। আঃ—অরুন্ধতী যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লো! তখনই ম্যানেজারকে হুকুম দিয়ে দিলে—পঁচিশ বিঘা নিষ্কর জমি ন্যায়ালঙ্কারের নামে দানপত্র করা হোক্‌, আর সপরিবারে বাস করবার জন্য সবচেয়ে ভালো একখানা বাড়ী তৈরী করে দেওয়া হোক্‌।···

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঠাকুর মশায়ের বাসস্থান ও জমি দেওয়ার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু সেই দিনই বৈকালে চার পাঁচ জন প্রজা কাঁদ-কাঁদ হয়ে এসে অরুন্ধতীর দর্শন চাইলে। কিন্তু অন্তঃপুর থেকে সংবাদ এলো—নানাকারণে আজ রাণীমা জমিদারী-সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত, কথাবার্ত্তা

কওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। বিশেষ দরকার থাকলে দিন-চারেক পরে আসতে হবে।

প্রজারা কেঁদে কেঁদে ম্যানেজারকে জানিয়ে গেল—তিনপুরুষের ভোগদখল আমাদের···অবিচার করে, অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না। বাস্তুভিটে যদি জোর করে কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন, তা হলে জগন্নাথের মন্দিরে এসে আপন-আপন টুঁটি কেটে রক্ত বের করবো, জলের বদলে রাণীমার ঠাকুরকে তাজা রক্তে নাইয়ে দেব।

ম্যানেজার তীব্র তিরস্কারে জানালেন—যা বলবার রাণীমার কাছে বলিস্!···আমি ওসব নাকিস্থর শুন্‌তে ভালোবাসি না। যা···

প্রজারা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এসেছিল, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তেই ফিরে চলে গেল। কিন্তু ম্যানেজারের কর্ত্তব্য তখনই শেষ হল না। সুধাসমুদ্র পাহারা দেওয়ার জন্য যে দারোয়ান নিযুক্ত ছিল, তাড়াতাড়ি এসে সংবাদ দিলে—আবার সবাই ভারে-ভারে জল তুলে নিচ্ছে। বারণ করলে কেউ শুন্‌তে চায় না। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ জন লোক।

ম্যানেজার রাগে বোমা-ফাটা হয়ে পড়্‌লেন। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে দারোয়ানকে বল্‌লেন—শূয়ার উল্লুক কাঁহাকা···বল্‌তে বল্‌তে চটী জুতোটাই বেচারা দারোয়ানের মুখ লক্ষ্য করে' ছুঁড়ে মার্‌লেন।

দারোয়ান থত মত খেয়ে সরে দাঁড়ালো। ম্যানেজার বল্‌লেন—লাঠ্‌ঠি চালাও, খুন নিকালো।···

জল যারা তুলছিল—তারা তখন মরিয়া!···বিশেষতঃ তাদের নেতা ভাস্কর স্বয়ং সুধাসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে! একজনের মাথা ফাট্‌লো না,—এক ফোঁটাও খুন ঝর্‌লো না, নির্ব্বিঘ্নে দরকারী জল উঠিয়ে নেওয়া হ'ল।

সংবাদ অরুন্ধতীর কানে পৌঁছলো। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সে; ভাস্কর যখন স্বয়ং হাজির থেকে জল তুলিয়েছে, তখন এ-ও হয়তো তার সর্ত্তের মধ্যে। অরুন্ধতী নিস্ফল আক্রোশে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

ঘোল

ঘোড়া ছুটিয়ে ভাস্কর গ্রামে-গ্রামে ছুট্‌লো।

তার কথায় সব লোকেই উঠতো-বসতো। সকলকে জমায়েৎ করে' মাঠের এক অশথ-তলার প্রকাণ্ড মিটিং বসালো।—সে কতক্ষণই বা!... স্থির হয়ে গেল—আজ রাত থেকেই যে যত পারে, অন্ততঃ তিন দিনের মত দরকারী জল সবাই যেন স্বধাসমুদ্র থেকে তুলে নিয়ে রাখে। তার পর কথা উঠ্‌লো—এক শো আট কল্‌সী দুধের যোগাড় কর্‌তে হবে।

ভাস্কর ভাবলে—এ অসম্ভব! লোকের মুখের আহার নষ্ট করে' বড় লোকের তুচ্ছ খেয়াল চরিতার্থ হয়, কিন্তু আর তা হ'তে দেওয়া চল্‌বে না। দেবসেবার দোহাই দিয়ে এই ভয়াবহ তামসিক অভিনয়কে সে কোনো রকমই প্রশ্রয় দিয়ে বড় কর্‌বে না।...কিছুক্ষণ চিন্তার পর বল্‌লে—ভাই সব! এক-শো আট কল্‌সী জলে খড়ি গুলে, দুধের মত রঙ করে' দাও! রাজা যদি খেয়ালের বশে প্রজার মাথা কাট্‌বার সাধ করেন, তাহলে প্রজার কি উচিত—সে খেয়ালের পোষকতা কর্‌তে আপন গলাটা ছুরীর ডগায় বাড়িয়ে দেওয়া?...সহ্য তো ঢের করে এসেচ ভাই, একবার বিদ্রোহ করে' দেখ। সমুদ্রে যার আসন বিছানো, তুচ্ছ শিশিরবিন্দুকে তার কিসের ভয়? পাঁচ হাজার বছর ধরে গণ্ডারের চামড়ায় পিঠ ঢেকে রেখেচ, সহিষ্ণুতার সীমা

ছাড়িয়ে গেছে, তবু কেউ কথা কইবার দুঃসাহস আননি ভাই; কিন্তু আজ তার প্রয়োজন হয়েচে। আজ মুখ ফুটে বল্‌তে হবে কথা, গাইতে হবে বুক ফুলিয়ে বিদ্রোহের গান, আন্‌তে হবে সেই শক্তি তোমাদের মুঠোর ভেতর—যার উদ্দাম প্রস্ফুরণে রাজার বিস্মৃত কর্ত্তব্য ফিরে আস্‌বে! অজন্মায় দেশে দুর্ভিক্ষ হ'ল,—কি-রকম তোমাদের রাণী? মহামারীতে পল্লীর বুকে শ্মশানের বিভীষিকা জেগে উঠ্‌লো—কী প্রতিকার কর্‌লে তোমাদের রাণী? এক-ফোঁটা জলের তরে হাহাকার করে রুগ্ন মুমূর্ষু তার অন্তিম নিশ্বাস ফেল্‌লে—কী সহানুভূতি দেখালে তোমাদের রাণী? ...সে যদি তার পাগ্‌লা খেয়াল নিয়ে আশ্রিতকে—মুখাপেক্ষীকে—পুত্রাধিক প্রিয় প্রজাকে বাঁদর-নাচ নাচায়, চাব্‌কে-চাব্‌কে তাদের পোষ্‌ মানাবার কল শিক্ষা দিতে থাকে, রক্তমাংস-দেহধারী বিবেক-বুদ্ধিশালী মানুষ হয়ে তোমরা তাই শুন্‌বে, সইবে?

"না—না—না"—গগনভেদী চীৎকার উঠ্‌লো—তোমার উপদেশ নিয়েই আমরা সব কর্‌বো। তুমি যা বল্‌বে, তাই আমাদের কর্ত্তব্য হবে।

ভাস্কর উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্‌তে লাগলো—বল্‌বার মত আমার কোনো ক্ষমতা নেই বন্ধুগণ! আছে শুধু বুকের মাঝে তুষানল। মগজের মধ্যে পদদলিতের দংশন-জ্ঞান! তোমাদের রাণী আমার চেয়েও তোমাদের আসল দরদী; কিন্তু তাঁর ঘুম ভাঙাও—নেশা কাটিয়ে দাও!...ছ-সাত মাস তোমাদের সঙ্গে আমার আলাপ; পেটের দায়ে খাট্‌তে এসে খেটে খাওয়ার ব্যথা আমি যেমন বুঝেচি, তেমন অনেকে বোঝে নি। তোমরা জুতোর ঠোক্কর খেয়েও ঘুমিয়ে রয়েচ, উপলক্ষ্য হয়ে আমি জাগিয়ে দিচ্ছি। এ ছাড়া আর কিছু আমার সাধ্যে কুলোবে না।...

…সভা ভঙ্গ হয়ে গেল। ভাস্কর বাছাই-করা লোকের দ্বারা আট-দশ খানা গাড়ী বোঝাই করে দুধের রঙে রঙ-করা একশো আট কল্সী জল নিয়ে এলো। অরুন্ধতী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে, চাইলে। ভাস্কর মাথা নীচু করে জানালে—সর্ত্তের কথা আমার এখনো বলা হয় নি রাণীজি!…প্রয়োজন হলে আমি সময়-অসময় মান্‌বো না।

অরুন্ধতী শিউরে উঠলো। কিন্তু কথা কইলে না।

মহাসমারোহে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-পর্ব্বের শুভ গৌরচন্দ্রিকা সুরু হ'ল। টিকিধারী নামাবলী-পরা মহা মহা গজপতি-বিদ্যাদিগ্‌গজগণ মণ্ডলাকারে উপবেশন করেছেন। ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুর ছিলেন পুরোভাগে।

ভাস্কর গম্ভীর অথচ বিনীত হয়ে অরুন্ধতীকে বল্‌লে—সর্ত্তের এক নম্বর হচ্ছে—প্রজা উচ্ছেদ করে ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুরকে যে নিষ্কর জমি দেওয়া হচ্ছে, তা হবে না। ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুর মশায় বিদ্বান, তাঁর পূজো-অর্চ্চনা দেশের সর্ব্বত্র, ভক্তের সংখ্যাও অল্প নয়। কিন্তু গরীব ঐ বেচারীরা,—সামান্য কয় বিঘে জমি সম্বল করে সংসারী হয়ে রয়েচে।—ওদের উচ্ছেদ করা জমিদারের ধর্ম্ম নয়।

তর্কচঞ্চুর দল ভিতরকার খবর সব জান্‌তো না, উত্তেজিত হয়ে' একজন বলে' বস্‌লো—ব্যাটা গর্ভস্রাব! প্রায়শ্চিত্ত কর্‌গে যা—

ভাস্কর প্রশান্ত হাসি হাস্‌লে। সহসা দু'খানা হাত যোড় করে অরুন্ধতীকে বল্‌লে—তুমি রাণী, সভামণ্ডপও তোমারই; আজ করযোড়ে হুকুম চাচ্ছি—যদি না দাও, তাহলে জেনে রেখো, আমি বিদ্রোহী…আমি চাই, এইসব

অতি-বড় স্বার্থসর্ব্বস্ব বেইমানদের টিকি ধরে বাইরে রেখে আস্তে। মিত্রের পুরীতে শত্রু ঢুক্‌লে, দলশুদ্ধ লোককে দূষিত করে তোলে। লোকালয়ের মধ্যে বাঘ-ভাল্লুক দেখা দিলে, লোকেরাই তাদের ধ্বংস করে ফেলে। নিজেদের ভালো হয়ে ভালো ভাবে বেঁচে থাক্‌তে গেলে, এম্‌নি অনেক কাঁটা তোলার দরকার হয়। এতো অতি তুচ্ছ কথা, দেহের মধ্যে যদি কোথাও দূষিত ক্ষত দেখা দেয়, তাহলে অনেক সময় দেহের সেই অংশকেই কেটে বাদ দিতে হয়।

সন্ধ্যা জলে-স্থলে তার আঁধারের আসন বিছিয়ে ফেলেচে। আলোক-মালায় সভামণ্ডপ বিচিত্র শোভা ধারণ করেছে। ভৃত্য সংবাদ আন্‌লে—রাজ্যের লোকে ঝাঁকে-ঝাঁকে আস্‌চে, সুধা-সমুদ্রের জল আর রাখ্‌লে না।

অরুন্ধতী মুখখানা রাঙা করে দাঁড়াতেই, ভাস্কর বলে উঠ্‌লো—এ-ও একটা সর্ত্ত, রাণীজি!

অরুন্ধতীর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অন্তরটা অনুতাপের ব্যথায় জ্বলে যাচ্ছিল। একবার ইচ্ছা হ'ল—দারুণ অপমানের প্রতিশোধ নেয়। রুষ্ট ভাবটুকু কাটাতে না পেরে বল্‌লে—দুধের কলসীগুলো গাড়ী থেকে নামিয়ে আনাও এখুনি।

ভাস্কর স্মিতমুখে জবাব করলে—চিন্তা ক'রো না রাণী। কাজের সময় ঠিক হাতের কাছে পেয়ে যাবে।...কিন্তু এইবার তৃতীয় সর্ত্তটা খুলে বলি...সুধাসমুদ্রের জলে দুধ ঢাল্‌বে তোমার প্রজারা সব আপন হাতে।...পুণ্যের বন্যাকে-বন্যাই অধিকার করবে—ন্যায়ালঙ্কার-স্মৃতিতীর্থ-প্রভুরা, আর সে-বেচারীরা যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে—

অরুন্ধতী ব'লে উঠ্‌লো—মানীর মান নষ্ট করে যারা, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা আজ তুমিই দাও ভাস্কর!

ভাস্কর কুণ্ঠিত ভাব দেখালে বটে, কিন্তু তেজস্বীতাকে বিদায় দিলে না। বল্‌লে—সুবিচারের দাবী রেখে, সে-ভার তোমার হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি রাণী।

অরুন্ধতী কিছু-একটা বল্‌তে যাচ্ছিল। ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে, সহসা তাঁর গলার যজ্ঞোপবীতটা দু'হাতে কুটি কুটি করে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বল্‌লেন—নিপাত যাও! নিপাত যাও!

ভাস্কর গলায় কাপড় জড়িয়ে ন্যায়ালঙ্কারের পদধারণ করতে যাবে—তিনি সাত-হাত পিছিয়ে গিয়ে বল্‌লেন,—নাস্তিক তুমি। চণ্ডাল-সদৃশ ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য!

ভাস্কর গলবস্ত্র হয়েই হাসি-হাসি মুখে বল্‌তে লাগ্‌লো—রুষ্ট হবেন না দেবতা। শান্ত হোন! আপনারা রুষ্ট হলে যে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে!—এই না-খেতে-পাওয়া গরীব প্রজার দল তা হ'লে যে মনের সুখে খেয়ে-প'রে বাঁচ্‌বে। আপনাদের সুদৃষ্টির মোহ থেকে বঞ্চিত হ'লে, আমাদের রাণী ঠাকুরুণ যে আত্মহত্যা করে লাঞ্ছনার ব্যথা জুড়োবেন!...আপনারা শান্ত সন্তুষ্ট থেকে জন্ম-জন্ম যুগ-যুগ এই দলিত হৃত-সর্ব্বস্ব বুকের ওপর রাজত্ব করুন। আর ধ্বংস হওয়াই যাদের ললাট-লিপি, তারা ধ্বংস হ'য়ে থাকুক।

অরুন্ধতী সহিষ্ণুতার সীমা হারিয়ে ফেল্‌লে। উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো—ওকে বেঁধে রাখুন ম্যানেজার বাবু!···ছোট মুখে বড় কথা আর সহ্য করা যায় না।···

তিন-চারজন লোক ম্যানেজারের হুকুম প্রাপ্তিমাত্রই ছুটে এসে ভাস্করকে চেপে ধর্‌লে।

ভাস্করের বিকট বীভৎস হাসিতে সভামণ্ডপ চমকিত হয়ে উঠ্‌লো।

ভাস্কর চীৎকার করে' বল্‌লে—আপন বাক্যের ওপর দৃঢ়তা রাখ্‌তে শেখনি অরুন্ধতী,—তবু রাজত্ব চালাবার সৌভাগ্য পেয়েছ। তোমার কি মনে পড়ে না যে···কিন্তু যাক্—হ্যাঁ তুমিই বলেছিলে—'ভাস্কর! চার-চাক্‌লার প্রাণের রাজা তুমি'···সেদিন যোড়হাতে মিনতি যাক্সা করেছিলে তুমি! আমি হয়তো দুর্ব্বল, তাই তোমাকে বিমুখ কর্‌তে পারিনি। কিন্তু মনে রেখ—আজ আর ভাস্কর ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে তোমার কাছে দাঁড়াবে না। যদি সত্যিসত্যিই হাজার-প্রাণে তাঁর সিংহাসন পাতা থাকে, প্রেম দিয়ে শাসন করবার শক্তি থাকে, তাহ'লে একদিন তোমারই রাজত্বের মধ্যে তার জয়-নিশান উড়বে।···ভাগ্যের লেখায়—আজ···

হঠাৎ অরুন্ধতীর যেন ভাবান্তর এলো! কি যেন ভাবে, অথচ তার নাগাল পায় না। কিন্তু তখনই সে ক্রোধে মুখ ফিরিয়ে নিলে। পাইকদের কড়া হুকুম দিলে—খবরদার!···বেঁধে অন্ধকার ঘরে আট্‌কে রাখিস্—

ব'লেই তার বুকখানা ছাঁৎ করে উঠ্‌লো!

পাইকরা ভাস্করকে নিয়ে চলে গেলে, ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুর বল্‌লেন—আর দেরী নয় মা! আগে তোমার সুধাসমুদ্রের ক্রিয়াকাণ্ডটাই শেষ করে আসি চলো।

উজ্জ্বল আলোকমালায় সরোবরের চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেচে, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং অরুন্ধতী সুধাসমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়ালো।

···সরোবরের প্রকাণ্ড বুকখানা ঘোলাটে! ঘাটের সোপানশ্রেণী পিচ্ছিল, সপ্‌সপে! চত্বরের উপর সারি-সারি পিতলের শূন্য কুম্ভ!... তীরভূমি—জন-সমাগম-বর্জ্জিত।

অরুন্ধতী সহজেই বুঝ্‌তে পারলে—ভাস্কর তার সর্ত্তপূরণ করে নিয়েছে, অর্থাৎ প্রজারাই সুধাসমুদ্রে দুধ ঢেলে দিয়ে চলে গেছে।

ন্যায়ালঙ্কার বল্‌লেন—জল স্বয়ং নারায়ণ, নিজে শুচি, সুতরাং তাকে অশুচি করার শক্তি কারো নাই। শাস্ত্রের নিয়মে সুধাসমুদ্র এখন ক্ষীরসমুদ্র!

তার পর সঙ্গীদের বল্‌লেন—আপনারা সমস্বরে গীতা পাঠ করুন। আমি বেদমন্ত্র আবৃত্তি করি।...তারপর শ্রীবিগ্রহের শুভ-অভিষেক সুরু হবে।···অরুন্ধতীকে জিজ্ঞাসা করলেন—স্বর্ণধেনু আনা হয়েচে মা?···অন্ততঃ সোয়া-পাঁচভরি হিসাবে প্রত্যেক স্বর্ণধেনুর ওজন হওয়া চাই!···এ-সব নিয়ম তুমি জানতে তো, মা-লক্ষ্মী?

অরুন্ধতী বল্‌লে—হ্যাঁ, সে-সব তো তৈরী হয়ে গেছে। আমি ঠাকুর-বাড়ীতে সাজিয়ে রাখ্‌তে বলে' এসেচি।

অকস্মাৎ গ্রামের মধ্যভাগে তীব্র আলো জলে উঠ্‌লো! একটা বিরাট কলরোল! গভীর আর্ত্তনাদ! সহস্র ভয়-কাতর কণ্ঠের করুণ হাহাকার! আকুল জনতার গগন-ভেদী ব্যগ্র ভিক্ষা—জল! জল! জল!

সতেরো

অরুন্ধতী দ্রুত চলে আস্‌ছিল। উপবাস-মলিন দেহ, অশক্ত চরণ আর চল্‌তে চায় না যেন! পশ্চাতে তার ন্যায়ালঙ্কারের সৈন্যবাহিনী—নবরত্ন-সঙ্ঘ!

কাছারী-বাড়ীর প্রান্তে এসে অরুন্ধতী থেমে গেল। ম্যানেজারবাবু ষোলজন পাইককে হুকুম দিচ্ছেন—শূয়ারকে বুকে চাকা দিয়ে ডল্‌তে ডল্‌তে নিয়ে আস্‌বি।

অরুন্ধতী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে—কাকে—কাকে ম্যানেজার বাবু?

—সেই বেয়াদপ্‌ ভাস্করটাকে। ব্যাটা আমার তিন-তিন জন পাইককে জখম করে' একটু আগে পালিয়ে গেছে।

অরুন্ধতীর মুখখানায় বিশেষ কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। ন্যায়ালঙ্কার বলে উঠ্‌লেন—অ্যাঁ! বল কিহে? গর্ভস্রাব ব্যাটা পালিয়েচে!

বিরক্ত হয়ে অরুন্ধতী বল্‌লে—আর গালাগাল দিয়ে ফল নেই ঠাকুর মশায়! যে সবল, সে দুর্ব্বলের অত্যাচার সইবে কেন? আমাদের পাইকরা তার চেয়ে দুর্ব্বল, তাই সহজে সে ওদের পরাস্ত করে' পালাতে পেরেছে।

ম্যানেজার বল্‌লেন—আমাদের প্রজারাই তাকে মাতিয়ে তুলেছে! ব্যাটারা সব ছোটলোকের দল, অহঙ্কারে ধরাকে সরা দেখ্‌ছে।

অরুন্ধতী রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় সে ? ভাস্কর কোথায় ?

ম্যানেজার বললে—আগুনে ঝাঁপাঝাপি করছে বোধ হয়।...যখন ছাড়া পেয়েছে, তখন আর-কোথাও সে যায় নি। আগুন লাগার গোলমাল শুনেই সে সকল বাঁধন তুচ্ছ করে' ছুটে গেছে।...যা না ব্যাটারা, —হাঁ ক'রে শুন্‌চিস্ কি ?

পাইকরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চীৎকার করে' অরুন্ধতী ডাক দিলে—ওরে ফিরে আয়, ফিরে আয় !—

কিন্তু কেউ বোধ হয় শুন্‌তে পায় নি। ম্যানেজারকে বললে—যান, শীগ্‌গীর ওদের ফিরিয়ে আনুন।

ম্যানেজার অবাক্-বিস্ময়ে চাইতেই, ব্যগ্র হয়ে অরুন্ধতী মিনতির সুরে বল্‌লে—আমার হুকুম—আমার সবিনয় অনুরোধ—ফিরিয়ে আনুন! ...মরণাপন্নকে এক ফোঁটা জল দিতেও যে নারাজ, তার জন্যে আলাদা নরক তৈরী হয়।...আমি সে-যাতনা সইতে পারবো না!...সমস্ত অশিক্ষিত দলের নেতা এই ভাস্কর। সত্যিকার রাজা সে। আজ এই দুর্দ্দিনে, রাজাকে তার বিপন্ন প্রজার সুমুখ থেকে ছিনিয়ে আনার প্রত্যবায় থেকে আমায় রক্ষা করুন ম্যানেজারবাবু!

ম্যানেজার যেন আকাশ থেকে মর্ত্ত্যের বুকে আছাড় খেয়ে পড়্‌লেন! —স্বয়ং রাণীমা তাঁকে মিনতি করে' বল্‌ছেন, ওদের না ফিরিয়ে আর উপায় নেই।

সহসা আর-এক আকস্মিক ঘটনা—জন-কতক দারোয়ান্ পাঁচ-সাতজন লোককে প্রবল প্রহার দিতে দিতে ধরে' নিয়ে এসেচে। তারা সব—সুধাসমুদ্রের জল তুলতে এসেচে! শুধু তারাই নয়—বহু লোক

কল্‌সী-কল্‌সী জল নিয়ে আগুন নিভাতে যাচ্ছে, তারা মানা শোনে না—লাঠিকে গ্রাহ্য করে না।

অরুন্ধতী তৎক্ষণাৎ বলে' উঠ্‌লো—সব্বাইকে ছেড়ে দাও!···তারপর প্রহৃত লোকদের বল্‌লে—যত পারো জল তুলে নাও, আগুন নিভিয়ে ফেলগে।...

অগ্নির তখন মধ্যলীলা চলেছে।

ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুর জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আর কতক্ষণ দেরী হবে মা? অমৃত-যোগ বয়ে যাচ্ছে।...তা ছাড়া আবার সুধাসমুদ্র অপবিত্র হ'লে—

হঠাৎ তীব্রস্বরে অরুন্ধতী বললে—সুধাসমুদ্র তার জন্মের পর থেকে, সর্ব্ব প্রথম আজ পবিত্রতা লাভ করলে।···কিন্তু কি বল্‌লেন ঠাকুর মশায়? —অমৃত-যোগ বয়ে যাচ্ছে?···এ-যোগ গরলের যোগ ঠাকুর মশায়!—যার সন্তানেরা সর্ব্বস্ব বাঁচাবার জন্যে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—তার মরণ হওয়াই মঙ্গল।···বলে'ই আর দাঁড়ালো না, সোজা দ্বিতলের সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেল।

অরুন্ধতীর তখন অভয়ার মূর্ত্তি! উপবাস-ক্লিষ্ট তনু তার আনন্দ উদ্বেগ ও উৎসাহের উচ্ছ্বাসে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌চে! সুনিবিড় শ্রদ্ধায় হঠাৎ তার কণ্ঠ হ'তে স্বর বেরিয়ে এলো—ভাস্কর! সত্যিই তুমি রাজাধিরাজ, তুমি ধন্য!···আশীর্ব্বাদ দিয়ে আজ আমাকেও ধন্য করো ভাস্কর! আমি তোমার স্নেহ-করুণার কাঙালিনী।

অগ্নির লীলা তখন অবসানের সীমায়।

আধ-আলো—আধ-অন্ধকারের মধ্যে সুউচ্চ মন্দিরচূড়া নজরে পড়লো।···এমন মন্দির—যার চূড়া আকাশের মেঘ ছুঁতে পারে! মন্দির

নির্ম্মান সম্পূর্ণ, কিন্তু বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার দিনে একি দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেল জগন্নাথ!···এ তোমার বিচার না শাস্তি না উদ্ধার?

বিশাল পুরী তখন খাঁ-খাঁ করছে!···সভামণ্ডপ জনশূন্য—!··· ন্যায়ালঙ্কারের দলও অদৃশ্য আর স্বর্ণ-ধেনুগুলি উধাও! পূজার উপকরণাদি এলোমেলো হয়ে বিক্ষিপ্ত!

কম্পিতহস্তে অরুন্ধতী মন্দির-দুয়ার খুলে ফেল্‌লে।—

উজ্জ্বল আলো! চোখ ঝল্‌সে যায়!···কিন্তু—ওকি!—কে ও বিগ্রহের পদতলে প'ড়ে?—কালীবর্ণ দেহ, দেহের স্থানে স্থানে দগ্ধ চিহ্ন ...কে? কে তুমি?

মূর্ত্তি ফিরে চাইলে, উঠে বস্‌লো। তারপর ভগ্নকণ্ঠে বল্‌লে—কে—রাণী?—অরুন্ধতী?···তোমার নেমক খেয়েচি, তাই প্রাণ-প্রতিষ্ঠাও আ নিজের হাতে ক'রে চল্‌লাম!...হয়তো এর প্রয়োজন হয়েছিল। দেখ তে ভক্তিময়ী রাণী,—সত্যিসত্যিই তোমার শ্রীবিগ্রহের মহাপূজো হয়ে কি-না?···হয়েচে রাণী?—প্রাণ-প্রতিষ্ঠা—চক্ষুদান—হ'য়েচে?

অরুন্ধতী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

ভাস্কর ক্ষিপ্তের মত হেসে উঠ্‌লো! বললে—তোমার ম্যানেজা হুকুম দিয়ে তোমারই প্রজার ঘরে আগুন ধরালে! ব্রহ্মার কোপ হ'তে হতভাগাদের বাঁচাতে গিয়ে নিজে কিন্তু বাঁচতে পারলাম না। অভিমা আর কার ওপর করবো অরুন্ধতী,—আজ দীর্ঘ ছ' মাস ছদ্মবেশে

যাতনা সয়ে সয়ে তোমার সান্নিধ্য-সুখ লাভ করেছি!—আজ আমায় বিদায় দাও অরুন্ধতী! তোমার 'হরধাম' থেকে আজ হরলালকে বিদায় দাও।

অরুন্ধতী আছাড় খেয়ে হরলালের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো!

তখন হরলালের দগ্ধদেহ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। অরুন্ধতীর দু'খান হাতই সে আপন শ্রান্ত মুষ্টির মধ্যে চেপে ধরে, ক্ষীণকণ্ঠে বললে—রাণী, —অরুন্ধতী!—বিদায় দাও আমাকে।—যাবার সময় চোখের জল ফেলা কি তোমার সাজে আজ? আমি তোমার কে?—তুচ্ছ জীবন নিয়ে সংসারে এসেছিলাম—প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে,—চ'লে যাওয়ার এ-ক্ষীণ আয়োজন তুমি যদি পণ্ড করে দাও আজ—

অরুন্ধতীর কান্না আর থামে না। কাঁদতে কাঁদতেই বললে—আমার জিম্মায় যা-কিছু আছে—সর্ব্বস্ব য্যাক্—আমি যাই—তবু আপনাকে যেতে দেব না।—দুনিয়ায় এতবড় উপহাস কেউ কারুকে করতে পারেনি—আজ আপনি যেমন আমায় করলেন।

হরলাল জোরে হেসে উঠলো। যেন আঁধার বাদলরাতের নিশীথ প্রহরে তুফানের বুকে বিজলীর চকিত-বিকাশ!—যেমন ভয়ানক তেমনি মর্ম্মান্তিক!

বললে—নিয়তি, রাণী—সব নিয়তির খেলা। হিন্দু হ'য়ে আজ এই সোজা কথাটা যদি ভুলে যাও, তা হ'লে তোমার জগন্নাথকে যে সত্যি-সত্যিই ঠুঁটো করা হবে অরুন্ধতী!

অরুন্ধতীর সারা অন্তর অভিমানের তীব্রতায় ভরে উঠলো। কিন্তু মুখ দিয়ে তার একটা কথাও বার হ'ল না। হরলালের পাশ থেকে

ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—চ'লে যাওয়ার আয়োজন আজ পণ্ড করে দেব আমি। গরীবের মেয়ে হ'য়ে সংসারে এসেচি—এ-রাণীগিরির দুর্ব্বিপাক থেকে আমার মুক্তি চাই আজ। যেমন করে পারি আপনাকে বাঁচাবো—বাঁচতে হবে আপনাকে—অন্ততঃ আমায় এ-অন্ধকার কারাগারের ভেতর থেকে বাইরের আলোয় নিয়ে যেতে।

হরলালের যাতনা-কাতর মুখখানা আবার হাসিতে ভ'রে উঠলো।

অরুন্ধতী ধপ্ করে মন্দিরের মেঝেয় ব'সে পড়লো। ক্লান্ত নয়ন মৃত্যু-পথযাত্রী হরলালের মুখের পানে তুলে বললে—মরতে যাচ্ছেন, কিন্তু দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেস না করে তো আপনার মরা হবে না আজ। আমি তো আগেই ব'লেছি,—যথাসর্ব্বস্ব, যা আজ আমার হাতে গচ্ছিত আছে,—সব খুইয়ে দিয়েও আপনাকে বাঁচিয়ে তুলবো। এত-বড় গ্লানির ভার আমার বইতে তো শক্তি নেই হরলালবাবু!

হরলাল আবার হেসে উঠলো। উপহাসের তীব্রতায় অরুন্ধতীকে ম্লান করে দিয়ে বললে—সুধাসমুদ্রের জল দূষিত হ'য়ে গেছে,—সাধের জগন্নাথ ঠুঁটো হ'য়ে প ড়েছে—কে তোমায় সাহায্য করবে রাণী?—দরিদ্র প্রজার তপ্ত রক্তে রাজার খেয়াল চরিতার্থ হওয়া সম্ভব হ'লেও মানুষের জীবন বাঁচানোর ক্ষমতা নেই তার। ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুরের বিধি-ব্যবস্থায় চিত্রগুপ্তের নথিপত্র বদ্‌লানো চলে না। তোমার ম্যানেজার-বাবুর চোখ-রাঙানীতে আজ যমদূতের হাত দু'খানা পঙ্গু করতে পারবে না।...কিন্তু কী সুন্দর তোমার এই মন্দির রাণী!—সারা দেহ জ্বলে যাচ্ছে—আগুনে আগুনে জীবনের সকল শান্তি পুড়ে খাক্ হ'য়ে গেল—তবু মন্দিরের মমতায় আজ আমার বাঁচতে সাধ হয়।...যদি বাঁচতে

পেতাম, তা হ'লে জগন্নাথের এত-বড় শাস্তিটা আমি রদ্ করে দিতাম অরুন্ধতী।...যিনি জগতের নাথ—জগতের জীব তাঁকেই অপমান করতে সাহসী হয়! এত বড় মহা অপরাধ থেকে তোমাকে আমি রক্ষা করতাম অরুন্ধতী!

অরুন্ধতী বাইরে চ'লে গেল।

হরলাল হো-হো শব্দে হেসে বললে,—মন্দিরের চূড়ো আকাশ স্পর্শ করছে!—জগন্নাথ, ভগবান হ'য়েও মহানিদ্রাচ্ছন্ন!—কে তোমায় সাহায্য করবে অরুন্ধতী!—তুমি তো কখনো কারুর প্রত্যাশা করনি!—জঙ্গল কেটে নগর বসিয়েচ,—ময়দানের মাঝে মনুমেণ্ট খাড়া ক'রেচ—কিন্তু বাঁচবার বা বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে ভুলে গেছ!...চিকিৎসক না হ'লে রোগের সঙ্গে যুঝবে কে ?...সুধাসমুদ্রের পবিত্র জলে সান্নিপাতিক আন্‌তে পারবে,—শান্তির সঙ্গে তার আলাপ হয়নি!

হরলাল উঠে বসতে গিয়েই আবার শুয়ে পড়লো। দু'-খানা দগ্ধ হাতের চামড়া তখন খ'সে পড়েচে।

অর্দ্ধ-সংজ্ঞাহারা হ'য়েও সে শুন্‌তে পেলে—অরুন্ধতীর কাছারী-বাড়ীতে অসংখ্য প্রজার দল বিদ্রোহী হ'য়ে চীৎকার করছে—আমাদের ভাস্করকে কোথায় রেখেচ—ফিরিয়ে দাও! নইলে রাণীর রক্তে রাজবাড়ী লালে-লাল হ'য়ে যাবে।

হরলাল দু'খানা হাত এক জায়গায় ক'রে জগন্নাথের সাম্‌নে প্রার্থনা করলে—হে জগন্নাথ, নিষ্ঠুরতার কি শেষ-সীমা থাক্‌তে নেই! যাকে ভক্ত করলে—তাকেই অভক্তি দিলে! যে দু'বাহু বাড়িয়ে চরণ ধরতে চায়—তাকেই দাও অভিশাপ!...তার স্বর্গগত পিতাকে মনে পড়লো।

ভক্তির মোহে যিনি আসল ভক্তিকে অন্তরের সীমানা থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে দিয়েছিলেন।···সেই ভুলেই আজ অরুন্ধতীর নিদারুণ প্রায়শ্চিত্ত!

প্রাঙ্গনের কোলাহল ক্রমশঃই উচ্চতর হচ্ছিল। হরলাল যাতনার সঙ্গে বেশীক্ষণ যুদ্ধ করতে পারলে না। সংজ্ঞা তার লুপ্ত হ'য়ে এলো। আপন হাতে গড়া বিশ্বপতির পাষাণ চরণতলে ভাস্করের অর্দ্ধমৃত দেহ লুটোপুটি খেতে লাগলো।···

···অরুন্ধতী একখানা খাটিয়া ও লোকজন নিয়ে যখন হরলালকে মন্দির থেকে দ্বিতলের ঘরে নিয়ে যেতে এলো,—তখন গ্রামবাসীরা জ্ঞানশূন্য হরলালকে মাথায় করে নিয়ে চলে যাচ্ছে!

রাণী হ'য়ে প্রজার কাছে আজ তার উঁচু মাথাটা এমন ভাবে নত হ'য়ে গেল যে,—সে ভাবলে—হে জগন্নাথ! যম-যন্ত্রণার মত এই রাজত্ব ভোগ কেন তুমি আমার কপালে লিখেছিলে? যাকে ছাড়তে চাইলেই মুক্তি মিল্‌তো—তাকে আঁকড়ে ধরবার দুর্নিবার প্রবৃত্তি তুমি কেন দিয়েছিলে আমাকে?

খাটিয়াখানা নামিয়ে রেখে লোকজন তাদের রাণীর পরিবর্ত্তনটাই ভালো করে নিরীক্ষণ করছিল। অরুন্ধতী নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বললে—যা, সব চলে যা এখান থেকে।

লোকজন চলে গেল। অরুন্ধতীর দৃষ্টি পড়লো—জগন্নাথের মূর্ত্তির দিকে!···কী কাতরতা সে-মুখে! কত ব্যথা,. কত যাতনা, কত বড়

ভীষণ ক্ষুধার অতৃপ্তি সে মহামহিমময় জগদীশ্বরের নবগঠিত পাষাণ-বিগ্রহের বদনে !

বিগ্রহ-বেদীমূলে লুটিয়ে প'ড়ে, অরুন্ধতী কেঁদে কেঁদে বললে—ঠাকুর ! বড় কাঙালিনী আমি ! অত্যন্ত রিক্তা ! আমায় মার্জ্জনা করো প্রভু ! তোমার চরণ ছুঁয়ে শপথ 'করছি—অসমাপ্ত পূজার আয়োজন আমি সাঙ্গ করবো। আমার সকল সাধ, সকল তৃপ্তির পুরোভাগে রইলো—তোমার পূজার এ-কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন ! এ ছাড়া, এ-বিশ্বে আর আমার যেন কিছু পাওনা না থাকে !···

তার 'মনে পড়লো হরলালের পিতার আদেশ—ভগবানের পূজা বিরাট আয়োজনে—অপূর্ব্ব ভক্তির বিপুল সমারোহে।···

···মুমূর্ষু হরলাল বলে গেছে—জগন্নাথ আজ সত্যসত্যই ঠুঁটো হ'য়ে গেছে !···

অরুন্ধতীর বুকখানা শিউরে উঠলো !···এ-মূর্ত্তি তারই গড়া !—সে-ই ভাস্করের অভিনয় ক'রে, তাকে শাস্তির অনল-কুণ্ডে ছুঁড়ে দিয়ে গেছে।

আঠারো

প্রাতঃকালে······

বিশিষ্ট এক ভদ্র-প্রজার বাড়ীতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ঘরেই হরলালের শয্যা বিছানো হ'য়েচে। কিন্তু গৃহস্বামীর সে-ঘর ছাড়া আর ঘর নাই। ব্রহ্মা বোধ হয় হরলালকে আশ্রয় দিবার জন্যই তাঁর কোপদৃষ্টিটুকু এই ঘরখানির দিকে তুলে ধরেন নি।

নবগ্রামের যাবতীয় প্রজাদের দু'চারখানি ঘর ছাড়া আর সবগুলিই গতরাত্রের অগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হ'য়ে গেছে।

ভাস্কর হরলাল, অন্তরের কৃতিত্বে গ্রামবাসীর শ্রদ্ধা-ভক্তি নিঃশেষে করায়ত্ত করেছিল। তাই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলকে আবরণবিহীন গৃহ-কোণে রেখেও, এই মহান্ ভদ্রব্যক্তি তাকে এই ঘরেই নিয়ে এসেচে।···

শেষ-রাত্রি থেকে হরলালের সংজ্ঞা এসেচে।

গ্রামের মাতব্বর অধিবাসীরা হরলালের শয্যার চারপাশে বসে উন্মুখ হ'য়ে তার সংজ্ঞা ফিরে আসারই প্রতীক্ষা করছিল।

হরলাল জল চাইলে।···কিন্তু জলের গ্লাসটা শুশ্রূষাকারীর হাতে দেখেই হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে—থাক্...তারপর ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—তোমরা ব'সে রয়েচ কতক্ষণ ধরে' ?

গৃহস্বামী রাইচরণ বললে—সারারাতের মধ্যে তোমার যে একটুও জ্ঞান ছিল না ভাস্কর !···

হরলাল বললে—সারারাত...সব্বাই ব'সে রয়েচ ?···কিন্তু মন্দির থেকে আমাকে এখানে নিয়ে এসেচ কি তোমরাই ? না রাণীর লোকেরা দিয়ে গেছে ?

রাইচরণ বললে—আমরাই নিয়ে এসেচি ভাস্কর।—রাক্ষসীর কাছে কি মানুষকে রেখে আসা উচিত ? সেখানে থাক্‌লে কি তুমি বাঁচতে ভাই ?···দৈত্যপুরীতে ফেলে রাখার ভরসা আমাদের হয়নি।

হরলাল নীরবে চিন্তা করতে লাগলো। আপনার সর্ব্বাঙ্গে ন্যাক্‌ড়া জড়ানো দেখে জিজ্ঞাসা করলে—এ-সব কে করেচে ?···

—রতন কব্‌রেজ।···ওষুধ লাগিয়ে বেঁধে দিয়েচে।···দেহের একটুও তো ফাঁক নেই ভাই!—সব জায়গায় ঘা আর ফোস্কা। হাত দু'খানার যা হাল হ'য়েচে···

হরলালের চোখ দুটো জলে ভ'রে উঠলো। জিজ্ঞাসা করলে—নুটু-চিনু—তারা কেমন আছে ?···তারা কোথায় ?

রাইচরণ মুখ ফিরিয়ে নিলে। অন্য একজন বললে—তারা সব ভালোই আছে ভাস্কর।—তুমি এখন কারুর কথা চিন্তা ক'রো না,···তুমি সেরে উঠলেই আমাদের সব হবে। নুটু-চিনুর চেয়েও তোমার প্রাণের দাম বেশী।

নুটু-চিনু গৃহস্বামী রাইচরণ ঠাকুরের মৃত ভ্রাতার পুত্র-কন্যা। হরলাল তাদের খুবই ভালোবাসে এবং গতরাত্রির অগ্নিকাণ্ডে, সেই-ই অর্দ্ধদগ্ধ হ'য়ে জলন্ত ঘরের মধ্য থেকে তাদের উদ্ধার করেছিল।

হরলাল পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে—কতগুলো ঘর পুড়েচে ?···কার-কার ?

রাইচরণ বললে—পরে শুনো ভাস্কর।—অসুখ যে খুব বেশী তোমার।

ঈষৎ উত্তেজনার সঙ্গে হরলাল বল্‌লে—মনের অসুখের সঙ্গে দেহের অসুখের তুলনা হয় না, না ব'ললে আমি বাঁচবো না।—বলো, আমাকে হিসেব দাও—কার-কার সর্ব্বনাশ হ'ল।

নতমুখে রাইচরণ বললে—গাঁয়ের মধ্যে খানকতক ঘর ছাড়া সবই পুড়ে গেছে।

—তোমার ক'খানা পুড়েচে?—

—সব, খালি এই একখানা বেঁচেছে।

উত্তেজিত হ'য়ে হরলাল উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগলো। বললে—তবে তাদের কোথায় রেখে এসেচ?—গাছতলায়?—মুটু-চিনুকে কোন্ জঙ্গলে রেখে এসে, আমাকে নিয়ে মেতে রইলে তোমরা?··· তা ছাড়া ঘর পুড়ে ভস্ম হ'য়ে গেল,—মেয়ে-ছেলেদের উপবাসী—আশ্রয়-হারা জেনেও—কোন্ লজ্জায় এখানে বসে আছ সব?···আমি বাঁচবো ভাই!—এতগুলো প্রাণের প্রার্থনা ভগবান কখনো না শুনে থাক্‌তে পারবেন না। তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমি বাঁচবো-ই!···কিন্তু তোমরা আর এখানে ব'সে থেকো না, যাও···যারা মুখ চেয়ে ব'সে আছে—তাদের কাছে ফিরে যাও!···আমার জন্যে ভেবো না।

একজনও উঠলো না।

হরলাল বললে—যদি না যাও, যদি মুখাপেক্ষীকে বঞ্চিত ক'রে আমাকে পলে-পলে অপরাধী করো—তাহলে ব'লে রাখচি ভাই!—আপন টুঁটি আপন হাতে টিপে ধ'রে আমি আত্মহত্যা করবো। ভয় নেই একটুও, আমাকে যদি এতদিন বিশ্বাস করে এসে থাকো, তবে আজো বিশ্বাস

করো—আমি বাঁচবো—বাঁচবো। তোমাদের এত বড় স্নেহ-মমতার বাঁধন ছিঁড়ে যদি ভগবান আমায় স্বর্গে নিয়ে যেতে চান্, তবু আমি যেতে চাইবো না।···যাও সব—আর দেরী ক'রো না।

রাইচরণই বসে রইলো,—আর-সবাই ধীরে-ধীরে একান্ত অনিচ্ছায় এবং বিমর্ষ মুখে উঠে চ'লে গেল।

হরলাল ডাকলে—রাইচরণ!

—কি বলছো ভাই!

—তোমার কথা শুনে আমার বাবার কথা মনে পড়ে। এত তোমার স্নেহ! অথচ আমি যে তোমার একান্তই পর!

রাইচরণ চক্ষু পরিস্কার করে হরলালের মুখের উপর ঝুঁকে বললে—রক্তের সম্বন্ধ না থাকলে কি 'আপন' হওয়া চলে না ভাস্কর?···সারা গাঁ-খানার যে আপনার চেয়েও আপন,—তাকে পর ভাববো আজ কেমন করে?—কিন্তু তখন জল চেয়ে খেলে না কেন ভাই?

হরলাল উদাস দৃষ্টিতে চাইতে-চাইতে বললে—জল?...আচ্ছা দাও।

···জলপানান্তে হরলাল আবার জিজ্ঞাসা করলে—নুটু চিনুকে কার বাড়ীতে রেখে এসেচ? মানু কোথায়?

রাইচরণ বললে— মানু আর তার কাকীমা ঘর-দোরগুলো পরিস্কার করছে।···অনেক লোকজন ছিল কিনা, তাই তোমার কাছে তারা আস্‌তে পারে নি। এইবার আসবে।

হরলাল বললে—না-না তারা কাজ করছে করুক। কিন্তু সত্যি করে বলো রাইচরণ,—নুটু-চিনু কোথায়?

রাইচরণ কোনো প্রকারে বলে ফেল্‌লে—তারা নেই ভাস্কর।...

—নেই !—নেই তারা !···তবে·····তবে কেন এতক্ষণ আমার সঙ্গে ছলনা করছিলে তুমি ?···তারা নেই ! যাদের জন্যে আমি মরতে চেয়েছিলাম, তারাই বাঁচলো না, অথচ আমাকে বাঁচতে হবে ?···কেন—কেন বাঁচবো ? এতখানি স্বার্থপর কবে থেকে তোমরা আমায় ভাবতে শিখেচ রাইচরণ ?

রাইচরণ অতি স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বললে—যারা গেছে, তারা তো আর ফিরে আসবে না ভাই !···হাজার-হাজার লোকের যে তুমি প্রাণ,—নয়নের মণি ! ···তাদের রেখে তোমার যাওয়া—সে যে সর্ব্বস্ব যাওয়া ভাস্কর !···

—কিন্তু তবু তুমি আমায় এত বিপদেও এখানে নিয়ে এসেচ ? কেন, নবগ্রামের সব লোকেই তো আগ্রহ করে আমায় আশ্রয় দিতে চাইতো !

রাইচরণ চোখ মুছতে-মুছতে বললে—সকল কাজের ভাগ দেওয়া চলে ভাস্কর, কিন্তু পুণ্যের ভাগ দেওয়া বড় কঠিন।···নুটু-চিনু আমার মৃত জ্যেষ্ঠের মাতৃহীন পুত্র-কন্যা। তাদের শোক—সে যে শক্তিশেল ভাই, আজ শক্তিশেলের ব্যথা জুড়োবার বিশল্যকরণী—তুমিই।

হরলাল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথা কইলে না।

রাইচরণও নীরবে ব'সে রইলো। দু'জনের এই নীরবতার মধ্যেই এক-ফাঁকে রাইচরণের জ্যেষ্ঠা ভ্রাতুষ্পুত্রী মানদা ঘরে এসে ধীরে-ধীরে হরলালের পা-তলার দিকে বসলো।

হরলাল ব'ল্লে—কাজ-কর্ম্ম ফেলে রেখে, এখানে না এলেই পারতে, মানু !—তোমার কাকা তো রয়েচেন।

মানদা কোনো কথা কইলে না।

রাইচরণ বললে—ততক্ষণ তুই বোস্ মানু! আমি কব্‌রেজ মশায়ের ওখান থেকে ঘুরে আসি।

ব্যস্ততার সঙ্গে হরলাল ব'লে উঠলো—আর পাপের বোঝাটা বাড়িয়ে দিয়ো না রাইচরণ!...আমি এত যাতনার ওপর আর-কত সইবো?—বুকখানা ফেটে দু'টুক্‌রো করে দিয়ে গেল,—নুটু আর চিনু,—তবু তোমার উঠতে-বসতে সাধ হয়? আমার তো নাভিশ্বাস ওঠেনি যে, তাড়াতাড়ি কব্‌রেজ মশায়কে না ডাক্‌লেই চ'লবে না? তার চেয়ে অন্য কাজে যাও। ঘরের যথাসর্ব্বস্ব পুড়ে গেছে—সকলকে কি খাইয়ে বাঁচাবে তার উপায় দেখগে।... টাকাকড়ি আছে তো? ঘর-দোরগুলো মেরামত করতে হবে, তার ভাবনা কতখানি ভেবেচ?...তোমাদের একটুও ভয় নেই রাইচরণ!—আমি তো বরাবরই বলছি যে, বাঁচ্‌বো—বাঁচবো, মৃত্যুর সময় এখনো হয়নি আমার।

রাইচরণ কোনোকথা না বলতেই বিরাট ধূমধামের সঙ্গে ঢাক-ঢোল-কাঁসর-ঘণ্টার বাজনা বেজে উঠলো।

হরলাল কান খাড়া করে খানিকক্ষণ শুনে নিয়ে, জিজ্ঞাসা করলে—পূজো হচ্ছে বুঝি...জগন্নাথ তা হ'লে সুস্থ শরীরেই এখনো মন্দিরে ব'সে র'য়েচেন।...মানদা!

মানদা মুখ তুলেই আবার মুখখানা নামিয়ে নিয়ে উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

হরলাল বললে—জগন্নাথকে সকালবেলায় প্রণাম করে এসেচ মানদা? মন্দিরে গেছ্‌লে?

মানদা জানালে—যায়নি।

হরলাল এ-সম্বন্ধে আর-কোনো প্রশ্ন না করে রাইচরণকে বললে—ঘর-গুলোর ব্যবস্থা করতে হ'লে এখন থেকেই চেষ্টার প্রয়োজন। আমার বিছানা আগলে ব'সে থাকার তেমন কোনো সার্থকতা নেই ভাই!—তুমি বেরিয়ে পড়ো। বাঁশ, খড় যা-যা দরকার সব দেখে-শুনে নিয়ে এসো। তা ছাড়া গাঁয়ের সকলকে জিজ্ঞাসা করো—কে কি ভাবে ঘরদোর মেরামত করবে, এবং খরচ-পত্র কার কেমন আছে। মোটামুটি একটা হিসেব চাই আমি।... শুধু তোমার জন্যেই আমি ব্যস্ত হইনি রাইচরণ, সকলকার জন্যেই আমার সমান ব্যথা।

একান্ত অনিচ্ছায় রাইচরণ বাইরে বেরিয়ে গেল।

ঘরে তখন মানদা আর হরলাল। কারুর মুখেই কথা নেই।

মন্দিরে ঢাকঢোল সমানে বেজে চ'লেছে।

হরলাল জিজ্ঞাসা করলে—তোমার কাকীমা কোথায় গেছেন মানু?... এ-ছাড়া তো তোমাদের ঘর নেই,—তাঁকে কোন্‌খানে বসিয়ে রেখে এসেচ?

মানদা বললে—বাড়ীর পেছনদিকটার বাগানে উনুন তৈরী করছে সে।

—কেন রান্নাঘর—সেখানে তো উনুন্ ছিল।

—রান্নাঘর সাফ করা এখন সম্ভব হবে না। সেখানে যা গরম! ভালো করে আগুন নিভেচে কি না কে-জানে।

ঘর থেকেই হরলাল শুনতে পেলে অনেক লোকজন বাড়ীতে ঢুকে গোলমাল স্থুরু করেছে। মানদাকে বললে—কারা এলো দেখ তো।

মানদা বেরিয়ে গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরে এসে বললে—রাজবাড়ী থেকে একখানা পাল্কী নিয়ে এসেচে, সঙ্গে আছেন ম্যানেজারবাবু।

হরলাল চোখ বুজে প'ড়ে রইলো।

মানদা ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে—ওরা কি-জন্যে এলো ?

হরলাল ব'ললে—বুঝতে পারো নি মানদা ?···ওরা আমায় ধরে নিয়ে যাবে।···কিন্তু তুমি—তোমরা আমার সেবা করতে পারবে না মানু ? যদি পারতে, ওদের হাতে আর আমি ধরা দিতাম না। তোমার কাকা বলছিলেন—রাক্ষুসীর হাতে কি মানুষকে ছেড়ে দেওয়া চলে!··· রাক্ষুসীর হাতে না দিয়ে তোমরা আমাকে—

হঠাৎ জুতোর খট্ খট্ শব্দ করতে করতে ম্যানেজার ঘরে ঢুকে বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে বললেন—রাণীমার লোক হ'য়ে এখানে পড়ে থাকা তোমার শোভা পায় না ভাস্কর!—তাতে রাণীমাকে অপমান করা হয়। পাল্কী এসেচে—চলো।

ম্লান হাসিতে হরলালের মুখখানা ভরে উঠলো। বললে—আমার তো শক্তি নেই ম্যানেজারবাবু।...কেমন ক'রে যাবো ?

ম্যানেজার রূঢ় ভঙ্গিতে ব'লে উঠলেন—যেমন করে এসেছিলে তেমনি করেই যাবে। বেলা দুপুর হ'তে চ'ললো।—আমাদের পরের বাড়ী খেটে খেতে হয়। একটুখানি বুঝে-সমঝে কথা ক'য়ো।

হরলাল বললে—না বুঝে আমি একদিনও একটি কথা কইনি মশায়! —আমার উত্থানশক্তি নাই।

ম্যানেজার বললেন—কিন্তু তুমি আমাদের লোক। রাণীমার টাকা খেয়ে চাকরী করছো...হুকুম শুনতে হবে তোমাকে।

—হুকুম!—হুকুম মানে কি ম্যানেজার মশায়!—কার হুকুম ?— আপনার ?

ম্যানেজার কর্কশকণ্ঠে বললেন—যদি বলি আমারই,—তাতে ‍
অন্যায় বলা হবে ?...রাণীমার এষ্টেটের আমি ম্যানেজার।

হরলাল ক্লান্ত হ'য়ে উঠছিল। বললে—আপনাকে দুশো নমস্কার—যেহে
আপনি রাণীর ম্যানেজার। কিন্তু একটা কথা আজ বলে রাখি—আপন
রাণীজিকে জিজ্ঞেস করে আসবেন—আমার ওপর তাঁর হুকুম চালানে
শক্তি আছে কতটুকু !...আমি চাকরী করতে আসিনি ম্যানেজারবাবু
—যার জন্যে এসেছিলাম, সে-প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। আজ পর্য্য
মজুরি হিসেবে এক-টাকাও আমি পাইনি—পেতে চাইও-না।...এখন দ
করে আমায় বিশ্রাম করতে দিন—আমি ক্লান্ত এবং নিতান্ত অসুস্থ।

বিকট মুখভঙ্গি করে ম্যানেজার বললেন—ক্লান্ত—নিতান্ত অসুস্থ
—আচ্ছা...কিন্তু ব'লে রাখচি—তোমাকে যেতে হবে। রাজার রাজে
বাস ক'রে রাজার বিরুদ্ধে, প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তোলার যে গুরুতর অপরা
সে-অপরাধের সাজা তোমাকে অবশ্য ভোগ করতে হবে।

হরলাল সামান্যক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করার পর, বললে—অপরাধ যা
ক'রে থাকি, তা'হলে আপনার রাণীজি কেন, স্বয়ং ভগবানও আমা
রেহাই দেবেন না। কিন্তু বিদ্রোহ আমি করিনি,—মানুষ হ'য়ে মানুষকে
মানুষ হওয়ার কৌশল শেখাতে চেষ্টা করেছি।...তা'হলে আপনি যা
রাণীকে আমার এই অবাধ্যতার কথা ভালো করে জানিয়ে দিন। তাঁ
সাধ্য থাকে, অবশ্যই সাজা দেবেন। মনে রাখবেন ম্যানেজারবাবু,-
ব্যর্থ-শাসনকারী শাসকের রক্তচক্ষু—ভাস্করের সুমুখে বিভীষিক
আন্‌তে পারবে না। ভাস্কর দরিদ্র বটে, কিন্তু সে মানুষ, বড়লোকে
খেয়ালের মস্‌লা যোগাতে তার কার্য্যপদ্ধতি গ'ড়ে ওঠে নি।

ম্যানেজার হুঙ্কার দিয়ে বললেন—মুখ সাম্‌লে কথা কও ভাস্কর! এটা নবগ্রাম—রাণী অরুন্ধতীর রাজত্ব। এখানে অবাধ্য প্রজার সাজা হয় অত্যন্ত কঠোর।

আবার হরলালের মুখে ম্লান হাসি। অবসন্নভাবে সে বললে—তার প্রমাণ তো হাতে-হাতেই পেয়েছি! রক্ষক হ'য়ে সর্ব্বস্ব ভক্ষণ করার প্রথা আজ আপনাদেরই এলাকায় এসে দেখতে পেলাম। নইলে আপন হাতে রাজা কখনো প্রজার ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়!—কোনো বর্ব্বর অসভ্যদেশেও এ-প্রথা আছে ব'লে আমার জানা নেই।

—তোমাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

—ঐ-টুকুই শুধু বাকী আছে। পৌরুষ বাড়াবার পক্ষে এত-বড় সুন্দর উপায়!...শাসন-শাস্ত্রে আর তো কিছুই লেখা নেই কিনা!...কিন্তু দোহাই আপনার,—আমি যাবো না,—সুতরাং আমাকে বিরক্ত করবেন না।

তারপর মানদার দিকে ফিরে চেয়ে বললে—গলাটা বড্ড শুকিয়ে উঠেচে, একটুখানি জল দাও তো মানু!

মানদা জলের গ্লাসটা হাতে করতেই ম্যানেজার মানদাকে ধাক্কা দিয়ে গ্লাসটা মাটীতে ফেলে দিলেন এবং আর কিছু না ব'লে তৎক্ষণাৎ গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলেন।

মানদা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো।

হরলাল বললে—কেঁদনা মানু!...জল দাও,—গলা যে শুক্‌নো কাঠ হ'য়ে গেলো।...কিন্তু তোমাকে আরো-একটা কাজ করতে হবে যে!

মানদা জিজ্ঞাসু হ'য়ে চাইতেই হরলাল ব'ললে—এক্ষুণি তোমার কাকাকে খবর দিয়ে এসো, যদি তাকে না পাও, যাকে পাবে তাকেই নিয়ে আস্‌বে। ব'লবে আমি ডাক্‌ছি।

তারপর আপন মনেই ব'ললে—প্রজাবিদ্রোহ কি বাস্তবিক আমিই ঘটিয়ে দিচ্ছি!...খাওয়া-পরার ব্যথাকে মূর্ত্ত করে তোলার নাম যদি বিদ্রোহ হয়, তাহলে সে বিদ্রোহ দেখাতে আমি চব্বিশঘণ্টাই রাজী হ'য়ে রইলাম।...কিন্তু তুমি আর দেরী ক'রো না মানদা!—

মানদা মাথা নত করে আবার জল-ভরতি গ্লাসটা হাতে তুলে নিলে।

তখন বাহির-বাড়ীতে পুনরায় কোলাহল হচ্ছিল।

উনিশ

সকাল থেকে অরুন্ধতী ঘরের মধ্যে চুপ্‌চাপ ব'সে ছিল। দাসী স্নানাহারের তাগিদ দিয়ে দু'-দু'বার ভর্ৎসনা খেয়ে ফিরে চলে গেছে। এই সতেরো বছরের জীবনটার মধ্যে এত বড় জ্বালায় সে একদিনও জ্বলেনি। যার পৈত্রিক সম্পত্তির সমস্ত খুঁটি-নাটি দেখা-শুনা করেও তৃপ্তি হয় না, প্রতি পলে-পলে ক্রটীর আশঙ্কায় মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে আজ কিনা সেই হরলালই তাকে অপমানের তীব্র কষায় জর্জ্জরিত করলে! একবারও এতটুকু সমীহ করলে না! পিতা স্নেহের অনুশাসনে হয়তো ভুল বুঝে পুত্রকে কঠোর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে রেখে গেছেন,—কিন্তু সে কি সত্য

সত্যই? আপন আত্মজকে কেউ কি কখনো আপন প্রিয় জিনিস থেকে চিরবঞ্চিত করতে পারে?...জমিদারী—ঘরবাড়ী—আজ অরুন্ধতীর জিম্মায় যা-কিছু আছে,—অরুন্ধতী নামে-মাত্র সকল বিষয়ের অধিকারিণী হ'লেও সে-যে হরলালেরই একান্ত নিজস্ব,—তা কি কখনো সে ভুলে যেতে পারে? সে যে হরলালের দয়াতেই আজ রাণী—হরলালের কৃপার পাত্রী না হ'লে, বেঁচে আছে কেমন করে আজ?

কিন্তু সেই দেবভক্তিপরায়ণ, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ, পরলোকযাত্রীর অন্তিম অনুরোধ—'হরলাল যদি দেবতার আসল সম্মান না দেখায়, তাহলে বিষয়ের কপর্দ্দকও পাবে না'—এই কথাটা বর্শার ফলার মতই অরুন্ধতীর হৃদ্‌পিণ্ডে দণ্ডে-দণ্ডে যন্ত্রণা উপহার দেয়!...

ছদ্মবেশী ভাস্করের বেশে হরলাল—'হরধামের' দুয়ারে আত্মসমর্পণ করেছিল, কিন্তু নির্ম্মম সুপ্তি অরুন্ধতীর স্মৃতির দুয়ার ভেদ করতে দেয়নি। ...হ্যাঁ—ছদ্মবেশ ধারণের বাহাদুরী আছে! নইলে অরুন্ধতী এতদিনের মধ্যে হরলালকে চিন্‌তে পারেনা!—

বাইরে দাঁড়িয়ে ম্যানেজারবাবু সাড়া দিলেন—ভেতরে আসতে পারি, মা?

অরুন্ধতী শ্লথ বসন সংযত করে নিয়ে, চোখ মুছতে মুছতে জবাব দিলে—আসুন।

ভিতরে ঢুকে ম্যানেজার বললেন—দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা হয়েছিল মা! সময় বুঝে ছোবল্ দিতে সুরু করেছে।

বিস্মিত ও বিরক্ত হ'য়ে অরুন্ধতী বললে—আপনি কা'র কথা বলছেন?—প্রজাদের?

ম্যানেজার একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন—হ্যাঁ—সে ব্যাটাদের কথা নিয়েই তো ঘুম হচ্ছে না আমার!…তারা তো মুঠোর ভেতর, যখন খুসী টিপে মারতে পারবো। বলছিলাম ঐ বেইমান ভাস্করটার কথা।

ক্রূর দৃষ্টি মেলে অরুন্ধতী ম্যানেজারের পানে চাইতেই, ম্যানেজার ভয়ে ও বিস্ময়ে শিউরে উঠলেন, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্যই। বললেন—আপনার আদেশে পাল্কী পাঠিয়েছিলাম—

অরুন্ধতী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে—এসেচে? কোথায়? কোন্ ঘরে রয়েচে?—দোতলায়?

ম্যানেজার নিজেকে অকৃতকার্য্যতার দরুণ ভয়ানক অপ্রস্তুত ভাবলেন এবং থতমত ভাবে জবাব দিলেন—না, না, এখনো আসেনি বটে, কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন রাণীমা! তাকে আমি আনবোই।…ছোট কস্মিন্ কালেও বড়র সঙ্গে পে៉ ওঠে না। এ সনাতন নীতি।

অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে অরুন্ধতী বলে উঠলো—নীতিকথা এখন মাথায় থাক ম্যানেজারবাবু!…আসল কথার জবাব দিন, তাকে আনলেন না কেন? অত ক'রে বলে দিলাম, তবু কেন সেখানে রেখে এলেন?

ম্যানেজার বললেন—সাধ ক'রে তো রেখে আসিনি মা! আসতে সে রাজী হ'ল না। শুধু তাই নয়, যা মুখে এলো তাই বলে আমাকে গালাগাল দিলে এবং সেই সঙ্গে আপনার অপমানটাও বড় যেমন-তেমন ভাবে শেষ করলে না। দরিদ্র একটা মজুরের যে এত বড় বুকের পাটা হয়—এর আগে আমি তা ভাবতে পারিনি কখনো।

যাতনার বিষে দেহ-মন জর্জ্জরিত হ'য়ে যাচ্ছে তবু এই কথা শুনে অরুন্ধতী মনে মনে হাসলে।…হ্যাঁ, দরিদ্র একটা মজুরই বটে সে!…

আমার দোরে পেটের দায়ে খেটে খেতে এসেছিল!···অতীতের স্মৃতি-তোরণে নহবৎ বাজতে সুরু হ'ল!—সানাই বেহাগের রাগিণী ধরেচে! ···হরলাল এসেচে—অরুন্ধতীর দুয়ারে পেটের দায়ে খেটে খেতে!···

অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা করলে—কি বললে?—আসবো না?

—শুধু তাই নয়। আপনাকে বিদ্রূপ ক'রে কত অশ্রাব্য কথাও বললে।...দাস হ'য়ে মনিবের এত অখ্যাতি শোনা···আমারও যেমন-তেমন পাপ নয় মা!

গম্ভীরভাবে অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা করলে—আপনি বোধ হয় জানেন না ম্যানেজারবাবু, যে আমি কেন তাকে এত তাড়াতাড়ি এখানে নিয়ে আসতে পাল্কী পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলাম?

ম্যানেজার প্রবল বিজ্ঞের মতই হাসি হেসে বললেন—যতই 'বোকা-ভালোমানুষ' হই মা, তবু এত বড় রাজ্যপাট আমিই শাসন করে আস্‌ছি, —অপরাধীকে ধ'রে এনে কস্মিন্‌কালেও কেউ ফুল-তুলসী দিয়ে পূজো করে না মা!···প্রথমবার পারিনি কিন্তু দ্বিতীয়বারে আর ফিরে আসবো না।

রাগে অরুন্ধতীর কথা বেরুচ্ছিল না। কিছুক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করে বললে—কোথায় রয়েচে সে?

—হাড়হাবাতে রাইচরণ ঠাকুরের ওখানে।...কিন্তু আপনি ব্যস্ত হবেন না রাণীমা!···পাল্কী, বেহারা সব সেখানে মোতায়েন রেখেচি। দেহটা তার পুড়ে গেছে কিনা, তাই দুপুরবেলায় টানাটানি করলাম না। কি-জানি যদিই কিছু ঘটে যায়।

অরুন্ধতী দৃঢ়কণ্ঠে বললে—আপনি নিজে গিয়ে পাল্কী-বেহারা ফিরিয়ে আনুন।···তাকে আর আনতে হবে না।

ম্যানেজার তবু নিজেকেই অপ্রতিভ এবং অপরাধী ভেবে, যোড়হাতে বললেন—এইবারটি আমায় মাপ করুন মা!…এত বড় গর্হিত কাজ আর কখনো আমা হ'তে হবে না।

অরুন্ধতী অধিকতর বিরক্ত হ'য়ে বললে—আপনি কেন ভুল বুঝ্‌ছেন ম্যানেজারবাবু?...আপনাকে আমি একটুও দোষ দিইনি, প্রয়োজন মিটে গেছে আমার, তাকে আর আনা চ'লবে না।…কিন্তু রাইচরণ ঠাকুরের বাড়ীটা কত দূরে?…আমাদের বাড়ী থেকে অনেকখানি তফাতে—না কাছাকাছি?

—বিশেষ কাছে নয় মা!…কিন্তু তবু নবগ্রামের সীমানায় তো বটে! আমাদের শক্তির কাছে লক্ষ রাইচরণের শক্তি হার মেনে যাবে। তা ছাড়া যখন খুসী নিয়ে এলেই হ'ল।

অরুন্ধতীর অসহিষ্ণুতা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। বললে—আন্‌তে দুশোবার বারণ করলাম আপনাকে। আবার কেন ও-কথা ভাবচেন?

ম্যানেজার নতমুখে চিন্তা করতে লাগলেন। এই আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তনটুকু যে কিসের লক্ষণ, চিন্তা করেও ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না।

অরুন্ধতী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে—গাঁয়ের ভেতরটা সব ঘুরে এসেচেন তো? কতগুলো ঘর পুড়েচে?

ম্যানেজার জবাব দিলেন—সে আমি ঠিক হিসেব করে তো দেখিনি রাণীমা! তা ছাড়া রাইচরণের বাড়ী যেতে যতগুলো ঘর চোখে পড়েছে, তার মধ্যে দু'একখানা মাত্র পোড়েনি।…ব্যাটারা সব হাড়ে-হাড়ে বুঝচে—হীন তুচ্ছ প্রজা হ'য়ে রাজার অবাধ্যতা করলে কেমন সাজা ভোগ

করতে হয়।···যেগুলো পোড়েনি, সেগুলোও যদি পুড়তো, তা হ'লে আরো ভালো হ'ত। আরো বেশী ক'রে টের পেত ব্যাটারা।···একদম নিরাশ্রয় না হ'লে ওদের জ্ঞান-গম্যি হবে না।

অরুন্ধতী সহসা গম্ভীর হ'য়ে বলে উঠলো—আমি বড় ক্লান্ত, এখনকার মত আপনি অন্য কাজ দেখুন গে। যদি দরকার হয় আপনাকে ডেকে পাঠাবো।

ম্যানেজার—'যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে' করে বিদায় নিলেন।

কিন্তু ম্যানেজারের প্রস্থানের পর, একটা আকস্মিক গোলমালে অরুন্ধতীকে বাধ্য হ'য়ে কাছারী-বাড়ীর সুমুখে যে বারান্দা ছিল—সেখানে এসে দাঁড়াতে হ'ল।

বিরাট ব্যাপার!—অসংখ্য প্রজারা সমবেত হ'য়ে চীৎকার সুরু করেছে—প্রতিকার চাই আমরা, নইলে রাজবাড়ীতে না খেয়ে মরবো, —একপাও এখান থেকে নড়বো না।

অরুন্ধতী দেখলে এবং শুনলে—ম্যানেজারবাবু প্রজাদের চীৎকার করে শুনিয়ে দিচ্ছেন—নাকে খৎ দাও সব। মুচলেকা লিখে দাও, আর কখনো ছোট হ'য়ে বড়র সঙ্গে টেক্কা দিতে যাবে না। নইলে বাড়ীর দরজা বন্ধ ক'রে মারের চোটে হাড় ভেঙে দেব।

কিন্তু প্রজারা এই ভীষণ শাসনবাক্য দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনলে বটে, একজনও চ'লে যাওয়ার ভাব দেখালে না।

অরুন্ধতী বারান্দা থেকে ঘরে ফিরে এলো, এবং দাসী পাঠিয়ে ম্যানেজারকে ডেকে আনালে। জিজ্ঞাসা করলে—এদের অভিযোগ কি?

ম্যানেজার বললেন—আপনি মিছি-মিছি এই সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না রাণীমা! যা করতে হয় আমিই করছি।

অরুন্ধতী বললে—ওরা কি চায়—এ-কথাটা জানতেও কি আমার অধিকার নেই ম্যানেজারবাবু? আমি শুনতে চাই,—কেন ওরা অসময়ে দলবদ্ধ হ'য়ে ছুটে এসেচে।'

ম্যানেজার বললেন—ওরা ক্ষতিপূরণ চাইচে।

—কিসের ক্ষতিপূরণ?

—ঘরে আগুন লেগে সর্ব্বস্ব যা'পুড়ে গেছে—তারই।...যত সব অর্ব্বাচীনের দল,...আমরা কি-হিসেবে ক্ষতিপূরণ দিতে যাবো?...ব্যাটারা ঘরে-ঘরে বিবাদ বাধিয়ে ঘর জ্বালাবে,—আর তার ক্ষতিপূরণ করবে—এষ্টেট্? একি কখনো সম্ভব হয় রাণীমা? টাকা কি গাছের ফল, না পুকুরের জল, যে চাইবামাত্রই অম্লানবদনে, দিতে হবে?

অরুন্ধতী ভাবতে লাগলো।...এর মানে কি? কেন এই সত্যাগ্রহী প্রজারা সদলবলে আজ তারই দরবারে এসে দাবীর দরখাস্ত দাখিল করে বল্‌লো।

অবুঝের মত সবাই যদি নিয়ত অপকর্ম্মকেই প্রশ্রয় দেয়,—জমিদারের কত শক্তি আছে যে, তার প্রতিকার করবে? কিন্তু অরুন্ধতী মনে-মনে তৃপ্তিলাভ করতে পারলে না।...মানুষ চিরকালই প্রয়োজনকে বড় করে দেখে এসেচে,—যেখানে প্রয়োজন নাই, সেখানে দাবীর সঙ্গেও তার সদ্ভাব থাকে না।

ভাস্কর ব'লেছিল—'প্রজার রক্ত শোষণ করে রাজার খেয়াল চরিতার্থ হয়'—কিন্তু কেন?

ম্যানেজার বললেন—আপনি বিশ্রাম করুন রাণীমা! আমি সব গণ্ডগোল চুকিয়ে ফেল্‌চি।

তাড়াতাড়ি অরুন্ধতী ব'লে উঠলো—আপনি ঠিক জানেন যে,—ওরা ঘরে-ঘরে ঝগড়া বাধিয়ে আগুন জ্বালিয়েছিল?

ম্যানেজার স্মিতমুখে বললেন—ঝগড়ার পরিণামই তো আগুন জ্বালানো মা!···হ্যাঁ, আমি ঠিক জানি, তারা ঘরে-ঘরে ঝগড়া বাধিয়েছিল।

অরুন্ধতী অন্যমনস্কভাবে বললে—মরেছেও তেমনি ঘরে-ঘরে।··· মাথা গুঁজে থাকবার ঠাঁইটুকু অবধি হারিয়ে ব'সে আছে।

ম্যানেজার আস্তে-আস্তে চ'লে যাচ্ছিলেন,—অরুন্ধতী আবার তাঁকে ডাকলে—এক কাজ করুন,—আজই একবার গাঁখানা ঘুরে দেখে আসুন,—কার কি ক্ষতি হ'য়েচে।

ম্যানেজার ফিরে দাঁড়িয়ে ব'লে গেলেন—যে-আজ্ঞে রাণী মা!

অরুন্ধতী কতকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে, ঘরের মেঝেতেই শুয়ে পড়লো। দাসী এসে তার শুশ্রূষা করতে লাগলো।

···উঃ—কী দুঃসহ ব্যথা! এত বড় ভীষণ বিড়ম্বনা বুঝি আর-কারুর ভাগ্যে আসে না। এরই নাম রাণীগিরি!

সমস্ত দিনমান অরুন্ধতী মুখে জলটুকুও দিলে না। অজ্ঞাত অশান্তির ঘায়ে তার সর্ব্ব অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে যাচ্ছিল।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে ঠাকুরবাড়ীর পুরোহিত এসে জানালেন—জগন্নাথদেবের সন্ধ্যা-আরতির ব্যাঘাত হ'য়েচে মা!—প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন।

অরুন্ধতী অবাক্-বিস্ময়ে চেয়ে রইলো। তার মনে পড়লো—সন্ধ্যার

সময় আরতির বাদ্য শোনা যায় নি এবং দুপুরে দেবতার যথারীতি ভোগ-পূজো হ'য়েচে কি-না সে খবরও সে বিধিমত নিতে পারে নি।...এই দুর্নিবার পাপের স্পর্শে সে ভয়াকুল হ'য়ে উঠলো।...তবে কি গ্রামময় এ-নিদারুণ অশান্তি এরই জন্য? বিশ্বদেবতার সেবা হয় নি,—আর সে নিশ্চিন্ত মনে এতক্ষণ ব'সে আছে! পুরোহিত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে—ভোগ-পূজো নির্বিঘ্নে শেষ হ'য়েছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তবে আরতির ব্যাঘাত হ'ল কেন?

—সুধাসমুদ্রে জলাভাব। জল না হ'লে তো ঠাকুরের পূজো হ'তে পারে না মা! সেই জন্যেই আরতি বন্ধ হ'য়ে রয়েচে।

সুধাসমুদ্রে জলাভাব! কী অস্বাভাবিক সংবাদ!...

—একটুও জল নেই!—অত জল সব-ওরা তুলে নিয়েছে? একবিন্দুও নেই?

—যা আছে কর্দ্দমাক্ত। নিজের মুখে দিতে ঘৃণা বোধ হয়, তাই দিয়ে দেবতার তুষ্টি তো সম্ভব হবে না মা!...তবে অধিক রাত্রে, এই কর্দ্দমাক্ত জল পরিস্কার হ'লে কাজে লাগবে। কিন্তু তাতেও কড়া পাহারা চাই। ও-বেলায় হতভাগা মুসলমানগুলো পর্য্যন্ত জল তুলতে এসেছিল। অনেক জোর-জবরদস্তী করে তবে ফিরিয়ে দেওয়া হ'য়েচে। মার-পিট না করলে পাজীর দল কি জব্দ হয় রাণীমা?

অরুন্ধতী দাঁতে-দাঁত টিপে চুপ ক'রে রইলো। হরলালের অর্দ্ধদগ্ধ বিকৃত চোখ-মুখ এবং তার ক্ষুরধার-সদৃশ বচন অবিরতই অরুন্ধতীর কানের চার-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—প্রাণ-প্রতিষ্ঠা—চক্ষুদান!...পাষাণ খোদাই

ক'রে দেবতার মুর্ত্তি নির্ম্মাণ, এবং সেই পাষাণদেহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা !...কী মর্ম্মান্তিক প্রতিষ্ঠার আয়োজন !

অরুন্ধতী, পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলে—ভোগ-পূজোর সময় জলের অভাব হ'ল না, কারুকে জল তুলতেও দেওয়া হ'ল না,—তবু জল কর্দ্দমাক্ত !···ভোগ-পূজোয় কত জল খরচ হ'য়েছিল ঠাকুর ?

পুরোহিত হেসে বললেন—মায়ের আমার মাথার ঠিক নেই।...কাল রাতের বেলায় হিন্দু-মুসলমান যে পেয়েছে, সেই-ই তো জল তুলে নিয়েছে মা,··· সুধাসমুদ্র কি পবিত্র ছিল ?...পূজোর আগে, ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুর এসে ব্রাহ্মণ দিয়ে একশো আট কল্‌সী জল ফেলে দেওয়ালেন,—তারপর হোম করে সুধাসমুদ্র পবিত্র হ'লে,—তবে তো পূজো সাঙ্গ করা গেছে ; আজ ভোগ হ'ল যখন, তখন দেউড়ির ঘড়িতে দুটো বাজলো।

অরুন্ধতী বিমর্ষ হ'য়ে বল্‌লে—আরতি যাতে নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হয়, ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুরকে তার উপায় করতে বলুন।

পুরোহিত বললেন—তিনি স্বয়ং মন্দিরে হাজির আছেন।

—কি বলছেন ? কোনো উপায় নেই ?

—উপায় না থাক্‌লে কি দুনিয়া চলে মা ? তিনি বলেন— জল না হ'লে দুধের দ্বারাও কাজ হ'তে পারবে। অন্ততঃ আধমণ দুধ হ'লে—

—আধমণ দুধ হ'লে চলে ?

—হ্যাঁ মা !—ন্যায়ালঙ্কার মশায় বলেছেন চ'লবে।

—ম্যানেজারবাবুকে বলুন,—তিনি যোগাড় ক'রে দেবেন।

—ম্যানেজারবাবু বললেন—রাণীমার কাছে দরবার করো, তিনি হুকুম দিলে ব্যবস্থা করতে পারি।

—এ কথার মানে ?

—তা তো জানি না মা !

অরুন্ধতী বুঝতে পারলে—ম্যানেজারবাবুর অভিমান কিম্বা রাগ হ'য়েচে। যেহেতু অরুন্ধতীর ইচ্ছায় এবং কতকটা আদেশের জন্যই তিনি প্রজাবর্গকে পায়ে টিপে মারতে পাননি,—উল্টে তাদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করতে আদিষ্ট হ'য়েচেন। কিন্তু দীনের প্রতি এই অযথা আক্রোশ তাঁর কেন ?

অরুন্ধতী কাগজ-কলম নিয়ে ম্যানেজারবাবুকে লিখলে—"যত শীঘ্র সম্ভব হয় আধমণ গো-দুগ্ধ যোগাড় করুন,—নতুবা শ্রীজগন্নাথদেবের সন্ধ্যা-আরতি হবে না।…

কুড়ি

সন্ধ্যাবেলা থেকে হরলালের প্রবল জ্বর এসেচে।

রাইচরণ বাড়ীতে নেই—হরলালের অনুরোধে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে খড়-বাঁশ ইত্যাদির যোগাড় করতে গেছে, তখনও ফিরতে পারে নি। অন্যান্য গ্রামবাসীরা রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত হরলালের শয্যাপার্শ্বে ব'সে ছিল এবং হরলালেরই আন্তরিক অনুরোধে ও স্নেহের ভৎর্সনায় একে-একে যে-যার বাড়ী ফিরে গেছে। রতন কবিরাজ এরই মধ্যে তিনবার এসে রোগী দেখে গেছেন এবং যথারীতি ওষুধ-পত্রেরও ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন।…

হরলালের দেহের যাতনা ভীষণ হ'তে ভীষণতর হ'লেও সে অত্যধিক

সহিষ্ণুতায় একটুও যাতনার বাণী মুখ থেকে বার করেনি,—পাছে মানদা ভীত বা চিন্তিত হ'য়ে ওঠে।

নিশীথ রাত্রি....

সহসা অরুন্ধতীর মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের বাদ্যধ্বনি সুরু হ'ল।

হরলালের জ্বর কমে আসছিল এবং ক্রমেই সে সুস্থ বোধ করছিল। এই আকস্মিক বাদ্যধ্বনি শুনে পার্শ্বোপবিষ্টা মানদার পানে জিজ্ঞাসু হ'য়ে চাইলে।

মানদা বললে—জগন্নাথের আরতি হচ্ছে।

বিস্মিত হ'য়ে হরলাল বললে—এ-আবার রাণীজির মাথায় কি খেয়াল চাপলো?...এখন আরতি!...কিন্তু রাত এখন কত?

মানদা বললে—ঘড়ি তো নেই, তবে একটু আগে চৌকিদার রোঁদ্ দিয়ে গেছে।...আজ সন্ধ্যেবেলায় আরতি হয়নি...

—কেন?

—শুনলাম সুধাসমুদ্রের জল মুসলমানে ছুঁয়ে ফেলেচে ব'লে, আবার তা হোম-যজ্ঞি করে শুদ্ধ করা হ'ল। আধমণ খাঁটি দুধ দিয়ে—

হরলাল আর্ত্তকণ্ঠে ব'লে উঠলো—চুপ করো মানু। ও-কথা শুনে-শুনে কান দু'টো আমার ঝালাপালা হ'য়ে গেছে!...ছিঃ—যত সব স্বার্থপরের দল!...কিন্তু তোমার কাকা কোথায়, মানু?...

—কাকা বোধ হয় আজ-আর ফিরতে পারলেন না।

—কাকীমা ?—তিনি কোথায় ?

—এতক্ষণ জেগে ছিল, এইমাত্র বাইরে গা-গড়াচ্ছে।

হরলাল মুগ্ধ হ'য়ে মানদার পানে চেয়ে রইলো।

মানদা চোখ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—এখন কেমন আছেন? আগের চেয়ে ভালো বোধ হচ্ছে ?

হরলাল কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে বললে—হ্যাঁ মানদা!—আগের চেয়ে ঢের ভালো আছি। কিন্তু তোমার এ-কর্ম্মভোগ কেন বল তো ?···ছেলেমানুষ তুমি—কেন মিছিমিছি সারারাত জেগে রয়েচ ?··· আমি বেশ ভালো আছি মানু !—তুমি ঘুমোও।

মানদা আস্তে-আস্তে বললে—আমার একটুও কষ্ট হয় নি,—আপনি বেশী কথা বলবেন না।...কব্‌রেজ মশায় নিষেধ ক'রে গেছেন।

হরলাল মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলো।

মানদা বললে—হাসি নয়,—আর কথা বলতে পাবেন না কিন্তু।···

হরলাল হেসে হেসে বললে—কথা আমি একটাও বলবো না মানু! কিন্তু তার সর্ত্ত আছে।

—'সর্ত্ত আবার কি ?' ব'লে মানদা হরলালের মুখপানে চাইলে।

হরলাল বললে—তোমাকে এখন থেকে রীতিমত ঘুমুতে হবে। নইলে আমি সারারাত এমন চীৎকার করবো···

মানদা মুখ ভার ক'রে উঠে দাঁড়ালো। বাইরে যেতে যেতে বললে —কব্‌রেজ মশায়ের আদেশ, আর আপনার আদেশ—এ দু'টোর কোন্‌টা মেনে চলা আমার পক্ষে বেশী দরকার তা আমি নিশ্চয়ই জানি। কিন্তু

আপনার এ-আদেশ দেওয়া অন্যায় হ'ল। আপনি নিজের অবস্থা বুঝতে পারছেন না তাই সকলকে এম্‌নিধারা ক'রে কাছ থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন। ...গাঁ-শুদ্ধ লোক আপনার কাছে ব'সে থাকতে চায়, আর আপনি চান তাদের দূর-দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতে।

মানদার কণ্ঠস্বর ভারি হ'য়ে উঠলো।

হরলাল পূর্ব্বের মতই মৃদু-মৃদু হাসছিল। তার মনে হচ্ছিল—সংসারে কেউ বেঁচে নেই ব'লে আজ-আর আক্ষেপ করবার মত তার কোনোকারণই বর্ত্তমান নাই। মানুষ আর কি চায়—কত চায়—?

মানদা ধীরে-ধীরে ঘর ছেড়ে চ'লে গেল এবং রাইচরণের স্ত্রী যেখানে শুয়ে ছিল, সেখানে গিয়ে চুপ-চাপ ব'সে পড়লো।

হরলাল কান খাড়া ক'রে শুনলে—তখনো অরুন্ধতীর সাধের জগন্নাথ-দেবের আরতি সমাপ্ত হয় নি, সমানতালে ঘণ্টা-কাঁসর-শঙ্খ-মৃদঙ্গ বেজে চ'লেছে—ক্লান্ত অভিশপ্ত গ্রামবাসীর কষ্টলব্ধ সুপ্তির বুকে বজ্রাঘাতের যাতনা জাগিয়ে।

হরলাল অনুচ্চকণ্ঠে বার-কতক 'আঃ উঃ' ক'রেও যখন মানদার পক্ষ থেকে কোনো সাড়া-শব্দ পেলে না, তখন ডাকলে—মানু!

সঙ্গে-সঙ্গে বাহির থেকে মানদা সাড়া দিলে—আজ্ঞে।

হরলাল আর কোনো কথা কইলে না।

মানদা আরো কিছুক্ষণ বাইরে থেকে, ঘরে এলো এবং হরলালের কাছে দাঁড়ালো, কিন্তু বসলো না। বললে—কি বলছেন?

হরলাল ঘরের চারদিকে একবার তাকালে, তারপর বললে—বড্ড খিদে পেয়েছে মানু! একটুখানি দুধ···

মানদা ধপ্ ক'রে বিছানার পাশে ব'সে পড়লো। বললে—একটুখানি সাগু কি বার্লি খাবেন? তৈরী ক'রে দেবো? পাতিলেবুর রস দিয়ে মিছরি-গুঁড়ো দিয়ে বেশ লাগবে এখন। দেবো?

হরলাল মুখখানা বিকৃত ক'রে বললে—নাঃ···কিন্তু কব্‌রেজ মশায় কি দুধ খেতে নিষেধ করেছেন?

মানদা মুখ নামিয়ে ব'ললে—না, তিনি বরং দুধই খেতে ব'লে-ছিলেন। কিন্তু দুধ তো নেই ঘরে। দেড়সের দুধের এক কাঁচ্চাও আজ পেলাম না।

হরলাল চুপ ক'রে রইলো।

মানদা বললে—কি খাবেন বলুন? সাগু না বার্লি?

হরলাল বললে—রাইচরণ আসতে পারলে না বলেই বুঝি দুধ দোয়ানোর ব্যবস্থা হয় নি?...সব দুধ বাছুরে খেয়ে নিয়েছে?

মানদা উত্তেজিতকণ্ঠে বললে—ও-বেলার দুধ এ-বেলায় থাকে না আমাদের। এ-বেলায় যা-দুধ পেয়েছিলাম,—জমিদার-বাড়ীর লোক এসে জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে গেছে। এত মিনতি করলাম, বাড়ীতে রোগী আছে জানালাম, কিন্তু কথা তো শুনলেই না, উল্টে মেয়েমানুষ পেয়ে যা মুখে এলো তাই ব'লে গালিগালাজ ক'রে গেল।···বলে—ম্যানেজারবাবুর হুকুম, না দিলে ভালো হবে না। দেবতার কাজে লাগবে, রোগীর চেয়ে দেবতার ভোগ আগে দরকার। সেই যে সুধামমুদ্রের কথা বললাম না?

হরলাল একটাও কথা বললে না। চোখ বুজে ভাবতে লাগলো—হা-রে অবুঝ মানুষ!···দেব-রোষের দোহাই দিয়ে, নিজেরাই দেবতাকে

রুষ্ট ক'রে তুল্‌ছিস্ তোরা! তোদের কি এটুকুও বোঝবার শক্তি নেই যে, দেবতা আপন পেট ভরাবার জন্যই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় অনু-পরমানু তৈরী করেন নি। যিনি বাঁচবার উপকরণ যোগাচ্ছেন, তাঁরই হাতের শক্তি কেড়ে নিয়ে বিধাতার বিধান উল্টে দিতে চাস্ তোরা?

জমিদার-বাড়ীর পেটা-ঘড়িতে দু'টো বাজলো।

মানদা আঁচল দিয়ে হরলালের কপালটা ধীরে-ধীরে মুছিয়ে দিলে। তারপর কপালের উপর হাত রেখে বললে—জ্বরটা বোধ হয় ছেড়েচে।···কিন্তু সাগু-বার্লি ছাড়া ঘরে আর কিচ্ছু নেই!—কি হবে তাহলে?

হরলাল বললে—কিচ্ছু হবে না মানু। দু-এক ঘণ্টা না খেলে কি মানুষ বাঁচে না? জান তো আমাদের এই দেশেই কত লোক মাস-মাস ধ'রে না খেয়ে ছিল। রাজা যদি প্রজার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে পারে,—প্রজা না হয় রাজার পাপের প্রায়শ্চিত্তটা না খেয়েই সমাধা করবে। নারী হ'য়ে আতুরের অন্ন যদি হরণ করতে পারে—তোমাদের রাণী, আমি রাণীর প্রাণ বাঁচাতে অম্লানবদনে আজ উপবাসী থাকতে পারবো। অবলা সে, তাকে সকল দিক থেকেই আমাদের বাঁচানো কর্ত্তব্য।

মানদা হরলালের সকল কথা বুঝতে পারলে না। তার সব চেয়ে এই কষ্টটাই বুকে বাজছিল—ক্ষুধার্ত্ত হরলাল সময়ে একফোঁটা দুধও খেতে পেলে না, এবং এত সেবা-শুশ্রূষা করেও অন্যের দোষে আপন ত্রুটী-টুকু একান্ত অসহায়ভাবেই সে হরলালের কাছে প্রকাশ করতে বাধ্য হ'ল। ছি-ছি···কেন সে বুকের মাঝে মহামূল্য রত্নধনের মতই, অথবা আপন প্রাণটুকুর মতই এক ছটাক দুধ আটকে রাখলে না!

মানদা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা ক'রে বললে—আপনি খানিকক্ষণ একলা থাকতে পারবেন ?

হরলাল বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেন বল তো ?

—বলুন—পারবেন ?

—যদি পারি তা হ'লে কি করবে ?

—কাকীকে সঙ্গে ক'রে রঘুদার বাড়ী থেকে দুধ চেয়ে আনবো।... তাদের বাড়ীতে তিন-চারটে কচি ছেলেমেয়ে রয়েচে। দুধ জাগানোই থাকে।

হরলাল দৃঢ়কণ্ঠে বললে—কচি-মুখের আহার কেড়ে নিয়েও আজ আমাকে পেট ভরাতে হবে মানদা ?···ছি-ছি ভাস্করকে তোমারা এতই হীন ভাবো ?···না, কোথাও গিয়ে কাজ নেই।

মানদা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। সারা অন্তরটা তার ডুক্‌রে কেঁদে উঠছিল।···রাণী অরুন্ধতীর এ-কী মর্ম্মান্তিক দেব-পূজার আয়োজন !

কিন্তু তবুও সে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারলে না। বললে—আপনি তো খালি আমাদেরই একার নয়—নবগ্রামের ছেলে-বুড়ো সকলকারই আপনার ওপর সমান দাবী আছে। রঘুদার বাড়ী থেকে দুধ আন্‌লে আমাদেরও লজ্জা নেই, আর আপনারও তাতে ছোট হবার আশঙ্কা নেই।

হরলাল অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হ'য়েছিল—দেহটা তার বিছানায় নেতিয়ে পড়েছিল। তবু সে বললে—আমি তো কোনো দিনই বড় হ'তে চাই নি মানদা,—তবু কেন যে তোমরা বড়-ছোটর দোহাই দাও। আমি বলছি—কচি-ছেলের মুখের দুধ আমি মরে গেলেও মুখে তুলতে পারবো না। রাণী-ঠাকুরুণের জগন্নাথদেবের ভোগ আমি চুরি ক'রে খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারি

মানদা, কিন্তু খোকা-খুকুদের মুখের আহার—না, না, সে হবে না মানু। সে আমি পারবো না খেতে।

মানদা তবু কথা শুনলে না। কাকীমাকে সঙ্গে ক'রে বেরিয়ে গেল। এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে, অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে হরলালের পা-তলার দিকে ব'সে পড়লো। এই ক্ষুৎ-পিপাসাকাতর রোগীটির মুখের ম্লান ভাব সে কোনো প্রকারেই চোখে দেখার সাহস রাখতে পারলে না।

হরলাল হেসে উঠলো। সে-হাসি যেন হৃদ্-স্পন্দনের তালে তাল মিশিয়ে বুকখানা গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল।

হরলাল হেসে হেসেই বললে—কচি ছেলে-মেয়ে ক'টি আছে তোমার রঘুদা'র বাড়ীতে?

—তিন-চারটি।

—তারা আছে তো! না, খিদের জ্বালায় জগন্নাথের মন্দিরে সিঁদ্ কাট্‌তে গেছে?

মানদা গম্ভীর হ'য়ে বললে—সিদ্ কাটা তো কচি-ছেলের কাজ নয়, গাঁয়ের লোক যে পঙ্গু,—তাদের হাত থাকতে পঙ্গু, পা থাকতে খোঁড়া। মনটুকু পর্য্যন্ত থেকে না থাকা। নইলে কচি-মুখের হাসি কেড়ে নেয় যে রাণী, তার খেয়ালের মাথায় ঝাঁটা মারতে কেন পারে না তারা?… শুনলাম গাঁয়ের সব-বাড়ীতেই আজ এম্‌নি দশা। কারুর ঘরে এক কৌটা দুধ নেই। লোকের ছেলে-মেয়ে না খেয়ে কেঁদে মর্‌ছে, আর তাদের খাবার দিয়েই রাণীর পুণ্যের ছালা বোঝাই হচ্ছে। আমি যদি পুরুষ হ'তাম—

—তা হ'লে কি করতে, মানদা?

—ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুরের ভুঁড়িটাকে দু'ভাগ ক'রে চিরে দেখতাম।… আমি দিব্যি ক'রে বলতে পারি,—আধমণ দুধে তারই ক্ষীর-ছানা-মাখন তৈরী হয়েচে,—আর খেয়ে, পেট মোটা ক'রে, সে আরামে ঘুমুচ্ছে। অথচ যারা যুগিয়ে দিলে, তাদের মুখে জলটুকুও পড়লো না!…জগন্নাথ কি আর সাধ ক'রে পাষাণ হ'য়ে রয়েচেন! পাষাণ হ'য়েচেন ব'লেই আজ তাঁর বাঁচোয়া।

সহসা কাকীমাকে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকতে দেখে মানদা বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি হ'য়েচে?

রাইচরণের স্ত্রী নীচু গলায় জানালে—আলো নিয়ে কা'রা সব বাড়ী ঢুক্‌চে।

মানদা ব্যস্ত হ'য়ে এবং কতকটা ভীত হ'য়েও উঠে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে আর যেতে হ'ল না। দু'পাশে দু'জন পরিচারিকা সঙ্গে যে ঘরে ঢুকলো—সে রাণী অরুন্ধতী।

হরলাল চোখ বুজলো।

মানদা ক্রুদ্ধ-জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অরুন্ধতীর পানে চেয়ে রইলো।

অরুন্ধতী অপলকনেত্রে শায়িত হরলালের পানে চাইতে লাগলো। তারপর দাসীদের বললে—তোরা বাড়ী যা। সকালে আবার আসিস্।

দাসীরা মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলো।

অরুন্ধতী ঈষৎ বিরক্ত হ'য়ে বললে—আবার দাঁড়িয়ে রইলি কেন? …আমি এখন যাবো না, তোরা চলে যা।

অগত্যা বিনা প্রশ্নেই দাসীরা বেরিয়ে গেল। বাইরে আরো লোক-জন ছিল, তারাও আর রইলো না।

হরলাল তখনো চোখ বুজে।

অরুন্ধতী মৃদুকণ্ঠে ডাক্‌লে—ভাস্কর!

হরলাল হাত নেড়ে নিষেধ করলে।

অরুন্ধতী দু'পা পিছিয়ে দাঁড়ালো।

মানদা এতক্ষণে আপন নিদারুণ ভুলটুকু বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি একখানা আসন পেতে দিয়ে বললে—আমাদের যথাসর্ব্বস্ব পুড়ে গেছে, আপনার যোগ্য আসন তো ছিলই না, তবু যা ছিল তা আজ আর নেই। ...কাকী! বাটিতে একটুখানি জল ঢেলে, গামছাখানা ভিজিয়ে দাও তো। রাণীমা পা মুছবেন।...তারপর অরুন্ধতীর পানে ফিরে চেয়ে বললে—খেতেই কুলিয়ে উঠবে না, পা ধোয়ার জল দিই কেমন করে? ঘরে কাহিল রোগী রয়েচে, কখন কি হয় বলা যায় না তো!

অরুন্ধতী মানদার পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি রাইচরণের কে?

মানদা বিনীতভাবেই জবাব দিলে—তিনি আমার কাকা। আমার মা-বাপ বেঁচে নেই।

অরুন্ধতী কি-একটা বলতে যাচ্ছিল, এমনি সময় হরলাল চোখ মেলে অরুন্ধতীর দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চেয়ে বললে—তা হ'লে বার্লি না হয় সাগু যা পারো একটুখানি দাও মানদা! আমি আর থাক্‌তে পারছি নি।

মানদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অরুন্ধতী ধপ্ করে হরলালের বিছানার একপাশে ব'সে পড়লো।

হরলাল ক্ষীণ অথচ গম্ভীর কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লো—এখানে কেন বস্‌লে ...ণী?...এ তো তোমার যোগ্য আসন নয়।

অরুন্ধতী মুখ ফিরিয়ে বললে—তা আমি জানি হরলালবাবু!—কিন্তু ভাস্কর সেরে না উঠ্‌লে, পাথরের রাণীর জন্যে পাথরের নরককুণ্ড তৈরী করবে কে ?

উত্তেজিত হ'য়ে হরলাল বললে—রাণী! অরুন্ধতী! তোমাকে তো কতদিনই ব'লেছি—ভাস্কর পাষাণ খোদাই ক'রে দেবতা তৈরী করে, নরককুণ্ড তৈরী করবার ভার সে নেবে না।...এ-তো চাকরী নয় রাণী—এ আমার ব্যবসা। যা খুসী তাই করবো। মজুরী নিয়ে খেটে খাই বটে, কিন্তু কুকাজ-সুকাজ বাছাই করার অধিকার আমার সম্পূর্ণ আছে। ...তা ছাড়া নরককুণ্ড কি আর অন্যকে তৈরী করতে হয় অরুন্ধতী! মানুষ নিজের নরক নিজেই তৈরী করে।

অরুন্ধতী সুমুখের তাল-পাখাখানা তুলে নিয়ে হরলালকে বাতাস করতে লাগলো,—তার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না।

হরলাল বললে—হাতে ব্যথা ধরবে রাণী,—ও-তো তোমার অভ্যাস নেই। তা ছাড়া রাণীর কি এ-সব সাজে কখনো ?

অরুন্ধতী হাতের পাখা নামিয়ে রাখলে না, বাতাস করতে-করতেই বললে—ভৎর্সনার সময় ঢের আছে হরলালবাবু, আগে আপনি সেরে উঠুন।...আপনাকে আমি নিতে এসেছি। বাইরে পাল্কী অপেক্ষা করছে—বোধ হয় স্মরণ আছে একবার পাল্কী বেহারা ফিরিয়ে দিয়েছেন।

হরলাল ব'ললে—হ্যাঁ, তোমার ম্যানেজার বাহাদুর তখন এসেছিলেন বটে।...কিন্তু মহারাণী!—তোমাকে আজ একটা কথা বলে রাখছি,—জেনো—আমি রাজবাড়ীর পোষা-কুকুর নই। আমার আপন সত্তা আছে আমার স্বাধীনতা হরণ করতে পারে এমন একজনকেও আমি চিনি না।

অরুন্ধতী বললে—তবে আমার স্বাধীনতা আপনি কোন্ হিসেবে হরণ করলেন ?

হরলাল বললে—খিদের জ্বালায় পেটের নাড়ী হজম হ'য়ে যাচ্ছে। পাড়া বেড়িয়েও মানদা এক ফোঁটা দুধ যোগাড় করতে পারে নি।···যা কখনো মুখে তুলতে পারি নি, পেটের জ্বালায় তাই-ই আমাকে খেতে হবে। সেটুকু খেয়ে, শক্তি সঞ্চয় ক'রে তোমার কথার জবাব দেব রাণী। যদি ধৈর্য্য থাকে, অপেক্ষা করো। তবে সব আগেই তোমায় জানিয়ে রাখি, আমার যারা মুখাপেক্ষী, আশ্রয় দেওয়ার শক্তি না থাকলেও যারা আমায় আশ্রয়দাতার আসন দিয়েছে, আমার সেই আশ্রিতদেরই আশ্রয়ে আমি স্নেহাবদ্ধ। তাদের ছেড়ে অন্যত্র যাবার শক্তি নেই আমার। আজ যদি তোমার জগন্নাথদেব আহ্বান করেন, আমি সে-আহ্বানও উপেক্ষা করবো।···এদের ছেড়ে, অন্যের দ্বারস্থ হ'লে, সে অপমান আমা অপেক্ষা এদের বুকেই বেশী ক'রে বাজ্‌বে।···আমি তো তা সইতে পারবো না রাণী।

অরুন্ধতী বললে—এরা আমার প্রজা, আমার আশ্রিত, আমার আদেশ পেলে এক্ষুণি আপনাকে ছেড়ে দিতে রাজী হবে।

হরলাল প্রবল অতৃপ্তির সঙ্গে চোখ বুজে খানিকক্ষণ নীরবে প'ড়ে থাক্‌লো। তারপর বললে—চিন্তা করার শক্তি যার নেই, তার জটীল বিষয়ে মাথা ঘামাতে যাওয়া নিছক পাগ্‌লামি।...জোর-জবরদস্তীতে কাজ পাওয়া যায় অরুন্ধতী, কিন্তু হৃদয় পাওয়া যায় না। মিষ্টি কথায় হাজার-হাজার লোক বশে আসে, চোখ-রাঙাণীতে একজনও মনের সঙ্গে এগিয়ে আসে না। তোমার জন্যে আজ দুঃখ হ'য় রাণী, শাসন করবার

সকল অস্ত্র তোমার ভাণ্ডারে জমা রইলো,—অথচ তুমিই হ'লে সকল রকমে পরাস্ত। সর্ব্বশক্তিমান হ'য়ে, ভগবান যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তাহ'লে তাঁরই সৃষ্ট সন্তানগণ তাঁরই বিপক্ষে যুদ্ধ-ঘোষণা করে। সর্ব্বশক্তিমান ব'লেই তো তিনি তা করতে পারেন না অরুন্ধতী! নইলে তাঁর ঈশ্বরত্ব মান্‌বে কেন লোকে? তুমি রাণী, অথচ তোমারই প্রজারা আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমায় ভর্ৎসনা করে—এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হ'তে পারে?

অরুন্ধতী কেঁদে উঠলো।

সহসা সে হরলালের দু'খানা হাত চেপে ধরতেই, হরলাল 'উঃ'...ব'লে হাত সরিয়ে নিয়ে, ঈষৎ হাসির সঙ্গে ব'ললে—হাত দু'খানা আগুনে পুড়ে গেছে অরুন্ধতী!...ব্যথা রয়েচে,...কিন্তু কি বলবে বলো না?... ভর্ৎসনা—তিরস্কার যতই করি তোমাকে, তবু তো আমার কাছে তোমার দাবীর অন্ত নেই অরুন্ধতী।...আমি তা অস্বীকারও করি নি কোনো দিন।...কিন্তু কী বলছিলে?

অরুন্ধতী দু'হাত যোড় ক'রে বললে—আমাকে মার্জ্জনা করুন। আমি কাঙালিনী—অতি হতভাগিনী।

হরলাল মৃদু হেসে বললে—ওটা কথার কথা। দুনিয়ায় কে যে কাঙাল বা হতভাগা আর কে যে নয়, এ আমি কোনোদিনই বুঝে উঠতে পারলাম না। সাধারণ মানুষের চোখে তুমি সৌভাগ্যবতী...তুমি রাজ-রাজেশ্বরী—রাণী। সুতরাং সাধারণের কাছে নিজের মান নিজেই খুইয়ে ফেলো না। তাতে পদের অসম্মান হবে!

অরুন্ধতী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বললে—আপনার জিভটা এত ধারালো! বুকখানা আমার টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে দিচ্ছে!

হরলাল বললে—কিন্তু... কী চাইলে তুমি—মার্জ্জনা ?···মার্জ্জনা তোমায় দিতে পারি, যদি বাঁচি তবে। নইলে পারবো না রাণী! এ-যাত্রা আমার মৃত্যু যদি হয়,—তবে তোমায় অপরাধী রেখেই আমি মরতে চাইবো।···কিন্তু আনন্দের কথা এই যে—আপন অপরাধ আপন অন্তরে তুমি বুঝতে পারলে আজ।

ইতিমধ্যে মানদা গরম সাগুর বাটীটা হাতে ক'রে ঘরে ঢুক্‌লো এবং তার পেছনে পেছনে রাইচরণের স্ত্রী এলো—জলের গ্লাস আর দু'টুক্‌রো পাতিলেবু নিয়ে।

অরুন্ধতী বললে—তোমাদের ঘরে গরু আছে তো? দুধ হয় না?

সগর্ব্বে মানদা বললে—আপনার আশীর্ব্বাদে ফি'-দিন ঘরে আমাদের দু'বেলায় চার-পাঁচ সের দুধ হয় রাণী-মা! কিন্তু রোগীটির কপালগুণে আজ এক ফোঁটাও নেই।

—কেন?

হরলাল সাগুর বাটীটার কাছে হাতখানা রেখে হেসে উঠলো। তারপর বললে—আজ সব দুধ জগন্নাথ কেড়ে খেয়ে গেছেন। বৃন্দাবনের ব্যাপার কি তোমার মনে নেই রাণী?···ঠাকুর-দেবতার 'ওপর এত ভক্তি, তবু এ-কথাটা তোমার স্মরণ নেই? কিন্তু বৃন্দাবনের ঠাকুর নিজের হাতে চুরি করতেন—নিজেই খাবার জন্যে। আর নবগ্রামের ঠাকুর ম্যানেজার পাঠিয়ে লুঠ্ করেন—ন্যায়ালঙ্কারের ভুঁড়ি তৈরীর জন্যে। ···এটা সভ্যযুগ কিনা।

এতক্ষণে অরুন্ধতী সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলে।

হরলাল বললে—আর পারি না মানদা !—দাও ওষুধটা গিলে ফেলি।

মানদা বিস্মিত হয়ে চাইতে লাগলো।

হরলাল বললে—সাগু-বার্লি চিরকালই ওষুধ। ওটাকে খাবার জিনিস বলে আমি এর পূর্ব্বে একদিনও ভাবিনি।…উঃ—অদৃষ্ট এরই নাম।…বুঝলে অরুন্ধতী !—আমি তো মরণাপন্ন, যদি মরি,—চিকিৎসার আয়োজন পণ্ড হবে। কিন্তু তোমার জগন্নাথের কৃপায় আজ এই নবগ্রামের ভেতর কত কচি-প্রাণ যে খিদের জ্বালায় মায়ের বুকের রক্ত চুষে খাচ্ছে,—তা তুমি ধারণা করতে পারবে না।…কেমন ক'রেই বা পারবে—তোমার তো ছেলে হয়নি। মায়ের ব্যথা বুঝবার শক্তি কোথা তোমার ? তাছাড়া সব চেয়ে বড় কথা—তুমি রাণী। ছোটঘরের ছোট কথা শুনলে তোমার অপমান হবে,—হয়তো বা অধর্ম্ম হবে।

ভোরের পাখী ডাকছিল।

জগন্নাথের মন্দিরে মঙ্গল-আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজলো।

হরলাল সাগুর বাটীটা মানদার হাতে এগিয়ে দিয়ে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললে,—সুপ্রভাত ! সুপ্রভাত !!

মানদা পিতলের একটা কল্‌সী নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল—হরলাল জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় চললে ?

—'জল নিয়ে আসি,—সকাল হ'লে অনেক লোক জুটবে।' বলেই মানদা কল্‌সী নিয়ে চ'লে গেল।

মিনতির সুরে বললে—এইবার চলুন ! আপনার

পায়ে পড়ছি,—আর আমাকে কষ্ট দেবেন না। এতে কি আপনি সুখ পাচ্ছেন ?

হরলাল বললে—বৃথাই তোমার কষ্টভোগ রাণী!...আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গে তোমার সুখ-দুঃখকে জড়িয়ে নেওয়া আমাদের দু'জনকার মধ্যে কারুরই উচিত নয়। তুমি ফিরে যাও রাণী!...আমি যেতে পারবো না।

দৃঢ়কণ্ঠে অরুন্ধতী বললে—তবে আমিও যাবো না।

হরলাল স্মিতমুখে বললে—সত্যাগ্রহ করবে নাকি? কিন্তু এই পোড়া ঘর-বাড়ী, চারধারের বিকট দুর্গন্ধ, অনাহার অনিদ্রার জ্বালা,—এ-সব সহ্য ক'রেও সত্যাগ্রহ চালানো কি মহারাণী অরুন্ধতীদেবীর পক্ষে সম্ভব হবে ?

অরুন্ধতী বললে—কব্‌রেজের বড়িতে আপনার রোগ যে আরাম হবে না—এতক্ষণে আমি তা বুঝতে পারলাম। রোগের আসল ওষুধ আমি বাড়ী গিয়ে পাঠিয়ে দেব। যতদূর বিশ্বাস—তাতে আপনি নিরাময় হ'য়ে উঠবেন। কিন্তু আপনার কাছে মিনতি জানিয়ে যাচ্ছি—সেরে উঠে হতভাগিনীর নামটা যেন ভুলে যাবেন না।...তাহ'লে উঠলাম, আপনার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাতের আর অভিরুচি নেই।

হরলাল ব্যথিত হ'য়ে বললে—সে আমার নিতান্তই দুর্ভাগ্য মহারাণী।...কিন্তু ওষুধটা কি শুন্‌তে পাই না ?

স্থির-দৃষ্টিতে চেয়ে অরুন্ধতী বললে—মহারাণীর বক্ষ-রক্ত—বুকে তার যত রক্ত আছে সবই।

তারপর কিছুক্ষণ পরে আবার বললে—আপনার এবং আমারও

পিতার আদেশ—পৃথিবীতে সবার ওপরে ভগবান! তাঁর সমারোহ-পূজা-পার্ব্বণের চেয়ে বৃহত্তর পুণ্যের কাজ আর কিছু নেই—থাকা উচিতও নয়। আমিও তা বিশ্বাস করি, কেননা তিনি মৃত্যুকালে আমাকে এই উপদেশটাই বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। নইলে হরলাল আজ ভাস্কর হ'য়ে মজুরী খাট্‌বার জন্যে হরধামের ফটকে এসে পাথর খোদাই করতো না। আজ আমি আমার জগন্নাথের শপথ ক'রে বলছি—বুকে যত রক্ত আমার আছে—

—'অরুন্ধতী! অরুন্ধতী!—চুপ করো!'

অরুন্ধতী দারুণ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হ'য়ে গেল। এ-কী অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর!

হরলাল বললে—তোমার বক্ষ-রক্তের কতটুকু শক্তি আছে অরুন্ধতী? সাগর-প্রমাণ তৃষা কি তাতে মিট্‌বে?···নবগ্রামের ঘরে-ঘরে আজ জল-জল-হাহাকার! রক্তে কি তার শান্তি আছে? জল চাইলে রক্ত দাও যদি,—পিপাসার্ত্ত কি তা নিয়ে আশীর্ব্বাদ দেবে ভেবেচ? জল নিয়ে এসো অরুন্ধতী! শান্ত বক্ষের প্রস্রবণ থেকে স্নিগ্ধ জল-ধারা এনে তোমার তৃষাতুর প্রজাদের রক্ষা করো। স্বষ্টিকর্ত্তার হাতের তৈরী এতগুলো মানুষ ক্ষুৎ-পিপাসায় ছাতি ফেটে মরবে, আর মন্দিরের স্বর্ণবেদীতে ব'সে স্বয়ং স্বষ্টিকর্ত্তা কি তাই দেখে তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়বেন ভেবেচ? তা হ'তে পারে না রাণী! সন্তানের মৃত্যু-যন্ত্রণা-কাতর মুখ দেখলে পিতার প্রাণেও মৃত্যুযন্ত্রণা জাগে!···বক্ষ-রক্ত দেওয়া কি এতই পৌরুষের কাজ মনে করো?

অরুন্ধতী আরক্তমুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

হরলাল বললে,—কর্ত্তব্য তোমায় হাতছানি দিয়ে ডাকাডাকি করছে।

ম্যানেজার যদি পেছনে ডাকে, তা গ্রাহ্য ক'রো না। তোমার কর্ম্মফলের ফলভোগ তো সে করবে না রাণী! তোমাকেই করতে হবে। সে তোমার মাইনের চাকর। তুমি কেন তার সকল কথাকে বেদমন্ত্র ভেবে আপন সুনামের ওপর কালি মাখাচ্ছো? রাজার সদ্ব্যবহার যদি প্রজার বুকে দাগ বসাতে পারে, তাহ'লে শাসন-পদ্ধতির জন্যে রাজাকে একতিলও মাথা খাটাতে হয় না। জগন্নাথের পূজো করতে কি আমি তোমায় নিষেধ করছি অরুন্ধতী? একবারও তা করি নি। কিন্তু ভেবে দেখ দেখি—জগন্নাথ কি তোমার আড়ম্বরই বেশী ভালোবাসেন? যাঁর শত-শত সন্তান আজ অন্নভিক্ষার জন্য ঝুলি তৈরী করছে—গৃহহারা হ'য়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে—তাঁর কি মর্ম্মর-মন্দিরের রত্নবেদীমূলে ব'সে থাকা সাজে? বিশ্বের মাঝে যেখানে যা সাজে, তাই দিয়েই তিনি সব সাজিয়ে রেখেচেন অথচ নিজের কথাটা একবারও চিন্তা করেন নি—এ-কি কখনো সম্ভব হ'তে পারে অরুন্ধতী?

অরুন্ধতী শয্যাপার্শ্বে ব'সে পড়লো।

হরলাল জিজ্ঞাসা করলে—আবার বস্‌লে কেন? ভোর হয়েচে, চারদিক ফরসা হ'য়ে আস্‌চে।

অরুন্ধতী বললে—হোক্ ফরসা। আমি যাবো না।

—তবে কি করবে?

অরুন্ধতী করুণ দৃষ্টি মেলে বললে—মানদাকে যে অধিকার দিয়েছেন, আজ আমিও কি সে অধিকারের দাবী করতে পারি না?

হরলাল হাসতে হাসতে ব'ললে—মানদার যে এ-ছাড়া আর কাজ নেই অরুন্ধতী! কিন্তু তোমার কি কাজের অন্ত আছে? তোমার যে

একহাতে অন্ন অপর হাতে বস্ত্র ধরতে হবে, তোমার কণ্ঠের স্বর একই সঙ্গে গাইবে সাম্য আর শাসনের গান।···কত জ্বালা তোমাকে পোয়াতে হবে তার হিসেব রেখেচ?···সাধারণ আর অসাধারণ এ-দু'টো জিনিসে কত তফাৎ তা তো তোমার অজানা নয় অরুন্ধতী!

অরুন্ধতী রুদ্ধকণ্ঠে বললে—আমি অসাধারণ হ'তে চাই না, আমাকে আপনার সেবার অধিকার দিন।···নিতান্ত সাধারণ—তুচ্ছ দরিদ্র-বংশে যার জন্ম, অসাধারণ হ'য়ে রাজত্ব ভোগ করবার দুঃসাহস থাকা তার অন্যায়। এ আমি আর সইতে পারছি না হরলালবাবু! আমাকে আজ অব্যাহতি দিন।

হরলাল কম্পিত হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে, অরুন্ধতীর হাতের উপর রাখলে। তারপর অত্যন্ত স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বললে—বাবার আদেশ,—মহাগুরুর আদেশই। আজ যদি তুমি তা অমান্য করো, তাতে আমাকেও কম অপমান করা হবে না। যেহেতু আমি তাঁর পুত্র। স্বেচ্ছায় তিনি যা দিয়ে গেছেন—তার ভার বইতে তোমাকেই হবে। এত যে তিরস্কার-লাঞ্ছনার কথা তোমায় শুনিয়ে দিলাম অরুন্ধতী, সে শুধু তুমি বলেই। অন্য কেউ হ'লে কি মুখোমুখী বল্‌বার সাহস হতো, না যাকে বলতাম সে-ই তা মুখ বুজে সইতে পারতো?

অরুন্ধতী তথাপি ক্ষান্ত হ'ল না; বললে—আমি কোনো কথাই শুন্‌বো না। আমাকে আসল অধিকার থেকে আজ বঞ্চিত করতে পারবেন না।—কেন আমার কি এতটুকু দাবী করবার কিছু নেই?

হরলাল বললে—দাবী আছে ব'লেই তো বল্‌ছি অরুন্ধতী। তোমারই দাবী শুধু—আমার কি নেই?

অরুন্ধতী মুখ নামিয়ে ব'সে রইলো।

আকাশে দু'একটা তারা দেখা গেলেও, চারদিকে উষার আলো স্ফুট হ'য়ে এসেচে…

মানদা ঘরে ঢুক্‌লো।

হরলাল জিজ্ঞাসা কল্‌লে—জল আন্‌লে?—ক' কল্‌সী?

তীব্র জ্বলন্তদৃষ্টিতে অরুন্ধতীর পানে চেয়ে, মানদা জবাব দিলে—এক কল্‌সীও না। জল আন্‌তে গিয়ে দু'দুটো কল্‌সীই হারিয়ে এলাম।

সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত হ'য়ে অরুন্ধতী নির্ব্বাকভাবে ব'সে রইলো।

হরলাল জিজ্ঞাসা করলে—কল্‌সী হারিয়ে এলে?—কিন্তু কেমন ক'রে?

মানদার কণ্ঠস্বর ক্রোধে এবং হতাশায় কেঁপে উঠলো। বললে—আমরা মেয়েমানুষ, রাজবাড়ীর খোট্টা-দারোয়ানের সঙ্গে তো লড়াই করতে পারি না। তা ছাড়া ভদ্র-ঘরের মেয়ে হ'য়ে ইজ্জতের ভয়টাও রাখতে হয়। জল তুল্‌তে ঘাটে নেমেচি—সম্ভবতঃ আমাদের আগে আর কেউ আসে নি—তিন-চারজন দারোয়ান লাঠি হাতে এসে আমাদের কল্‌সী দু'টো হাত ছিনিয়ে কেড়ে নিলে। তারপর গালিগালাজ যা করলে,—রাণীমার সুমুখে তা আর বল্‌বো না,—শুন্‌লে ওঁর রাগ হবে হয়তো।

হরলাল জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু কল্‌সী কেড়ে নিলে কেন? আর জলই বা তুল্‌তে দিলে না কি জন্যে?

মানদা বললে—কল্‌সী কেড়ে নিলে—জল তুল্‌তে গেছি সেই অপরাধে, জল তুল্‌তে দিলে না—জগন্নাথের পূজোর জলে মানুষের অধিকার নেই ব'লে।···কল্‌সী কেড়ে নেওয়ার হুকুমটা নাকি পূর্ব্বেই ম্যানেজারবাবু দিয়ে রেখেছিলেন।

অরুন্ধতী তখনো নির্ব্বাক্!

হরলাল বললে—জগন্নাথ হ'য়ে জগৎ-বাসীর কাছে এ-হেন লাঞ্ছনা-ভোগ,—আর কখনো তোমার জগন্নাথের ভাগ্যে ঘটে নি অরুন্ধতী!··· অন্ততঃ আমার তাই বিশ্বাস। কিন্তু বিদ্রোহী ভক্তের অপমান ভগবানকে মুখ বুজেই সইতে হয়, নইলে ভক্তকে চৈতন্য দেওয়া হয়-না। তাই পাষাণের মূর্ত্তি ফেটে বিশ্বরূপের ছটা বেরিয়ে এখনো তোমার চোখ ঝল্‌সে দিচ্ছে না। নইলে ভাস্কর স্বহস্তে গড়েছে,—প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্যও যথাসাধ্য সে ক'রেছিল। পাষাণ-বিগ্রহ আজ সত্যিসত্যিই পাষাণ হ'য়ে রয়েচে—তার আপন ইচ্ছায়।

অরুন্ধতী কঠোর হ'য়ে ব'সে রইলো। হরলালের এত কথার একটা জবাবও সে দিলে না।

হরলাল বললে—ম্যানেজার ভাবছেন,—ভাস্করটা মরে র'য়েচে,—যা-খুসী তাই করা যাবে। কিন্তু ভাস্কর কি সত্যিসত্যিই মরেছে রাণী?··· তুমি তো স্বচক্ষে দেখে গেলে;—তোমার মাইনে-খাওয়া-মনিব ম্যানেজার বাহাদুরকে ব'লো যে, ভাস্কর আরো লক্ষ-লক্ষ পাষাণস্তূপ খোদাই করতে ব্যস্ত এখন, লক্ষ পাথরের বুকে লক্ষ মানুষও সে তৈরী করবে,—তারপর লাঠি-তলোয়ারের সঙ্গে প্রাণের সংগ্রাম বাধ্‌বে রাণী! মানুষের ক্ষুব্ধ আত্মা মুখ বুজে সইবে আর চোখ চেয়ে দেখবে—তলোয়ারের ধার কত-

প্রাণীকে ঘাল করতে পারে! এক যাবে একশো এসে বর্শার ফলার সুমুখে, লাঠির ডগার সুমুখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে। তারা মরবে তবু মারতে যাবে না,—মারণাস্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করবে।

অরুন্ধতী নতমুখে ধীরে-ধীরে বললে—কিন্তু আমাদের বাবার আদেশ—

উত্তেজিত হ'য়ে হরলাল ব'লে উঠলো—বাবা জীব-হিংসার আদেশ দিয়ে যান নি অরুন্ধতী! রাজা হ'য়ে প্রজার টুঁটি কামড়ে রক্ত চুষে খেতেও বলেন নি। তিনি স্বর্গে রয়েচেন,—তাঁর স্বর্গ-সুখের ব্যাঘাত দিয়ো না আজ। তা যদি দাও, আমি তাঁর সন্তান, বিদ্রোহ করবো।

অরুন্ধতী হঠাৎ কোনো কথা না ক'য়ে দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হরলাল সামান্য বিস্মিত হ'ল, কিন্তু তাকে ডাক্‌লে না।

মানদা ধীরে-ধীরে হরলালের মাথায় বাতাস দিতে লাগলো।

উষার আলো নিভে গেছে,—অরুণ-আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত।

রাইচরণ বাহির থেকে ডাকলে—মানু!

মানদা উঠলো না। তার কাকী উঠে গেল।

রাইচরণ ঘরে এসে হরলালের পাশে ব'সে তার গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেমন আছো ভাস্কর!···জ্বরটা ছেড়েচে?

হরলাল বললে—খুব ভালো আছি আজ, কিন্তু তোমাদের খবর কি? যোগাড় হ'ল? কে-কে গেছলে?

রাইচরণ মানদার হাত থেকে পাখাখানা নিয়ে বাতাস করতে-করতে বললে—গাঁয়ের অনেকেই গেছলো।··· সবাই দিতে রাজী হ'ল।

ওরা বললে—'যখন ভাস্কর অনুরোধ করেচে, তখন যত তোমাদের দরকার সবই দিতে পারবো।' তাছাড়া আমাদের গাঁয়েও অনেক বাঁশঝাড় রয়েচে। গাঁ থেকে যতগুলো পাওয়া যায় যাবে, বাকী ওখান থেকে নিতে হবে। দড়ি-কাঠ যা লাগবে—কিচ্ছুর অভাব হবে না।

বলতে-বলতে সহসা রাইচরণের গলা ধ'রে এলো। ব'ললে—এত বড় দুর্ভাগ্যের পর এই নতুন সৌভাগ্যের সূচনা—এ-শুধু তোমারই দয়াতে ভাস্কর! নইলে এই নবগ্রামেই তো দলাদলি মন-কষাকষির অন্ত ছিল না। একজনের বিপদে অন্য-একজনের বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানো—এ-শুধু তুমিই শেখালে! তুমি তো শুধু দেবতাই গড়ো না ভাস্কর, মানুষ গড়তেও তোমার জোড়া নেই।

ক্লান্ত-কণ্ঠে হরলাল বললে—অত্যন্ত অপারগ আমি,—একটুও ক্ষমতা নেই আমার—মানুষ গড়তে আমি জানি না রাইচরণ!···কিন্তু তোমাকে আর রাইচরণ ব'লে ডাকবো না,—আজ থেকে মানদার মত তুমি আমারও কাকা হও। কিন্তু কাকী কোথায় মানদা?···কাকাকে হাত-মুখ ধোয়ার জল দাও।···রাত্রিতে ঘুম হ'য়েছিল তো? সেখানকার লোকে বেশ যত্ন করলে?

রাইচরণ গর্ব্বিত হ'য়ে বললে—করবে না? পাঠিয়েছিল কে আমাদের? তুমি যে সেখানে লুকিয়ে-লুকিয়ে বক্তৃতা দাও—তা কি আমরা জানতাম। ···আজ সেখানকার লোকেরা তোমায় দেখতে আসবে। এতদিন আসেনি কেন জানো? কে নাকি রটিয়েছে—তুমি রাণীর বাড়ীতে রয়েচ আর রাণীমা খুব ঘটা ক'রে তোমার চিকিৎসা করাচ্ছেন।

হরলাল মৃদু হেসে বললে—কপালের কথা বলা যায় না কাকা।

ভাগ্যে হয়তো সে-দুর্ভাগ্যও আছে আমার। তোমাদের রাণী সারারাত এখানেই ছিলেন। একটু আগে চলে গেছেন

রাইচরণ হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো।

হরলাল বললে—বিস্ময়ের কারণ নেই। হাজার হোক্ সে-ও তো মানুষ। কিন্তু তুমি আর দেরী করছো কেন? সকাল-সকাল খেয়ে আবার বেরুতে হবে তো? কাল থেকেই ঘরে মজুর লাগানো চাই।

রাইচরণ উঠতে-উঠতে বললে—নাইতে তো যাবো, কিন্তু জমিদারের পাইকগুলো যে-রকম অত্যাচার স্থরু করেছে, হয়তো একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধতে পারে।

হরলাল বললে—কিচ্ছু বাধবে না আর।··কিন্তু স্থধাসমুদ্রের জলে তোমরা কেউ স্নান ক'রো না যেন। গাঁয়ের সকলকে বলে দেবে। খাবার জল ছাড়া অন্য কারণে কেউ যেন ওখান থেকে এক কল্সীও জল না তোলে।

রাইচরণ বললে—যদি অন্য কোথাও জল না মেলে?

—কিন্তু অভাব তো এখনো হয় নি কাকা! যখন হবে, তখন সে ব্যবস্থাও করা যাবে।···তুমি আরও একটা কাজ ক'রো, যাবার পথে কব্‌রেজ মশায়কে একবারটি ডেকে দিয়ে যেয়ো।···আমাকে তাড়াতাড়ি আরাম হ'তে হবে। শুয়ে থাকা আর পোষাচ্ছে না।···বল্‌তে-বল্‌তে হরলাল বিছানায় উঠে বসলো।

রাইচরণ তাড়াতাড়ি তাকে ধরে শুইয়ে দিলে। বললে—দুর্ব্বল হ'য়ে গেছ। তাড়াতাড়ি সারবো বললেই কি তাই হবে? কী ব্যাপারটা হ'য়েছিল তাতো মনে নেই তোমার!

শুয়ে-শুয়ে হরলাল হাসতে লাগলো।...

মানদা একঘটী জল নিয়ে ঘরে ঢুকলো। বললে—মুখ ধুইয়ে দেব।

হরলাল বললে—আজ আমি উঠে বসে আপন হাতে মুখ ধোব কিন্তু।

মানদা বললে—সে আপনি পারবেন না। হাতের ঘা-টা এখনো দগ্‌দগে রয়েচে। জল পড়লেই জ্বালা করবে।

—'তবে মুখ ধোবো'না' বলে হরলাল পাশ ফিরে শুলো।

মানদা বললে—রোগীমানুষের গায়ে যা জোর থাকে, সে আমার বিলক্ষণ জানা আছে। কাল অত জ্বরের পর আজকের অবস্থা তো আরো ভয়ানক হবার কথা।

হরলাল আব্‌দারের সুরে বললে—তা হোক ভয়ানক, তুমি আমায় জল দাও,—হাতের ঘা অনেক সেরে গেছে—একটুও ব্যথা করবে না।

মানদা, হরলালের কাঁধের কাছে হাত দিয়ে বললে—উঠুন!

হরলাল আপনি উঠে বসলো। বললে—মনের সুখ থাকলে দেহের অসুখ অর্দ্ধেক কম হ'য়ে যায় মানু!...উঠতে হ'লে এখন আর আমায় ধরে তোলাতে হবে না।......

মুখ ধোয়া হ'য়ে গেলে হরলাল অনেকক্ষণ বিছানায় ব'সে রইলো। মানদা তাব পিছনদিকটায় গোটা তিন-চার বালিশ দিয়ে উঁচু ক'রে দিলে।

হরলাল জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা মানু! রাণীকে তোমার কেমন লাগলো?

—খুব সুন্দরী, অমন সুন্দর রূপ আমি আর কখনো দেখিনি। অবিশ্যি রাণীকে আমি এর আগেও দেখেছিলাম।

হরলাল স্মিতমুখে বললে—দূর! আমি বুঝি তাই বলছি? সুন্দর অসুন্দরের কথা নয়, তাকে অন্য সব বিষয়ে তোমার কেমন মনে হয়? লোক কেমন—তাই জিজ্ঞেস করছি।

মানদা বললে—ও,···তা লোক মন্দ কি? বেশ। আপনাকে কিন্তু উনি খুব ভালোবাসেন আর শ্রদ্ধা করেন। আচ্ছা, আরো যে-সব কথা হচ্ছিল আপনাদের, আমি তার একটাও বুঝতে পারলাম না কেন?

হরলাল হাসলে। এবং কিছুক্ষণ চিন্তান্বিত অবস্থায় থেকে, বললে—ভেতরে অনেক কথা আছে মানু,—তুমি ছেলেমানুষ সে-সব বুঝবে না। তবে মোটামুটি জেনে রাখো—রাণী অরুন্ধতীর সঙ্গে আমার বহুদিন থেকেই পরিচয় আছে এবং সে-পরিচয় যেমন-তেমন নয়। আত্মীয়তা রাখলে দস্তুরমত রাখা যেতো।

মানদা বিস্ময়ানুভব ক'রে বললে—কিন্তু আপনিই বুঝি আত্মীয়তা রাখেন নি?

হরলাল হেসে উঠলো।

মানদা বললে—আপনি যে ঝগড়া করতে পারেন, এর আগে আমি তা ভাবতেই পারিনি। সত্যি বলছি, এ কিন্তু ভারি অন্যায় আপনার।···তাছাড়া আমাদের জন্যে আপনজনের সঙ্গে বিরোধ বাধানো—

হরলাল বলে উঠলো—তোমাদের জন্যে তাঁর সঙ্গে আমি মোটেই

ঝগড়া করিনি। ঝগড়া করবোও-না কোনো দিন। কেন আগেই তো বললাম, ভেতরের সকল কথা তুমি বুঝবে না।

—কেন বুঝবো না ?—আমাকে আপনি ছেলেমানুষ ঠাওরালেন কি-হিসেবে ? আমার বয়েস কত জানেন ?

—যতই হোক্, তবু একটি-একটি ক'রে সব কথা না বললে তোমার কেন—কারুর পক্ষেই বুঝে ওঠা সম্ভবপর নয়।...আর একটুখানি ভালো হ'য়ে সেরে উঠি, তারপর একদিন নিরিবিলি তোমায় সব কথা বলবো।

—আচ্ছা, আরো যে একজনকার নাম হচ্ছিল যাঁকে আপনিও বলছিলেন—'বাবা' আর রাণীও বলছিলেন—

—হ্যাঁ, তিনি আমারই বাবা।

—আমাদের বুড়ো জমিদারবাবু,—তিনি তো রাণীরই বাবা ছিলেন।

—আমারও তিনি বাবা ছিলেন মানদা।

মানদার বিস্ময়ের আর সীমা-পরিসীমা রইলো না। অনেকক্ষণ হরলালের পানে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ সে বলে উঠলো—তাহ'লে ভাই-বোনের লড়াই চলেছে এখন!...কিন্তু কেন ? তুচ্ছ বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে নিশ্চয়ই নয় ?

অধীর পুলকে হরলাল বলে উঠলো—মানদা, আমার লক্ষ লক্ষ ত্রুটী হ'য়েচে। আর যদি ছেলেমানুষ বলে কখনো তোমায় ভাবি, তাহ'লে বুঝবো আমার মত ছেলেমানুষ আর একটিও নেই। সত্যিই অনুমান করেছ—তুচ্ছ বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে নয়। লড়াই বেধেচে—মতামত নিয়ে। তোমাদের রাণী জগন্নাথের অন্ধভক্ত, যাকে বলে পয়লা নম্বরের গোঁড়া। মানুষের মর্ম্মের কথাকে সে গ্রাহ্য করবে না। ভগবানের

প্রতি অন্ধভক্তি দেখাতে গিয়ে মানুষকে দলিত করতেও সে দ্বিধা করে না।

মানদা বললে—তা তো দেখতেই পাচ্ছি।···কিন্তু আপনি কেন বোন্‌টিকে তার ভুল ধরিয়ে দিচ্ছেন না ?

—দিতে কি চেষ্টা করি না মানদা! কিন্তু সে তো তা মানতে চায় না। আর চায় না বলেই যত মন কষাকষি।

মানদা বললে—আপনার নামটি কিন্তু এর আগে এ-গাঁয়ের কেউ জানতো না। আজই রাণীর মুখে শুনলাম।

হরলাল বললে—কিন্তু তুমি একাই শুনেচ, আর কেউ এখনো আমার নাম জানে না।···আমি ভরসা করি মানু, ভেতরের যত-কথা আজ তোমায় জানিয়েচি—এসব জেনেও তুমি আর-কারুর কাছে প্রকাশ করবে না।

মানদা বিনীতভাবে বললে—আপনার আদেশ আমি প্রাণ গেলেও অমান্য করবো না।···কিন্তু কথায়-কথায় বেলা বেড়ে চললো। কাল থেকে না খেয়ে রয়েচেন, কব্‌রেজ মশায় তো এখনো এলেন না। আপনি বসুন—আমি দুধ গরম ক'রে আন্‌ছি।

মানদা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই রতন কবিরাজ এলেন এবং হরলালকে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করার পর, সহর্ষে বললেন—ওষুধের আশ্চর্য্য ফল ফলেছে ভাস্কর! আর পাঁচ-সাত দিন পরে সম্পূর্ণ সেরে উঠবে তুমি।···আমি বাড়ী থেকে একটা মলম পাঠিয়ে দেব,—সেটা পোড়া জায়গায় প্রলেপ দিয়ো।···

রতন কবিরাজ্ বেরিয়ে যাওয়ার মিনিট দশ-পনের বাদে মানদা দুধ

নিয়ে ঘরে ঢুকলো এবং তার কিছুক্ষণ পরে রাইচরণ ও তার পশ্চাতে ম্যানেজারবাবু প্রবেশ করলেন।

হরলাল বললে—নমস্কার ম্যানেজারবাবু! আসুন।...মানদা, একখানা আসন পেতে দাও।

ম্যানেজার বসলেন না। বললেন—রাণীমার আদেশমত কলকাতা থেকে ডাক্তার আনানো হ'য়েছে, তিনি এক্ষুণি আপনাকে দেখতে আসবেন।

হরলাল অন্তরে-অন্তরে পুলকিত হ'য়ে উঠলো। কিন্তু অন্তরের হর্ষাবেগ বাইরে প্রকাশ না ক'রে, গম্ভীরভাবে বললে—আপনার রাণীমা আস্ত একটি পাগল। কেন—দেশের কব্‌রেজ মশায় কি এতই অবহেলার?...তিনিই তো আমাকে আরাম ক'রে দিচ্ছেন। মিছিমিছি কতকগুলো টাকা নষ্ট করবার কোন আবশ্যক ছিল না তো।

ম্যানেজার যেন আর পূর্ব্বের সেই তেজী ম্যানেজার নয়। রীতিমত ভদ্রতা ও নম্রতা দেখিয়ে বললেন—রাণীমা নিজে এসে আপনাকে দেখে গেছেন—তিনি বুঝতে পেরেছেন অসুখ সহজে সারবে না।...অবশ্য তার আগেই ডাক্তার আনতে পাঠানো হ'য়েছিল।...যাকে দেশশুদ্ধ লোক দেবতার মত ভাবে, তাকে যেমন-তেমন চিকিৎসকের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা তো উচিত নয় কিনা।

হরলাল অন্তরের কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা ম্যানেজারবাবু! আজ হঠাৎ আমাকে এত বেশী-বেশী সম্ভ্রম দেখাচ্ছেন কেন? আমার যে ভয়ানক লজ্জা করছে!

ম্যানেজার অপ্রতিভ হ'য়ে বললেন—সম্মানী ব্যক্তিকে সম্মান বা সম্ভ্রম

দেখানোই তো মানুষের উচিত মশায়! আমরা কর্ম্মচারী, রাণীমার অন্ন খেয়েই আমাদের দেহের পুষ্টি, তাঁর আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে যদি পালন করতে না পারি, তা হ'লে শুধু তাঁর কাছে কেন—স্বয়ং ভগবানের কাছেও পাতকভাগী হবো। দোষ-ত্রুটী সহস্র বার ক'রেছি, আজ চাকর হ'য়ে করযোড়ে মার্জ্জনা চাই বাবু!···অধম ভৃত্যকে পায়ে ঠেল্‌বেন না। আমি যদি ঘুণাক্ষরেও আপনাকে 'হরলালবাবু' ব'লে চিন্‌তে পারতাম, তাহ'লে আপনার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র লক্ষ হ্যায়ালঙ্কারের রক্ত দিয়ে আপনার পা ধুইয়ে দিতে একবারও পেছন ফিরে চাইতাম না।

শশব্যস্তে হরলাল বলে উঠলো—আপনি থামুন ম্যানেজারবাবু, এ আপনি কাকে কী বলছেন?...আমি মৃত্যু-পথযাত্রী, মরবো কি বাঁচবো এখনো তার ঠিক নেই, এ-সময় পাপের কথা শুনিয়ে আমাকে অপরাধী করবেন না। হাজার যা-তা বকে যাই না কেন, তবু আমি হিন্দু।

ম্যানেজার আরো বললেন—সে আপনার মহত্ত্ব। কিন্তু আজ থেকে সুধাসমুদ্রের জল চার-চাক্‌লার হিন্দু-মুসলমানের জন্যেই জমা করা রইলো। আমি আজ আপনার পায়ের তলে দাঁড়িয়ে এই প্রতিজ্ঞাই ক'রে যাচ্ছি।

হরলাল হেসে উঠে বললে—কিন্তু একটু আগেই আপনি বলেছেন যে রাণীর কর্ম্মচারী ছাড়া আপনি অন্য কেউ নন।···রাণীর যদি সে-হুকুম না থাকে

ম্যানেজার সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলেন—রাণীর আদেশ আমি মান্‌বো না। আপনাকেই আমি আজ থেকে মনিব ভাববো। আপনি আগে, রাণী পরে।

হরলাল ভয়ানক গম্ভীর হ'য়ে উঠলো।

ম্যানেজার হাতযোড় ক'রে বললেন—তাহ'লে এখনকার মত আসি হুজুর। যদি দরকার হয়, একটা কচিছেলের মারফৎ খবর পাঠালেই আমি শত কাজ ফেলে হুজুরে হাজির হবো।

হরলাল গম্ভীরভাবে বললে—আচ্ছা।

ম্যানেজার হাত কচলাতে কচ্‌লাতে এবং মুখে অনেকবার "যে আজ্ঞে —যে আজ্ঞে" বলতে বলতে প্রস্থান করলেন।

ইতিমধ্যে অরুন্ধতীর পাল্কীখানা এসে দরজার সুমুখে লাগলো। তার পিছনে আরো একখানা পাল্কী, তাতে ছিলেন ক'ল্‌কাতার ডাক্তারবাবু।

অরুন্ধতী পাল্কী থেকে নামলো না। ডাক্তারবাবুই কেবলমাত্র বাড়ীর ভিতরে এসে, হরলালের সর্ব্বশরীর ও নাড়ী-পরীক্ষা করলেন। এবং কারুকে কোনো কথা না ব'লে ধীরে-ধীরে পুনরায় পাল্কীতে চেপে ব'সলেন।

অরুন্ধতী তখন ভিতরে ঢুক্‌লো।

হরলালের দু'পায়ের তলায় হাত ঠেকিয়ে সেই হাত আপন মাথায় ঠেকাতে-ঠেকাতে বললে—আমি আপনাকে আর-কোনো অনুরোধ করবোনা—কেবল একটা কথা রাখুন—

হরলালের এখন আর গম্ভীর ভাব নাই। স্মিতমুখে সে বললে—একটা কেন রাণী,—যত পারো অনুরোধ করো, ভাস্কর তোমায় কষ্ট দিতে তো চায়নি কোনোদিন। কিন্তু একটুখানি বুঝে-সুঝে কথা ক'য়ো।

ব'লেই ইসারা ক'রে অরুন্ধতীকে কাছে ডাকলে।

অরুন্ধতী খুব নিকটবর্ত্তী হ'য়ে বস্‌তেই, হরলাল বললে—ঘরশুদ্ধ

লোকের মাঝে বেশী কথা কওয়া কি মানায়?...আমাকে কি তুমি একেবারেই ভুলে গেছ? সকলে আমায় ভাস্কর বলে জানে—সেইটুকুই আমি বেশী পছন্দ করি।

অরুন্ধতী মাথা নেড়ে নিম্নস্বরে বললে—আমি কিন্তু তা মোটেই পছন্দ করবো না।

ক্লান্ত হ'য়ে হরলাল আর কথা কইলেনা।

অরুন্ধতী উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমি চ'ল্লাম। ডাক্তারবাবুর মতামত জেনে সেইরকম ব্যবস্থা করতে হবে। যদি আবশ্যক বুঝি, তাহ'লে আবার এখুনি ফিরে আস্‌বো।

রাণী চলে গেলে, যারা ডাক্তারের এবং রাণীর পাল্কী আসা দেখে বাড়ীতে সমবেত হ'য়েছিল—সকলেই সমস্বরে মন্তব্য প্রকাশ করলে—গোড়া কেটে আগ্-ডালে জল ঢাল্‌া হচ্ছে।...

হরলাল কোনো কথা বললে না।

মানদা এগিয়ে এসে বললে—ঘরের হাওয়া বন্ধ হ'য়ে গেছে। আপনারা বসুন।

সকলে বসলো।

হরলাল বললে—তোমাদের বলে-ক'য়েও বোঝাতে পারলাম না ...যদি মরি, তবু আমার এ-দুঃখ ঘুচ্‌বেনা। এই কি ঘোট পাকিয়ে বসে থাকবার সময়? দুপুরবেলায় রান্না-বান্না-ক'রে বাড়ীর মেয়েরা ব'সে আছে, যাও নিজেরা খেয়ে তাদের মুক্তি দাওগে। এরপর বিকেলে অন্য কাজ আছে। ঘর দোরগুলো সারতে হবে, না—ফাঁকা আকাশের তলেই জীবনটা কাট্‌বে?

আশ্চর্য্য বশীকরণ!—কেউ আর কথাটি কইলে না। যে-যার বাড়ীর দিকে রওনা হ'য়ে গেল।......

রাইচরণ রান্নার জন্য যে তালপাতার ছাউনি চালা করা হ'য়েচে, সেখানে বসে ভাত খাচ্ছিল,—তার স্ত্রী পরিবেশন করছিল। মানদা ছিল—হরলালের কাছে একা।

মানদা হাসিমুখে বললে—একটা ভারি মজার খবর আছে,—কল্‌সী দুটো ফিরে দিয়ে গেছে।

—কে?

—রাজবাড়ীর লোকেরা, কিন্তু খালি কলসী নয়, দু'কল্‌সী জল সমেত।

পুলকিত হ'য়ে হরলাল বললে—সত্যিই সুসংবাদ মানদা!...কিন্তু তুমি আর দেরী ক'রো না, আর-একটুখানি গরম দুধ দিয়ে, নিজের মুখে চারটি দিয়ে এসো। তুমি অসুখে পড়লেই মৃত্যু আমার সুনিশ্চিত।

কপট ক্রোধ দেখিয়ে মানদা বললে—বেশ, চুপ করুন। আচ্ছা লোক আপনি! কথায়-কথায় বলা হচ্ছে যদি না ভালো হই,—যদি ভালো-মন্দ কিছু হয়...কেন—? ওসব কথা যদি আর শুনি, তাহ'লে—

—"কি তাহ'লে মানদা?—কি হবে? শাস্তি—?" বলে হরলাল হাসতে লাগলো।

মানদা কুপিত হ'য়ে বললে—দেবোই তো শাস্তি। এতক্ষণ দিতাম, খালি রাণীর ভাই বলে দিতে সাহস হয়নি।

—সাহস হয়নি কেন?

—যদি রেগে যান, তাহ'লে আমাকেই উল্টে শাস্তি ভোগ করতে হবে।...এখন কিন্তু সাহস হচ্ছে।

হরলাল কপট গাম্ভীর্য্যের সুরে বললে—যমরাজ স্বয়ং আমার শিয়রে বসে রয়েচেন। মরণকালে তোমায় একটা কথা বলে যাই মানদা,—

মানদা দু'হাত দিয়ে হরলালের মুখ চেপে ধ'রে বললে—খবরদার বলছি।...আমি অনেকবার সহ্য করেছি।

তারপর হঠাৎ হাত দু'টো সরিয়ে নিয়ে, সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগলো।

বিস্মিত হ'য়ে হরলাল বললে—এ আবার কি ব্যাপার! সাজা দিতে গিয়ে বিচারকের বুকফাটা-কান্না!...তবে বুঝি বিনা দোষে দণ্ড দিচ্ছিলে?

কাঁদ্‌তে-কাঁদ্‌তেই মানদা বলে উঠলো—দোষ আমারই, দু'হাজার বার আমার দোষ। আমি কেন না-বুঝে এই জোর খাটাতে বসেছিলাম। গরীব প্রজার হতভাগী মেয়ে হ'য়ে, কেন রাজার সঙ্গে টেক্কা দিয়ে কথা কইতে চেয়েছিলাম।...সাজা আমারই পাওয়া উচিত।

হরলাল ব্যথিত হ'ল। মানদার একখানা হাত আপন হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বললে—মানদা! আমি পথের ভিখিরি,—দীনাতিদীন ভাস্কর। পাথর খোদাই করে অন্নসংস্থান করি। রাজা নই, প্রজাও নই,—আমি শুধু ভাস্কর। জগতশুদ্ধ লোক যদি আজ আমায় ভুল বুঝে থাকে, তুমি যেন তা বুঝো না। বিপদে যে করুণাময়ী—সেবারতার মূর্ত্তি ধ'রে দিন-রাত আমার পাশে ব'সে অনাহার-অনিদ্রার ব্যথা হাসিমুখে সহ্য করেছে—তার কাছে আমাকে হীন হওয়ার দুর্ভাগ্য আজ দিয়ো না।

তুমি!...আমি রাজা নই—কোনো দিন হই নি, হ'তে চাইবো না।...
কিন্তু কি কথায় কি এসে পড়লো বলতো?...আচ্ছা পাগল যা হোক্।
ঠাট্টা করে একটা-কিছু বললেও তোমার বরদাস্ত হবে না!...এর পর বিয়ে
হ'য়ে শ্বশুর-বাড়ী গেলে—তুমি সেখানে থাক্‌বে কেমন করে?

—জ্বালা সইতে না পারলে আমি বিষ খাবো।

—তাতে মানুষের গৌরব বাড়ে না মানু! যে আত্মহত্যা করে,
ভগবানের কাছে অমার্জ্জনীয় অপরাধ তো করেই সে,—তা ছাড়া দুনিয়া-
শুদ্ধ লোকের কাছে কাপুরুষ প্রতিপন্ন হয়। সাহস যাদের নাই,
আত্মহত্যা করে তারাই মানদা!...কিন্তু নিজে না খাও • না খাবে,
আমাকেও কি না খাইয়ে মারবে?

মানদা উঠে গেল।

রাইচরণ গামছায় মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুক্‌লো।

হরলাল জিজ্ঞাসা করলে—খাওয়া হ'ল?

—হ্যাঁ।

—তবে আবার এখানে এলে কেন?...জন-মজুর এ-গাঁয়ে কতগুলো
পাওয়া যাবে,—একবার ঘুরে দেখে এসো।

—যাই, কিন্তু ভিন্‌গাঁয়ের লোকজন আসবে, অথচ আমি বাড়ী
থাক্‌বো না?

—ও,—ওরা সব আমায় দেখতে আসবে বুঝি?...তা আসুক।
অবস্থার কথা কারুর তো অজানা নেই। যা বলতে হয় আমি বুঝিয়ে
বলবো। কিন্তু সাবধান! তোমাদের একজনও যেন কুঁড়েমী ক'রে কাজ
মাটী না করে।

হরলাল একরকম জোর করেই রাইচরণকে পাড়ায় পাঠিয়ে দিলে।

মানদা দুধের বাটি নিয়ে ঘরে এলো।

হরলাল দু'একবার মুখে দিতে না দিতেই, অরুন্ধতী তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে বললে—হাঁ—হাঁ—দাঁড়াও!

বলেই নিতান্ত অপ্রস্তুতভাবে মুখ নামিয়ে দাঁড়ালো, তারপর নত-মুখেই ধীরে-ধীরে বললে—ওষুধটা আগে খেয়ে তারপর অন্য-কিছু খাবেন।...ওষুধ আমি নিয়ে এসেচি।

মানদা হাত বাড়িয়ে শিশিটা নিলে বটে, কিন্তু ঘরে না আছে একটা ছোট কাচের গ্লাস, না আছে কিছু! সে-ও বড় কম অপ্রস্তুত হ'ল না।

অরুন্ধতী বাইরে গেল এবং পাল্কী থেকে একটা ছোট হাতব্যাগ নিয়ে এসে মানদাকে দিয়ে বললে—যা-যা দরকার সব এটার মধ্যেই খুঁজে পাবে।

হরলাল সহর্ষে বললে—তবে আমি কি বুঝবো যে, এখন থেকে আমার ঘটা ক'রেই চিকিৎসা আরম্ভ হ'ল!...কিন্তু সত্যি কথা অরুন্ধতী!—দেশের গাছ-গাছড়ার প্রস্তুত খাঁটি স্বদেশী ওষুধগুলোয় যখন ষোল-আনা ফল পাচ্ছি, তখন অনর্থক বিলিতি জল পেটে নাই-বা দিলাম।

অরুন্ধতী বললে দেশে একটা চল্‌তি কথা আছে—উপরোধে ঢেঁকী গিল্‌তে হয়। দিশী কথাটাকেও যে আজ মিথ্যা সাব্যস্ত করা হচ্ছে!...কি বলো মানদা, তোমার কি মত?

মানদা ব'ললে—আপনার মতেই আমার মত। ওষুধের আবার দিশী-বিলিতি কি আছে?

হরলাল বললে—আছে বইকি মানদা ! নিশ্চয়ই আছে। সাধ্যপক্ষে বিদেশী জিনিস ব্যবহার করবো না আমি, আর তোমাদেরও বার-বার নিষেধ করবো। যদি রতন কব্‌রেজের বড়ি আর প্রলেপে ফল না পেতাম, তাহ'লে আজ তোমাদের সঙ্গে একবারও তর্ক করতে চাইতাম না।···

অরুন্ধতী বললে—কিন্তু অত্যন্ত সন্দিগ্ধ আর ছোট মন আমার। আমি কিন্তু অন্য ভাবচি।

—তা আমি বুঝতে পেরেছি অরুন্ধতী।—তুমি যা ভাবচো তা আমার কাছে অজ্ঞাত নেই। কিন্তু আমার অন্তর্যামীর শপথ—তোমার ওপর একটুও অভিমান করে নয়,—আমার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হ'য়ে।—

অরুন্ধতী বললে—ও-সবগুলো সরিয়ে রাখো মানদা ! ঘটা ক'রে চিকিৎসা ওঁর কপালে নেই।

হরলাল খুসী হ'য়ে বললে—চিকিৎসার চেয়েও শুশ্রূষায় রোগীর লক্ষ গুণে বেশী উপকার হয়। শুশ্রূষাটা ঘটা ক'রে স্থরু ক'রে দাও না, দিব্যি আরামে প'ড়ে থাকা যাবে।

অরুন্ধতী বললে—শেষকালে আপনার কথাটাই ফলবে বোধ হয়।... কিন্তু আর আমি দেরী করবো না। ডাক্তারবাবুকে বিদেয় করতে হবে।

হরলাল আপন মনেই বললে—বাজে অর্থব্যয় !···

অরুন্ধতী বললে—কেউ ভাবে বাজে, আর কেউ ভাবে কাজে। আমি হয়তো এটাকে মোটেই বাজে মনে করিনি।

হরলাল বললে—বেশ করেছ, কিন্তু কাজের কাজটা সেরে নাও গে যাও।···পূর্ব্বেই তোমার ভাবা উচিত ছিল—প্রজার দুর্দ্দিনে, তাদের শুভাশুভের পানে চেয়ে, অনর্থক অর্থব্যয় করাটা রাজার পক্ষে মহাপাপ।

অরুন্ধতী যেতে-যেতে বলে গেল—রাজা নেই যে-রাজ্যে, সে-রাজ্যের প্রজাদের এমনি কপালই হ'য়ে থাকে।...তারপর আর সে দাঁড়ালো না।

হরলাল বললে—আমার মনে হচ্ছে কি জানো, মানদা?

মানদা বললে—জানি বই কি।

হরলাল হেসে উঠলো। বললে—জানি বই কি!—কী জানো? আমার মনে যা হবে—সবই তোমাকে জানিয়ে হবে না কি?

মানদা মুখ টিপে হাস্‌তে লাগলো।

হরলাল বললে—আচ্ছা বলো দেখি—কি আমার মনে হচ্ছে?

মানদা বললে—মনে হচ্ছে, এইবারে শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর আরাম হ'য়ে উঠবেন।—কেমন এই কথা তো?

হরলাল দারুণ বিস্ময়ে ব'লে উঠলো—কাল থেকে একখানা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বই কিনে, তোমার সঙ্গে একটু-একটু শিখবো। একেবারে আঁতের কথা টেনে বের করা—এ তো যেমন-তেমন বিদ্যে নয়।...কিন্তু সত্যি বলছি—ঐ কথাটাই আমি ভাবছিলাম।...মানদা!—শুধু বাহিরটাই তোমার সুন্দর নয়, তোমার মনের সৌন্দর্য্য বাইরের সৌন্দর্য্যকে হার মানিয়ে দিতে পারে।

মানদা রাগতভাবে বললে—নিজে খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করলেন,—আমরা যে কখন খাই—কখন জিরুই তা একবারও মনে আসে না। খালি যা-তা বক্‌বেন,—না আমাদের খেতে যাওয়ার অনুমতি দেবেন?

হরলাল পিছনের একটা বালিশ সুমুখের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে, তারই ওপর দু'খানা হাত রেখে বললে—সৌন্দর্য্যের আর-একটা দিক্!...কিন্তু আমার যখনই পেট ঠাণ্ডা হয়েচে,—তখনই ভেবেচি—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তৃপ্ত

হয়েচে।...তা যাও না—কে তোমায় বারণ করেচে!...কিন্তু সাবধান ক'রে দিচ্ছি,—খেয়ে, বিশ্রাম না করেই যদি আবার আমার কাছে হাজির হও, তাহ'লে আমি ঘর থেকে তাড়িয়ে দেব।

মানদা হাসি-হাসিমুখে বেরিয়ে গেল।...

মিনিট পনের হ'তে না হ'তেই আহার সমাধা ক'রে পুনরায় যখন মানদা ঘরে ঢুক্‌লো,—হরলাল গম্ভীর হ'য়ে বললে—বিশ্রাম না ক'রে এ-ঘরে প্রবেশ নিষেধ।...

মানদা বললে—তা তো বলবেনই।...বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে ভালো ঘরখানি ইজারা ক'রে নিয়ে, এখন কথায়-কথায় প্রবেশ নিষেধ বলবেনই তো। কালের ধর্ম্মই হ'ল তাই। বিশ্রাম করবো কোথা? গাছতলায় বসে-বসে? সুধাসমুদ্রের বাঁধা ঘাটে?

হরলাল জোরে হেসে উঠলো এবং হাসির চোটে ক্লান্ত হ'য়ে বললে—তোমাকে কোটী-কোটী নমস্কার মানু! তুমি আমাকে একাই সাতঘাটের জল খাওয়াতে পারো।

মানদা বলে উঠলো—ঘাটের মধ্যে ঐ একটিমাত্র পুঁজি—সুধাসমুদ্রের বাঁধাঘাট, তা সেখানেও ভোজপুরী দারোয়ানের লাঠির ভয় আছে।... সাতঘাটের জল খাওয়ানো কি সোজা নাকি?

কথোপকথনের মাঝখানেই,—ভিন্ন-গ্রামের অনেক লোক এসে ভাস্করের শয্যাপার্শ্বে জমা হ'ল।

মানদা তাদের আগমন জেনেই অন্যত্র উঠে গেছলো।

বাইশ

দ্বিতলের যে-কক্ষে বসে অরুন্ধতী বৈষয়িক কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করতো, সেখানে তখনও আলো জ্বলেনি—অথচ সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

ঠাকুরবাড়ীতে আরতি হচ্ছিল।

অন্ধকারে অনেকক্ষণ ব'সে-ব'সে অরুন্ধতী সন্ধ্যারতির গুরুগম্ভীর বাজনা কান পেতে শুন্‌লে, তারপর গলবস্ত্র হয়ে সেখান থেকেই জগন্নাথকে প্রণাম করলে—আশীর্ব্বাদ করো প্রভু! তোমার সেবা করতে গিয়ে অপরাধের বোঝা যেন মাথায় না নিই। সাহস দাও, বল দাও, উৎসাহ দাও তুমি।...জানিনা দেবতা!—কর্ত্তব্য আমার কেমন। দুনিয়া পালন করাই যদি তোমার কাজ, তবে অন্তরের প্রেরণা থেকে আজ আর বঞ্চিত ক'রো না। অন্ধকারে আলো দেখাও, অন্ধকে পথ দেখিয়ে আলোর দিকে নিয়ে চলো!

দাসী আলো আন্‌তেই অরুন্ধতী বললে—ম্যানেজারবাবুকে ডেকে দিবি তো।

দাসী চ'লে গেলে আবার সে যুক্তকরে ঠাকুর-প্রণাম করলে; মনে মনে বললে—স্বর্গগত আশ্রয়দাতার ঐকান্তিক অনুরোধে ও আদেশ-পালনে যদি সত্য-সত্যই আমার অবহেলা আসে, অথবা আদেশের অর্থ যদি না বুঝতে পারি ঠাকুর! বজ্র-যাতনায় তুমি তা বুঝিয়ে দিয়ো। তোমার

কাজ তুমি আমার জীবনের মাঝে সাধন করে নিয়ো—এ-ছাড়া দাসীর আর অন্য প্রার্থনা নাই আজ।···

ম্যানেজারবাবু এসে নমস্কারান্তে বললেন—আমায় ডেকেচেন রাণী-মা ?

অরুন্ধতী সুমুখে একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললে—অনেক কথা আছে—বসুন।

ম্যানেজার এর আগে,—এ ঘরে, রাণীর সম্মুখে কোনোদিনই আসন গ্রহণ করেননি, আজও করলেন না। আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

অরুন্ধতী বললে—খাজাঞ্চিবাবুকে একটিবার ডাকতে হবে।

ম্যানেজার ভিতরের ব্যাপার বুঝতে না পেরে অনেকখানি বিস্মিত হ'য়ে বারান্দা থেকে ডাক্‌লেন—খাজাঞ্চিবাবু! রাণীমা তলব করেছেন।···

ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—হঠাৎ সন্ধ্যেবেলায় খাজাঞ্চির তলব কেন মা ?···গণ্ডগোল হ'য়েছে কিছু ?···ক'দিন প্রজাদের সব দেখাশুনো করতে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে, খাতাপত্রগুলো দেখে উঠতে পারিনি।

অরুন্ধতী বললে—প্রজাদের কি দেখাশুনো করলেন ?—সবশুদ্ধ কতগুলো ঘর পুড়েছে ?

—তা একশোর কাছাকাছি।

—কাছাকাছি,···ঠিক জানেন না ?···কাল থেকে একবারটি গুণে দেখারও সময় পাননি ?···যাক্‌···আপনি যা আশঙ্কা করছেন,—সে-সব আমি ভাবিনি। আমার উদ্দেশ্য ব'লবো এখন।

খাজাঞ্চি এলেন।

অরুন্ধতী বললে—দৈনিক জমা-খরচের বইটা নিয়ে আসবেন তো। সামান্য একটুখানি কাজ আছে।

খাজাঞ্চি তাড়াতাড়ি খাতা হাজির করলেন।

অরুন্ধতী বললে—আজ পর্য্যন্ত আপনার সিন্ধুকে কত টাকা মজুত আছে ?

খাজাঞ্চি মশায় খাতাপত্র দেখে বললেন—এক হাজার তিনশো বারো টাকা সাত পয়সা।

—এ-টাকা মজুত ?···সিন্ধুক খুললেই পাওয়া যাবে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মা!—খাতার সঙ্গে তহবিল তো বরাবরই মিলিয়ে রাখা হয়।

অরুন্ধতী ভাবতে লাগলো

ম্যানেজারও ক্রমশঃই দুশ্চিন্তামগ্ন হচ্ছিলেন। অথচ আপন ত্রুটী কোথায়—তাও বুঝতে পারছিলেন না।

অরুন্ধতী বললে—খাজাঞ্চিবাবু! আপনি এখন যেতে পারেন।···

তারপর ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলে—এত কম টাকা হাতে র'য়েচে, কিন্তু শীগ্‌গীর আর-কিছু টাকা পাওয়ার ভরসা আছে কি ?—ব'লতে পারেন ?

—নকিপুর, সুন্দর-গঞ্জ, ডালিমহাট—এই কটা মহালে এখনো এক পয়সা আদায় হয় নি। নবগ্রামেও পাওনা আছে।

—আদায় করতে পারবেন ?

—সেখানে যেসব নায়েব-গোমস্তা আছে, তাদের ভরসায় থাকলে কাজ হবে না। আমাকে নিজে যেতে হবে।

—গিয়ে টাকার যোগাড় করতে পারবেন ?

—পারবো বইকি মা !···কিন্তু কত টাকা চাই আপনার ?

—হাজার আঠারোর কম নয়।

ম্যানেজার কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বললেন—পনের হাজার টাকা নিশ্চয় আদায় হবে।···মন্দির-প্রতিষ্ঠায় যে অসংখ্য টাকা ব্যয় হ'য়ে গেল। নইলে অনেক মজুত থাক্‌তো।

—যদি আদায় না হয়, তাহ'লে···কিন্তু আজ থেকে কত দিনের মধ্যে আপনি পনের হাজার টাকা দিতে পারেন ?

ম্যানেজার পুনরায় চিন্তা করতে লাগলেন।

অরুন্ধতী বললে—বেশ করে ভেবে বলুন। কথার নড়চড় হ'লে ভয়ানক অপ্রস্তুত হবো আমি।

ম্যানেজার বললেন—মাসখানেক সময় লাগবে মা! প্রায় পূজোর কাছাকছি টাকা নিয়ে ফিরতে পারবো।

অরুন্ধতী বিমর্ষ হ'য়ে ব'ললে—সর্ব্বনাশ!—অতদিন অপেক্ষা করা মোটেই চ'লবে না তো!···কিন্তু টাকা আমার চাই-ই।···বরং একটা মহাল মর্টগেজ রাখুন। আজ থেকে পাঁচ-সাত-দিনের মধ্যেই টাকা চাই।···টাকাটার যোগাড় হয়ে গেলে, আপনি বরং মহালে গিয়ে ধীরে-সুস্থে আদায় করবেন। তারপর ফিরে এসে সম্পত্তি ফিরিয়ে নেবেন।

ম্যানেজার বললেন—ক'লকাতা ছাড়া এতটাকা কেউ দিতে পারবে না মা।···আমি আজই উকীলবাবুকে চিঠি দিচ্ছি।

ব্যস্তভাবে অরুন্ধতী বললে—যা ভাল হয় করুন। টাকাটা আমার খুব শীগ্‌গীর চাই।

ম্যানেজার ভাবতে-ভাবতে বেরিয়ে চ'লে গেলেন।

অরুন্ধতী আলোটা কমিয়ে দিয়ে, স্তিমিত আলোকে ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়লো—অন্যের স্বার্থ না থাক, অন্ততঃ আমার স্বার্থের জন্যই আজ তোমাকে আমি সন্তুষ্ট করবো। নইলে আর পারি না যে!

এদিকে ম্যানেজারবাবু সোজা চ'লে গেলেন—রাইচরণের বাড়ীতে।

রাইচরণ এবং আরো জনকতক মাতব্বর প্রজা হরলালের কাছে ব'সে-ব'সে গল্প করছিল।

ঝড়ের মতই ম্যানেজার ঘরে ঢুকে বললেন—ভাইসব! তোমরা একটিবার বাইরে যাও তো! আমি ওঁর সঙ্গে একটা গোপন পরামর্শ করতে চাই।

সকলে বিস্ময়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগলো।

হরলালও বড় কম বিস্মিত হয়নি। কিন্তু সে কৌতূহল দমন করতে না পেরে সকলকে বাইরে যেতে বললে।

নির্জ্জন-ঘরে ম্যানেজার বললেন—হুজুর! উপদেশ দিয়ে সকল দিক রক্ষা করুন। নইলে সব যাবে—কিছু থাকবে না। রাণীর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।

হরলাল যেন আরব্যোপন্যাসের ঘটনায় ডুবে গেছে! বললে—ব্যাপার কি ম্যানেজারবাবু! কী হ'য়েচে?

করযোড়ে ম্যানেজার বললেন—হুজুর! আপনার বাপের বিষয়,... বোন্ হ'লেও, উনি তো আর আসল অধিকারী নন।...এত বড় রাজ-সংসার—দু'হাতে খরচ করলে আর ক'দিন টিকবে?...আমার ওপর হুকুম হ'ল—মহাল বাঁধা রেখে আঠারো-বিশ হাজার টাকা আনতে

হবে।······চাই-ই তাঁর। কিন্তু কেন তা কেউ জানে না! অথচ আমিই এষ্টেটের ম্যানেজার।

হরলাল গম্ভীরভাবে বললে—কিন্তু তিনি আপনার মনিব।

—ত্ব'শোবার তা স্বীকার করতাম হুজুর। কিন্তু আজকাল তাঁকে প্রধান বলে তো মানতে পারি না। যেদিন থেকে আসল মনিবের পরিচয় পেলাম—

কুপিত হ'য়ে হরলাল বলে উঠলো—আপনি ভুল করবেন না ম্যানেজারবাবু! আপনাদের প্রথম এবং প্রধান মনিব রাণী অরুন্ধতীদেবী। আপনাদের জমিদারীর ব্যাপারে আমি কখনো আসিনি, কোনো দিন আসতেও চাইবো না।

ম্যানেজার বললেন—কিন্তু আমার তো একটুও জানতে বাকী নেই হুজুর,—সম্পত্তি যে আপনারই পৈতৃক।

হরলাল চুপ ক'রে রইলো।

ম্যানেজার সাহস পেয়ে বললেন—একটা হিতাহিত বিবেচনা-শক্তি নেই, নিতান্ত খামখেয়ালি, কখন কি-ভাবে চলতে হয় জানেন না। ওঁর হাতে রাজ-সংসারের ভার থাক্‌লে—সর্ব্বস্ব নষ্ট হ'য়ে যাবে বাবু!... আপনাকে সেই জন্যেই সাবধান ক'রে দিতে চাচ্ছি।

হরলাল ভাবতে ভাবতেই সহসা বলে উঠলো—রাণীর ব্যবহারে আপনি সন্তুষ্ট নন?

—একটুও ন' বাবু—একটুও না। আমি একা নয়, আপনার রাজ-সংসারে যতগুলি লোক প্রাণ দিয়ে খাটে, তাদের একজনও তাঁর ব্যবহারে সন্তুষ্ট নয়।

—আমাকে কি করতে বলেন ?

—আপনি স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করুন। অরুন্ধতীদেবী স্ত্রীলোক, তাঁর অন্দরে বন্ধ থাকাই উচিত। রাজভগ্নী হ'য়ে তিনি রাজ্যভোগ না করতে চান, তীর্থধর্ম্ম ক'রে জীবন কাটিয়ে দিন। বিয়ের বয়েস তো আর নেই।

হরলাল বিরক্ত হ'য়ে বললে—থাক্...ও-সব কথা রাণীর কর্ম্মচারী হ'য়ে, তাঁর আত্মীয়ের সাম্‌নে বলা উচিত নয় ম্যানেজারবাবু!...তাহ'লে আপনারা কে-কে রাণীকে চান না

ম্যানেজার বললে—প্রত্যেকে। আপনার জিনিস, আপনি বুঝে নিন। চাকরদের হুকুম দিয়ে কাজ চালান্—আমরা এইটুকুই চাই।... দুঃখের কথা আর বলবো কি হুজুর! প্রাণ দিয়ে খেটে মরি, তবু উনি কথায়-কথায় কাজের কৈফিয়ৎ চান!

হরলাল গম্ভীর হ'য়ে বললে—এ তো মজার কথা! কাজের কৈফিয়ৎ চান! ম্যানেজারের কাছেও?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ম্যানেজার—আমার কাছেও। তাহ'লেই বুঝুন—নিম্নকর্ম্মচারীদের দুর্দ্দশা কত।

হরলাল বললে—আচ্ছা আপনি এখন আসুন। আমি এ-সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে দেখবো।

—যে-আজ্ঞে হুজুর!...কিন্তু চিন্তা ক'রে দেখার বেশী সময় নেই। কাল বাদে পরশু দিনই হয়তো মহাল মর্টগেজ পড়বে। আমি তাহ'লে কালই আবার আসবো।

—না-না, আপনি বরং আরো-একটা দিন পরে—পরশুই আস্‌বেন। আমার রোগা দেহ। বেশী ভাববার তো শক্তি নেই কিনা।

ম্যানেজার মনে-মনে খুসী হয়ে প্রস্থান করলেন।

রাত্রি অনেকখানি হ'য়ে গেছলো। হরলাল মানদাকে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি লিখতে জানো, মানদা?

—মানদা লজ্জিত হ'য়ে বললে—যা জানি, তাকে ঠিক জানা বলে না। কিন্তু কেন?

কাগজে গোটাকতক কথা লিখে, কাকাকে একটিবার রাণীর বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও তো।

কাগজ-কলম নিয়ে এসে মানদা বললে—কি লিখবো?

হরলাল বললে—লেখো—'হরলালবাবু আপনার দর্শনপ্রার্থী," আজ রাত্রেই আসবেন।' তারপর তোমার নাম লিখে দাও।···

রাত্রি তখন বারোটা।

অরুন্ধতী পাল্কী থেকে নেমে হরলালের শয্যাপার্শ্বে এসে বসলো।

জিজ্ঞাসা করলে—হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? দেহ ভালো আছে?

—হ্যাঁ রাণী, দেহ ভালোই আছে। ডেকে পাঠিয়েছি,—এই একান্ত অসময়ে,—দরকার বেশী বলেই।···ঘরে মানদা ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি নেই, মানদাকে আমরা আত্মীয় ভাবতে পারি অনায়াসে। সুতরাং তার সাক্ষাতেই সব কথা বলবো।

অরুন্ধতী উন্মুখ হ'য়ে বসে রইলো।

হরলাল বললে—আমার পরামর্শ নিয়ে তোমার বিষয়-সম্পত্তি চালানো

যদি সম্ভব হয় রাণী, তা হ'লে অবিলম্বে তোমার ম্যানেজারবাবুকে জবাব দাও।

—"সে কি!..." অরুন্ধতী হাঁ ক'রে চাইতে লাগলো।

হরলাল বললে—কেন জান্‌তে চেয়ো না।...আজ রাত্রেই তার নামে জবাব-পত্র লিখে দাও গে।

অরুন্ধতী ভয়ে-ভয়ে বললে—তারপর?—কাজ করবে কে?

—যার কেউ নেই তার তিনি আছেন।...কাজ তুমি করতে না পারো—তোমার ভগবান করবেন। সংসারে শূন্য বলে কিছু কি আছে অরুন্ধতী? এক যায় অন্য এসে তার ঠাঁই দখল করে।...ঐ একজন ছাড়া কি আর ভূ-ভারতে লোক থাক্‌তে নেই?

অরুন্ধতী চিন্তিতভাবে বললে—কিন্তু তাঁর তো দোষ খুঁজে পাই না।...আপনি কি পেয়েছেন বলুন?

হরলাল বললে—আমি যা দোষ পেয়েছি, তার মার্জ্জনা থাকা উচিত নয়। যেহেতু সে তোমার ম্যানেজার যার হাতে যথাসর্ব্বস্বের ভার, সে যদি তা অন্যের হাতে তুলে দিতে সংকল্প করে, তা হ'লে কৈফিয়ৎ তলপ করবারও আবশ্যক করে না রাণী,—অবিলম্বে তাকে দূর ক'রে দিতে হয়।

অরুন্ধতী বললে—লোকটা নিতান্ত হতভাগা!...কিন্তু কা'র হাতে তুলে দেবে?

—লোকজন ঠিক-ঠাক! সুযোগের অপেক্ষা শুধু।—কিন্তু আর-একটা কথার জবাব দাও রাণী!—আমাদের পূর্ব্ব পরিচয়ের রহস্য—ম্যানেজার জান্‌লে কেমন ক'রে?

—তার আসল মনিবকে চিনিয়ে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য,—সে-কর্ত্তব্য আমি পালন করেছি।

হরলাল ঈষৎ হেসে বললে—ও,…তাহলে মন্দ করোনি।…কিন্তু আমাকে এ-উপহাস কেন ?

অরুন্ধতী বললে—নবগ্রামের মাটীতে পা দেওয়ার পর থেকে এখনো পর্য্যন্ত আপনিই আমাকে উপহাস করে চ'লেছেন। হতভাগী অরুন্ধতীর এমন-কি দুঃসাহস আছে, যার জোরে সে আপনাকে উপহাস করতে সাহসী হবে ?

হরলাল ক্ষুব্ধভাবে বললে—এ তোমার অন্যায় অভিযোগ রাণী। কিন্তু আমার কথা শোনো, তাকে জবাব দাও।

দৃঢ় হ'য়ে অরুন্ধতী বললে—দোষটুকু ধরিয়ে না দিলে, বিনা দোষে আমি এত-বড় কঠিন শাস্তি তাকে দেব না—দিতে পারবো না।

হরলাল বললে—তোমার কল্যাণই আমি দেখতে চাই অরুন্ধতী ! তাই তো সময়-অসময় না বুঝে কত তিরস্কার তোমায় ক'রে আস্‌চি। আমি তোমার হিতৈষী, আমার অনুরোধ,—তাকে জবাব দাও।

—তা আমি দিতে পারবো না, আগে বলুন তার কি দোষ ?

—সে তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে।

অরুন্ধতী হেসে উঠলো। বললে—আপনার মাথা খারাপ হ'য়েচে। কব্‌রেজ মশায়কে ভালো রকম ওষুধ দিতে ব'লো মানদা ! নইলে হিতে বিপরীত হবে।…দেখুন হরলালবাবু ! ম্যানেজার যদি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রই করে, তো তারও সাজা সে আমারই দ্বারা লাভ করবে।…এত বড় সম্পত্তির নামে-মাত্র মালিক ক'রেও—সম্পত্তি চালাবার যোগ্যতা বাবা

আমাকে যথেষ্টই দিয়ে গেছেন। এ-যাবৎ তাঁর শিক্ষার অসম্মান আমি করি নি।...দোষীকে দণ্ড দেওয়ার শক্তিও আমি বাবার কাছেই লাভ করেছি। সুতরাং দুর্ব্বল অবস্থায় আপনি বৃথা চিন্তিত হবেন না।

হরলাল অরুন্ধতীর দৃঢ়তা ও ন্যায়পরায়ণতা দেখে মনে-মনে আনন্দিত হ'লেও বাইরে সেভাব প্রকাশ করলে না। বললে—আমার অনুরোধেও কি একাজ তোমার করা উচিত নয় রাণী? আমাকে এত মান্য দেখাও, এত স্নেহ-ভালোবাসা শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাও—তবু কি একাজ করতে পারো না?

শান্তভাবে অরুন্ধতী বললে—আপনার অনুরোধে,—নিজের টুটি কেটে দু'টুক্‌রো করতে পারি, সমস্ত সম্পত্তি—রাস্তার ভিখিরীকে বিলিয়ে দিতে পারি, কিন্তু বিনা বিচারে একজন নিরপরাধকে গুরুশাস্তি দিতে কখনই পারবো না। এ-অক্ষমতার জন্যে আমাকে মাপ করুন।

হরলাল বললে—সমস্ত সম্পত্তি রাস্তার ভিখিরীকে দিতে পারো? অথচ একটু আগেই বলেছ—সম্পত্তি আমার পৈতৃক।...

অরুন্ধতী সঙ্গে-সঙ্গে বললে—আমারও পৈতৃক। অধিকার সর্ব্বাগ্রে আমার, তারপর যদি আমি সম্মতি দিই—তবেই আপনার।

—নইলে নয়?

—কখনই না।

—কিন্তু ভুল করছো রাণী! অন্তর স্বচ্ছ হ'য়ে আসছিল, আবার তাতে কালি ঢাল্‌লে তুমি।

—জানি—অদৃষ্ট আমার নিতান্তই মন্দ।

—আমার পৈতৃক বিষয় তুমি এতদিন রক্ষা ক'রে এসেচ—এই কথাটাই একদিন বলো নি?

—এখনো তা ব'লছি।

—তবে ম্যানেজারকে জবাব দাও।

—কেন দেব? তার অপরাধটা না বললে—কেন জবাব দেব?

—বললাম তো—সে ষড়যন্ত্রকারী।

—কিন্তু আমি তা এখনো জান্‌তে পারি নি। আমাকে প্রমাণ সহ জানিয়ে দিতে হবে।

—সম্পত্তি যদি আমার হয়, ম্যানেজারও তো আমারই।

—তবে আপনিই তো জবাব দিতে অনায়াসে পারেন।

—কিন্তু কাগজে-কলমে তুমি মালিক।

—তবে তাই থাক্‌তে দিন। অনর্থক মাথা খারাপ করবেন না। আমি আজ থেকে এক মাসের সময় নিলাম, এর মধ্যে অপরাধ টের পেলেই তাকে সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিয়ে দেব।

হরলাল ভয়ানক গম্ভীর হ'য়ে উঠলো।

অরুন্ধতী বিমর্ষ হাসি হেসে বললে—হাতে-পায়ে আমার শিকল আঁটা, কি করবো বলুন? যদি গোড়া থেকেই দায়িত্ব মাথায় ক'রে বইতেন, তাহলে মেয়েমানুষ হ'য়ে আমাকে না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে সম্পত্তির ভাবনা ভাবতে হ'ত না।

হরলাল কতকটা যেন বিরক্ত হয়েই বললে—অসুস্থ দেহে বেশীক্ষণ বকাবকি করা উচিত নয় রাণী। আপাততঃ বাড়ী ফিরে যাও। আশীর্ব্বাদ করি—তোমার সুনিদ্রা হোক্।

অরুন্ধতী এবারও বিমর্ষ হাসি হেসে বললে—কিন্তু খালি আশীর্ব্বাদই করবেন?···অবাধ্যতার জন্যে অভিশাপ দেবেন না?

হরলাল অরুন্ধতীর পানে ফিরে চেয়ে বললে—সেটাও চাইছো না কি ? অভিশাপ চাও ?

—খুব চাই, সহস্রবার চাই। আপনার কাছ থেকে আশীর্ব্বাদের বদলে অভিশাপই আমায় বেশী ক'রে চাইতে হবে।

—তবে অভিশাপ দিচ্ছি—সম্পত্তির বোঝা নিয়েই তোমার জীবন কাটুক।

অরুন্ধতী দু'হাতে মুখ ঢেকে ব'সে রইলো।

হরলাল হাস্‌তে-হাস্‌তে বললে—তুমি তো অর্থই চেয়ে আস্‌চো রাণী, —পরমার্থকে দূরে ঠেলে রাখাই যে তোমার বিশেষত্ব !

অরুন্ধতী ক্রুদ্ধভাবে বললে—আপনি পিতৃদ্রোহী।

হরলাল জোরে হেসে উঠলো, বললে—কুৎসায় যার চারদিক ভ'রে গেছে, আত্ম-সান্ত্বনার জন্যে তাকেও মাথা ঘামাতে হয় রাণী !—তোমার এ ক্ষীণ প্রতিশোধ ; পিতৃদ্রোহী ব'লে আমাকে আমি যদি না ভাবি, তুমি আজ কী করতে পারো ?···কিন্তু আমার দেহ সুস্থ নয়—এ-কথা তোমার অবশ্যই জানা আছে। রাত শেষ হতে চ'ললো।

অরুন্ধতী উঠে দাঁড়িয়ে বললে—হ্যাঁ, আমাকেও আবার সুনিদ্রার আয়োজন করতে হবে কিনা।···আচ্ছা প্রণাম।···

অরুন্ধতীর প্রস্থানের পর, মানদা বললে—আমি যাঁকে মন্দ বলে জানতাম,—আজ তাঁকেই সব চেয়ে ভালো জান্‌লাম। রাণীর তুলনা নেই।

হরলাল কৌতুক ক'রে বললে—কেমন ক'রে থাক্‌বে বলো ?—উনি ছাড়া আরও কতকগুলো রাণী যখন এ-গাঁয়ে নেই, তখন তুলনা থাক্‌বে কেমন করে ?···কিন্তু তুমিও কি আজ রাণীর দলেই ভর্ত্তি হ'লে নাকি ?

মানদা বললে—দল তো তাঁর নেই। থাক্‌লে অবশ্যই হ'তাম বই কি।...কিন্তু মনে রাখবেন—রাণীকে দেহ খারাপের অজুহাত দেখিয়ে তাড়ালেন—সেটা আমি ভুলি নি। আর বক্‌তে পাবেন না। ঘুমিয়ে পড়ুন।

হরলাল বললে—কিন্তু তোমার রাণীজীর যে সুনিদ্রা হয় না।

—"সে আর এ-জীবনে হওয়া সম্ভব নয়।" বলে মানদা ঘরের আলোটা স্তিমিত ক'রে দিলে।

হরলাল স্মিতমুখে বললে—সুনিদ্রার আয়োজন হচ্ছে নাকি?

গম্ভীর হ'য়ে মানদা বললে—বাঁচতে হ'লে ওটা যখন দরকার, তখন বাদ দেওয়া তো চলে না।...তা ছাড়া আমি আর থাক্‌তে পারছি নি।

হরলাল মুগ্ধনেত্রে আধ-অন্ধকারের মধ্যেই মানদার অপরিসীম স্নেহ-ভালোবাসামণ্ডিত মুখখানার পানে চেয়ে রইলো।

আরো দু'সপ্তাহ পরে...

ম্যানেজার দূরবর্ত্তী মহালে আদায় করতে গেছেন। অন্য একজন কর্ম্মচারীর দ্বারা পত্র লিখিয়ে, অরুন্ধতী নিজেই পনের হাজার টাকা ক'ল্‌কাতার উকিলবাবুর সাহায্যে কর্জ্জ নিয়েছে কিন্তু সম্পত্তি মর্টগেজ রাখার প্রয়োজন হয় নি।

হরলাল এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু অরুন্ধতীর বাড়ীতে সে থাকে না, খায়ও না। রাইচরণের বাড়ীতে একান্ত আপনার-জনের মতই সে থেকে আস্‌চে।

গ্রামস্থ অধিবাসীদের ঘর-দোর কতক-কতক মেরামত হ'য়ে গেছে।

বাকী যা আছে, তা আপাততঃ হওয়া সম্ভব নয়,—পরে হবে। হরলালের পরামর্শ মত সকলেই এখন ভিন্ন-ভিন্ন গ্রাম থেকে ধান ও অন্যান্য শস্য মাথায় করে ব'য়ে আনে এবং তাই থেকে সংসার চালায়। আগামী বৎসরের শস্য পেলে এই গৃহীত ফসল দেড়গুণ-দ্বিগুণ দিলে তবে ঋণশোধ হবে। এই সব শস্য এতদূর থেকে আন্‌তে হয় যে, রাস্তাখরচ দিতেই এক একজনের ঘটি-বাটী বাঁধা পড়ে।...তথাপি আনতে হবে—কেননা—বাঁচা চাই।

তিনখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করে, আজ পাঁচ দিন হ'ল রাইচরণ দূরবর্ত্তী জেলা থেকে শস্য আনতে গেছে। বাড়ীতে তার স্ত্রী আর মানদা। অবশ্য হরলালও আছে।

আজকাল সুধাসমুদ্রের জলে গ্রামস্থ সকলের সমান অধিকার। অরুন্ধতী তার সভাপণ্ডিত ও পুরোহিত মশায়ের কথাকে অগ্রাহ্য করেই প্রজাদের মধ্যে এ-অধিকার দিয়ে রেখেছিল।...

...মানদা জলের কল্‌সীটা রান্নাঘরের দুয়ারে রাখতে-রাখতে দেখলে —হরলাল চাদর আর মোটা লাঠিগাছটা নিয়ে বেড়িয়ে যাচ্ছে।

মানদা বললে—বেলা হয়েচে। কিছু মুখে দিয়ে যান।...কিন্তু যেতে হবে কত দূরে? কাছাকাছি নিশ্চয়ই নয়?

হরলাল বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—কিসে বুঝলে?

—ঐ বাঁশখানা দেখে।...অবাক করেছেন কিন্তু...ওটা কি আবার একটা লাঠি না কি? যেমন মোটা তেমনি লম্বা।...দাঁড়ান, আমি কাপড় ছেড়ে খাবার দিচ্ছি।

হরলাল বললে—পেটে আর এতটুকু কিছু ধরবে না মানু!...রাধু-বিশ্বেসের বাড়ীতে সের-দুই কাঁচা দুধ গিলে এসেচি। কিছুতেই আজ

ছাড়লে না। বামুনের ছেলে হ'য়েও সন্ধ্যে-আহ্নিকের ধার তো ধারি নে, কাজেই 'না' বলতে পারলাম না।

মানদা বললে—তা বেশ করেছেন। কিন্তু লাঠিগাছটা রেখে ছাতাটা নিন্ না। এ-অঞ্চলে আপনার লাঠি ধরাটা কিন্তু বেজায় অন্যায়। পশুপক্ষী যাকে দেখলে মাথা নোয়ায়, সে শত্রু বলবে আজ কাকে?···যারা ভালো-বাসে তাদেরই অবিশ্বাস করতে হবে?

হরলালের হাত থেকে ভুম্ ক'রে লাঠিগাছটা মাটিতে পড়ে গেল। যুক্তি বটে মানদার!

মানদা তখন ঘরে ঢুকচে।···

হরলাল খানিকক্ষণ অপলক নেত্রে ঘরখানার পানে চেয়ে-চেয়ে উচ্চকণ্ঠে বললে—তা হ'লে ছাতিটাই বের করে দাও মানু। বেলা যে দুপুর হ'তে চললো।

রাইচরণের স্ত্রী ছাতা বের করে দিলে। মানদা তখনো ঘরে ছিল। সেখান থেকেই জিজ্ঞাসা করলে—কতদূর যাবেন?

হরলাল বললে—গাঁয়ে তো লোকজন নেই, সব গেছে ধান আনতে। কে কোন্‌দিন ফিরবে তারও ঠিক নেই। পাশাপাশি রঘুনাথপুর আর মোল্লাপাড়ায় ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছে। কতকগুলো শিউলিপাতা দিয়ে আসি।

মানদা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অত্যন্ত বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলো—ওমা!—এই এত বেলায় রঘুনাথপুর—মোল্লাপাড়া যাবেন! শিউলিপাতা কি ও-গাঁয়ে মেলে না?···তা ছাড়া জ্বর হ'য়েচে—অন্য ওষুধ খায় না কেন?

—অন্য ওষুধ তো কুইনিন্!···কিন্তু আমি রতন কব্‌রেজ মশায়কে কুইনিন আমদানি করতে দিব্যি দিয়ে রেখেচি। দিশী গাছ-গাছড়া খেয়েই রোগ সারবে। আমরা যে-দেশের মানুষ, সেই দেশের জল-হাওয়া আর গাছ-পালাই যে আমাদের বেশী আপন মানদা!...কিন্তু ওদের ওখানে শিউলি-গাছ যে একটাও নেই—তা এইমাত্র রাধুর বাড়ী দুধ খেতে-খেতে শুনে এলাম। কব্‌রেজ মশায় বললেন—কুইনিনের বদলে শিউলিপাতার রস দিয়ে বড়ি দিয়ে এসেচেন, অথচ গাঁয়ে তা মেলে না।

মানদা ঈষৎ চিন্তিত হ'য়ে বললে—এ-গাঁয়েও বোধ হয় নেই।··· কই দেখিনি তো।...রাজবাড়ীর বাগানে গোটাকতক আছে, কিন্তু ফুলের সময়, পাতা ছিঁড়তে দেবে না। আজকাল স্থলপদ্ম আর শিউলি-ফুল দিয়েই জগন্নাথের পূজো হয় কিনা। অন্য ফুল কি-ই বা আছে।

হরলাল ছাতাটা ধীরে-ধীরে হাত থেকে নামিয়ে মাটীতে রেখে দিলে এবং প্রকাণ্ড লাঠিগাছটাই হাতে তুলে নিলে।

মানদা বিস্মিত হ'য়ে চাইতেই, হরলাল বললে—ঠিক জানো রাজবাড়ীর বাগান ছাড়া আর-কোথাও শিউলি গাছ নেই?

—সেই রকমই মনে হচ্ছে। কিন্তু লাঠি নিয়ে চল্‌লেন যে? আবার মারা-মারি করবেন না কি?

—বিচিত্র কি আছে মানু? ভোজপুরী দারোয়ান তো সেখানে পাহারা দেয়?

মানদা হাসতে-হাসতে বললে—কিন্তু বাগানের মালিক তো সে নয়। মালিকের হাত দুটো আপনার পায়ের কাছে পাতা,···দারোয়ানের সাধ্যি কি?···লাঠি রেখে যান।

—"নাঃ" বলে হরলাল লাঠি নিয়েই বেরিয়ে পড়লো।......

বাগানের ফটকে দারোয়ান ছিল না—ছিল মালী। সে হরলালকে চিনতো না। ভাস্কর-পরিচয় ভিন্ন নবগ্রামের অধিকাংশ লোকেই হরলালের আসল পরিচয় এখনো জানে না।

মালী পথ রোধ করলে।

হরলাল বললে—পথ ছাড়ো, আমাকে একটা ওষুধের গাছ নিতে হবে।

মালী জানালে—রাণীমা স্বয়ং বাগানে রয়েচেন, সুতরাং অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

হরলাল ঊর্দ্ধে চেয়ে দেখলে—মেঘহীন আকাশে সূর্য্যের কী তপ্ত ভাতি!...বেলা আরো বেড়ে উঠলে, ভিন্নগ্রামে যাওয়া কষ্টকর হবে, বিশেষতঃ তার শারীরিক অবস্থা এখনো সামান্য দুর্ব্বল। হাতের লাঠিখানা মালীর মাথার উপর তুলে ধ'রে বললে—গুঁড়িয়ে ছাতু বানাবো। ভাল চাও তো পথ ছাড়ো।

উড়িষ্যাবাসীর সাহস আর টিকলো না, সে ভয়ে পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়ালো।

হরলাল সোজা বাগানের মধ্যে ঢুকেই যে-দৃশ্য দেখ্‌লে, তাতে তার বিস্মিত চোখ্ দুটো আর কোনোরকমেই অন্যদিকে নজর রাখতে পারলে না।

সদ্যস্নাতা, কৌষেয়-বস্ত্র পরিহিতা, আলুলায়িত-কুন্তলা কুমারী অরুন্ধতী একনিবিষ্ট হ'য়ে শেফালিকা-কুঞ্জতলে ব'সে মালা গাঁথচে। তার দৃষ্টি একাগ্র, হরলালকে সে দেখতে পেলে না।

হরলালের চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল!…এ-যেন বনদেবীর বনফুলহার-রচনা! পাশে তার স্তূপীকৃত শিউলিফুল জমা হ'য়ে র'য়েচে।

সমস্ত শিউলিগাছগুলো এক জায়গায় হ'য়ে একটা সুনিবিড় কুঞ্জ সাজিয়ে রেখেছিল। সুতরাং স্বকার্য্য সাধন করতে গেলে, অরুন্ধতীকে ডাকতেই হবে,—তাই হরলাল অনুচ্চ অথচ অতি স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকলে—অরুন্ধতী!

অরুন্ধতীর হাতে ছুঁচ ফুটে গেল!…একটা যন্ত্রণাসূচক 'উ' শব্দ করে সে হরলালের পানে চেয়েই ভীত হ'য়ে উঠলো।…এ-কী মূর্ত্তি!

ব্যগ্র হ'য়ে জিজ্ঞসা করলে—আপনার হাতে লাঠি কেন?

হরলাল এ-কথার উত্তর না দিয়ে, ধীরে-ধীরে অরুন্ধতীর সমীপবর্ত্তী হ'য়ে বসলো, তারপর বললে—স্নান ক'রে পবিত্র হ'য়ে র'য়েচ,—কিন্তু আঙুলটা যে ফুটে রক্ত ঝরচে!…ছুঁলে দোষ নেই তো?

অরুন্ধতী মাথা নেড়ে বললে—জগন্নাথের মালা গাঁথছিলাম। এ-সময় না ছোঁয়াই ভালো। কিন্তু হাতে লাঠি কেন?

হরলাল হেসে বললে—তোমার ভোজপুরীদের ভয়ে! আত্ম-রক্ষার্থে! …কিন্তু তোমাকে যে একবার উঠতে হবে রাণী।

অরুন্ধতী বিস্মিত হ'য়ে চাইলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে—কোনো কাজ আছে?

—হ্যাঁ, আমি ঝুড়িখানেক শিউলিপাতা নেব। সুতরাং ঠাঁইটুকু ছেড়ে না দিলে আমি তো কাজ সুরু করতে পারবো না।

বিপুল-বিস্ময়ে অরুন্ধতী ব'লে উঠলো—এই কাজ? আমি বলি অন্য-কথা আছে। কিন্তু একঝুড়ি পাতা নিলে, এ-গাছে আর ফুল

ফুটবে না তো। অথচ শিউলিফুল ছাড়া পূজোর ফুল আর পাওয়া যায় না।

হরলাল গম্ভীর হ'য়ে বললে—তোমার মুখ থেকে এই কথাটাই আমি শুনবার আশা রেখেছিলাম। কিন্তু খেলা করবার সামগ্রী যোগাড় করতে আসি নি আমি। এসেচি—ওষুধ খাওয়ার অনুপান যোগাড় করতে। ঘরে-ঘরে ম্যালেরিয়া, না দিলে চলবে না রাণী। যাদের ফুল-বাগান নেই, তারাও ঠাকুরপূজো করে। তুলসীপাতাই নারায়ণ-পূজোর পক্ষে যথেষ্ট, ভক্তি যার মনে আছে—

অরুন্ধতী বললে—ভক্তি-মুক্তির কথা আমি শুনতে চাইছি না। আপনাকে বলছি—আপনি যত খুসী শিউলি-পাতা নিয়ে যান।...কিন্তু একটা কথা বলতে হবে—নবগ্রামের মধ্যে কারুর তো জ্বর-জ্বালা হ'য়েচে বলে সংবাদ পাই নি।

হরলাল বিদ্রূপের সুরে বললে—সংবাদ যদি রাখতে, তাহলে অবশ্যই পেতে রাণী।...কিন্তু নবগ্রাম ছাড়াও তো তোমার অন্যগ্রামে অনেক প্রজাই বাস করে। তাদের সংবাদটাও তোমাকেই রাখতে হবে। এখন বেশী কথার সময় নেই,...বেলা বেড়ে চ'লেছে।

অরুন্ধতী তার ফুলের রাশ নিয়ে অন্যত্র বসলো। হরলাল একরাশ শিউলি-পাতার যোগাড় ক'রে বললে—চল্লাম।

অরুন্ধতী বললে—আমার একটা অনুরোধ আছে।

হরলাল বললে—বিকেলে শুনবো। কিন্তু রাণীজী কি জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রা—তিনজনকার জন্যে তিন-তিনটি মন্দির গাঁথবে নাকি?...দেখলাম শতাবধি লোক ইট তৈরী করছে।...তা

মন্দ নয়, অনেকগুলো লোক অজন্মার দিনে খেয়ে বাঁচবে। আচ্ছা চল্‌লাম।

—বিকেলে দেখা পাবো ?...আস্‌বেন তো ?

—"আস্‌বো—" বলেই হরলাল আর দাঁড়ালো না।

অরুন্ধতী মালা গাঁথা বন্ধ ক'রে রেখে,—ভাবতে বসলো—দীনহীন হ'য়েও যে রাজাধিরাজ, তার পদধূলির যোগ্য সে কেমন ক'রে হ'বে।...

ভাবতে-ভাবতেই হাতের ফুল ও ফুল-মালা গুছিয়ে নিয়ে, সে ঠাকুরবাড়ীর দিকে রওনা হ'য়ে গেল।

ঠাকুরবাড়ীর পুরোহিত বললেন—ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুর আজ অনেক রকম শাপ-শাপান্ত করছিলেন রাণী-মা!...তাঁকে পঁচিশ বিঘে নিষ্কর জমি দেওয়ার কথা ছিল,—অথচ তিনি আজো সেটা পেলেন না।

অরুন্ধতীর মন পূর্ব্ব থেকেই ঈষৎ উত্তপ্ত এবং ক্ষুণ্ণ ছিল,—পুরোহিতের কথায় বললে—পান্ নি ব'লে শাপ-শাপান্ত করছিলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—"তাহ'লে শাপ-শাপান্তই করতে বলুন। দেখি,—শাপের ফল কতদূর দাঁড়ায়।...অন্য প্রজাকে উচ্ছেদ ক'রে তাঁর অধিকার স্থায়ী করতে আমি পারবো না ঠাকুর! ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুরকে এই কথাই আপনি আমার হ'য়ে জানিয়ে রাখবেন।" বলেই অরুন্ধতী আর দাঁড়ালো না। উত্যক্ত হ'য়ে জগন্নাথদেবকে সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম করতেও সে ভুল করলে আজ।...

...মধ্যাহ্ন-আহার অসমাপ্ত রেখে, অরুন্ধতী ম্যানেজারের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে—করোগেট্ এসেচে ?

—আজ্ঞে চিঠি পেয়েছি,—কাল-পরশু এসে পড়বে।

—ম্যানেজারবাবুর চিঠি বা টাকাকড়ি এলো ?

—না। এক পয়সাও আদায় হচ্ছে না।

—তাঁকে লিখে দিন—আদায় করতে না পারেন, সদরে ফিরে আসুন। মিছি-মিছি সেখানে থেকে লাভ নেই। এখন এখানকার কাজ নিত্যি-নতুন। সাম্‌লে ওঠা ভার।...আমি আর স্বতন্ত্র পত্র দেব না,—আমার হ'য়ে আপনিই সব কথা তাঁকে লিখে পাঠাবেন।...আর এক কাজ করুন, কল্‌কাতায় অন্ততঃ দু'শো টাকার কুইনিন পাঠাতে চিঠি লিখুন। খুব শীগ্‌গীর আসে যেন।

কর্ম্মচারী সকল বিষয়েই আনুগত্য জানিয়ে চ'লে গেল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কাছারী বাড়ী-থেকে সংবাদ এলো—ভাস্কর রাণীমার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

অরুন্ধতী অন্তরের হাসিটুকু মুখে প্রকাশ না ক'রে, সসম্মানে ভাস্করকে তার খাস-কামরায় নিয়ে আসতে চাকর পাঠিয়ে দিলে।...

হরলালকে উপযুক্ত আসনে বসিয়ে অরুন্ধতী বললে—আপনি কি বহুরূপী?...এখনকার বেশটা তো অন্য রকমের দেখছি। এমন সেজে-গুজে—

গম্ভীরভাবে হরলাল জবাব দিলে—আমি আজ ক'ল্‌কাতা চললাম রাণী।

রাণী গাঢ় বিস্ময়ে বললে—আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। নবগ্রামের প্রজারা আজ বিপন্ন,—রঘুনাথপুর, মোল্লাপাড়ায় ম্যালেরিয়া,—এ-অবস্থায় ক'ল্‌কাতা যাওয়া অন্য লোকের পক্ষে অসম্ভব না হ'তে পারে, কিন্তু আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আপনাকে দুনিয়ায় আমি যেমন চিনি, তেমন চেনা কেউ তো চেনে না।

হরলাল মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলো।

অরুন্ধতী বললে—হাসবার কথা একটুও বলিনি, সত্যি আমার চেয়ে আপনাকে বেশী ক'রে কেউ চেনে ?

হরলাল বললে—আমি তা কোনোদিনই অস্বীকার করি না রাণী। কিন্তু নবগ্রামের প্রজারা তো আমারই প্রজা নয়, যে আমি আপন কাজ নষ্ট ক'রে তাদের মুখ চেয়ে বসে থাক্‌বো ?

অরুন্ধতী বললে—যাদের মুখ বলে এক-কথা আর অন্তর বলে অন্য কথা, তাদের কি হয় জানেন ?

—"জানি, সম্ভবতঃ অনন্ত নরক।" বলেই হরলাল জোরে-জোরে হাসতে লাগলো। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে বললে—ভেবো না যে, পাপ বিদেয় হচ্ছে। দু'দিন কি বড় জোর তিনদিন, এর বেশী দেরী হবে না, আবার ফিরে এসে যেমন জ্বালাচ্ছি, তেমনি ক'রেই তোমায় জ্বালাবো।...কিন্তু নেড়া বেলতলায় দু'বার যায় না,—নতুন মন্দিরের জন্যে হরলাল-ভাস্কর আর বিগ্রহ তৈরীতে রাজী হবে না।—মনে থাকে যেন।

অরুন্ধতী কৌতুকের সুরে বললে—হিঁদুর ঘরে—ব্রাহ্মণের ঘরে বারোমাস-তিরিশ দিনই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে,—হরলাল-ভাস্করের দু'টো হাতের কি-এম্‌নি শক্তি যে, তাকেই সব করতে হবে ?—তা ছাড়া ভাস্করের সম্মান দিয়ে আমিই তাকে নিয়ে এসেছিলাম—নইলে এত বড় কাজ সে পেত' কোথায় ?—কে তাকে চিন্‌তো ?

কিন্তু হঠাৎ অরুন্ধতী কথার সুর ফিরিয়ে ফেল্‌লে। অত্যন্ত করুণ-কণ্ঠে বলে উঠলো—যার কেউ থাকে না—শুনেছি তার ভগবান থাকেন, কিন্তু আমার বোধ হয় তিনি নেই, আজকের দিনে—

কথার মাঝখানেই হরলাল ব'লে উঠলো—মুখে এক আর ভেতরে অন্য থাক্‌লে যা হয়, তা তোমারই হবে রাণী, আমি রেহাই পেয়ে গেছি!··· ভগবানকে নিজস্ব ভেবে ইজারা ক'রে মন্দিরে তালা-চাবি দিয়ে রেখেচ, অথচ অম্লানমুখে বলে যাচ্ছ—তোমার কাছে তিনি নেই!···পাপ হবে রাণী, জিভ্‌টা খ'সে প'ড়ে যাবে।

অরুন্ধতী উদাস-দৃষ্টিতে হরলালের পানে চাইতে লাগলো। হরলাল দেখলে—রাণীর গণ্ডে দরবিগলিত-নয়নধারা ঝরচে! বললে—আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি অরুন্ধতী!

অরুন্ধতী আর কান্না চেপে রাখতে পারলে না।

হরলাল বললে—কান্না জিনিসটা হাসিরই রূপান্তর,—অন্ততঃ আমার তাই বিশ্বাস।···কিন্তু আমার যে সময় হ'য়ে এলো,—আর তো অপেক্ষা করতে পারবো না।

অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা করলে—হঠাৎ ক'ল্‌কাতায় চ'ল্‌লেন কেন?

হরলাল স্মিতমুখে বলে উঠলো—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' জননী তো অনেককাল চলে গেছেন, জন্মভূমিকে অনাদর করলে যে সত্যিই অন্তে অনন্ত-নিরয়ের ব্যবস্থা হবে।—মন বড় অস্থির হয়েচে তাই···

অরুন্ধতী মাথা নত ক'রে বললে—আমায় সঙ্গে নেবেন?

—"কেন বল তো?···তোমার এ-ঝোঁক্‌ হ'বার কারণ?" বলে হরলাল বিপুল পরিতৃপ্তিতে অরুন্ধতীর মুখপানে নির্নিমেষে চেয়ে রইলো।

অরুন্ধতী আস্তে-আস্তে বললে—মনটা এতই অবুঝ, কিছুতেই মানা শোনে না,—নইলে আপনার ওপরেও অভিমান করতে চায়!···অথচ দাবী সেখানে এতটুকু নেই!···

—কিন্তু ক'ল্‌কাতায় যাবার ঝোঁক হ'ল কেন ?

—সে-কথা আর কি করে' ব'লবো ? মানুষের মন নিয়ে যে ধূলো-খেলা ক'রে, তার কাছে মনের আদর কতখানি ? নইলে আমারও যে জন্মভূমি আছে—

হরলাল হেসে উঠলো।

অরুন্ধতী বললে—হাসিটুকুও ঠিক মানান-সই হ'য়েচে। একটা অবলা স্ত্রীলোকের ওপর এমন সুন্দর সুবিচার বোধ করি তুনিয়ায় আর কেউ কোনোদিন করে নি!

হরলাল প্রশান্তভাবে বললে—রাগ ক'রোনা রাণী। ভগবানের বিধানে হাজার মাথার ভার তোমার মাথায় চেপেছে, সুতরাং তোমার স্বাধীনতা কোথায় ? প্রজার কষ্ট তত বেশী নয় রাণী,—রাজার কষ্ট যত। প্রজা খাজনা দিয়ে আর রাজভক্তি দেখিয়েই খালাস পেতে পারে, কিন্তু রাজাকে প্রজার জন্য অনিদ্রা-অনাহারে কষ্ট পেতে হয়, বিশ্বস্ত সেবকের মতই তার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হয়। রোগশয্যায় প'ড়ে সন্তান শুধু রোগের ব্যথাই সহ্য করে, কিন্তু জননীকে সেবা-শুশ্রূষা থেকে সুরু ক'রে ভাবি-বিচ্ছেদের আশঙ্কাও পলে-পলে সইতে হয়।...তুমি রাণী, শত-সহস্র দীনের তুমি মা, তোমার সুখ কোথায় রাণী ? 'যাবো' বললেই কি তুমি যেতে পারো ?...শ্রীকৃষ্ণ—দ্বারকার রাজা হ'য়ে মথুরার কথা ভুলে গেছলেন কি সাধ ক'রে ?

অরুন্ধতী মুগ্ধ-নয়নে চেয়ে রইলো।

হরলাল বললে—আসি তবে অরুন্ধতী। সময় হ'য়ে এলো।

অরুন্ধতী খুব ভয়ে-ভয়ে বললে—গাড়ী ক'রে যান। খুব ভালো গরুর গাড়ী আছে, একঘণ্টায় পৌঁছে দেবে।

করুণ হাসি হেসে হরলাল বললে—তুমি বোধ হয় জানো না রাণী, যে আমি সকল রকম বিলাসিতা ত্যাগ ক'রেছি। সুতরাং গরুকে কষ্ট দিয়ে, তাঁর কাঁধে চেপে যাওয়ার স্পৃহা আমার নেই।—বলেই আর সে দাঁড়ালো না।

অরুন্ধতীর ঠোঁটের আগায় বেরিয়ে এসেছিল—"আর একটা কথা শুনে যান্—" কিন্তু হরলাল শুন্‌তে চাইলে না।...

তেইশ

দিন পনের পরে···

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় হরলাল ক'ল্‌কাতার ট্রেণ থেকে নেমে ষ্টেশনের দূর-পথ দ্রুত চ'লে এসে যখন নবগ্রামে প্রবেশ করলে—তখন সারা গ্রামই সুপ্তিমগ্ন।

দূরের সুউচ্চ মন্দির-তোরণে দপ্ দপ্ ক'রে একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল্—যেন শুক্লা একাদশীর চাঁদের আলোর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণায় প্রস্তুত হচ্ছে। অথচ জ্যোৎস্না তাকে গ্রাহ্য করে না। উদার-অনন্ত অম্বরতলে তার এলায়িত দেহের বিস্তৃতি আর সুপ্ত:ধরার পরে তার রজত-অঞ্চল দিকে-দিকে ছড়ানো।

যুক্তকরে হরলাল প্রণাম করতে করতে বললে—হে জগন্নাথ!

তোমার সেবিকাকে বিশ্ববাসীর দরদী ক'রে দাও,...গণ্ডীবদ্ধ আকাঙ্ক্ষা তার ভুবনের ভবনে-ভবনে ছড়িয়ে পড়ুক—সুন্দর হ'য়ে, সুমহান হ'য়ে!

কিন্তু আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য!...

হরলাল গ্রামে ঢুকতে-ঢুকতে দু'পাশের ঘর-বাড়ীগুলো দেখে, আর অসম্ভব বিস্ময়ে শিউরে ওঠে!...মরা-মানুষ প্রাণ পেয়ে ফিরে আসার কথাও সে বিশ্বাস করলে করতে পারতো,—কিন্তু এ-কী অঘটন ঘটেচে! গ্রামবাসীদের যত ঘর অগ্নিকাণ্ডের পর সংস্কার অভাবে পড়ে ছিল, এবং যা মেরামত না করার দরুণ ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হ'য়েছিল—সমস্তই করোগেটের ছাউনি দ্বারা সুসংস্কৃত হ'য়ে গেছে! অনেকের ফটকবিহীন বাড়ীতে কপাট লাগানো হ'য়েচে এবং বন-জঙ্গলের কুত্রাপি চিহ্ন নাই, তা ছাড়া রাস্তাঘাটও প্রশস্ত এবং সুন্দর করা হ'য়েচে।

রজত-জ্যোৎস্নাধারা-সিক্ত অধিকাংশ গৃহের করোগেটগুলো ঝক্-ঝক্ ক'রে জ্বলচে। সাত-আট দিন পূর্ব্বে যেসব আবর্জ্জনাময় অপরিসর পথ রাত্রিকালে পথিকের বুকখানা শঙ্কাকুল ক'রে তুল্‌তো,—তা আজ সুপরিচ্ছন্ন রাজপথ! হরলাল চলে আর চল্‌তে-চল্‌তে থামে!...এ-কী বিপুল বিস্ময়াবেগ!...অধুনা লুপ্ত-গৌরব—আলাদীনের আলোটাই কি তবে হঠাৎ জঙ্‌লা দেশের বুকে উল্লাসের তুফান তুলে দিয়ে গেছে! না ঘুমন্ত রাজপুরীর বদ্ধ দুয়ার দু'হাতে ভেঙে ফেলে ঘুমন্ত রাজকন্যা তার সোনার কাঠি হাতে পথে-পথে ছুটে বেরিয়েচে!

রাইচরণের বাড়ীর সুমুখে এসেও, হরলাল সাহস ক'রে কারুর নাম ধ'রে ডাক্‌তে পারছিল না। বাড়ীখানা যে চেনাই যায় না!

হরলাল মনে-মনে বললে—অরুন্ধতী! এই কল্যাণের মূলে যেন

তোমারই মঙ্গলকরের স্পর্শ থাকে! ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে আজ এইটুকুই আমার শ্রেষ্ঠ কামনা। তারপর অনুচ্চকণ্ঠে ডাক দিলে—রাইচরণ কাকা!

—"যাচ্ছি"—

হরলাল স্পষ্টই বুঝতে পারলে—এ-স্বর রাইচরণের নয়—মানদার।

বাড়ীর নাতিবৃহৎ নতুন ফটক খুলে প্রদীপ-হাতে মানদা এসে দাঁড়ালো।...যেন মঙ্গল-প্রদীপের আলোয় আজ অতিথির একাগ্র অভিনন্দন!

হরলাল বাড়ী ঢুকে, স্বহস্তে দরজা বন্ধ করতে-করতে বললে—কাকা ফিরে আসেনি?

মানদা ঘরে ঢুক্‌তে-ঢুক্‌তে বললে—এসে আবার চলে গেছে।

—কোথায়?

—দফরপুরে।

—সেখানে কেন?

—রাণীর হুকুমে।···কাকাকে রাণী সেখানকার নায়েব ক'রে পাঠিয়েচেন।···কিন্তু সব কথা পরে শুনবেন—এখন হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করুন।...আমি খাবার ঠিক ক'রে আনি।

হরলাল অশেষ কৌতূহল কোনো-প্রকারেই চেপে রাখতে পারছিল না। বললে—খাবার পরে হবে মানু! আগে বলো গাঁ-খানার এ-অবস্থা কে করলে? গরীব পল্লীর বুকে এমন নতুন সজীবতা কে দিলে?

মানদা ধপ্ ক'রে ঘরের মেঝেয় ব'সে পড়লো। ক্লান্তস্বরে বললে—সবই রাণীজির দয়ায়। আপনি যেদিন চলে গেলেন তার পরের দিন

থেকে দলে দলে লোক-জন এসে দিন-রাত খেটে-খেটে সব তৈরী ক'রে দিয়েছে। আমরা আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি—এত শীগ্‌গীর সব কাজ কেমন ক'রে হ'ল।...রাণীজির যা উৎসাহ দেখলাম!...জীবনে কোনোদিন তা দেখি নি।

হরলালের বুকখানা হর্ষের আতিশয্যে ফুলে উঠলো।...চিরজীবি—চিরজয়ী—চিরকল্যাণময়ী হও রাণী! তুমি সত্যসত্যই মহারাণী হও।

মানদার সারা দেহটা একখানা সাদা চাদরে আবৃত ছিল। মাথাটা নীচু ক'রেই সে বললে—হাত-মুখ ধুয়ে ফেলুন।

হরলাল মানদার মুখপানে চেয়েই বিস্মিত হ'য়ে উঠলো! জিজ্ঞাসা করলে—তোমার চেহারা এমন কেন? অসুখ করেছিল? মুখখানা শুক্‌নো-শুক্‌নো দেখাচ্ছে যে?...এই গরমে চাদর ঢাকা দিয়ে রয়েচ,—কি হ'য়েচে মানু?

মানদা মুখ নামিয়ে বললে—ও কিছু না, আপনি হাত-মুখ ধুয়ে নিন্।—বলেই সে রান্নাঘরে চলে গেল।

হরলাল হাত-মুখ ধুয়ে এসে শুভ্র বিছানায় বসে-বসে ভাবতে লাগলো—এমনভাবে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে লড়াই জিততে বোধ হয় আর কেউ কোনোদিন পারেনি, আজ অরুন্ধতী যেমন ক'রে পারলে।...এ-যে নিঃশব্দে—নির্লিপ্ত সমারোহে আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয় জয়!

মানদা খাবারের থালাখানা মেঝেয় নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলে—বিছানার ওপর বসে খাবেন নাকি?

ইতিমধ্যে রাইচরণের স্ত্রী আসন পেতে ঠাঁই ক'রে দিয়ে গেছলো।

হরলাল থালার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—একি মানু!—লুচি—তরকারী—মাছের কালিয়া—ভাজা...এত!—আমি তো আসবো বলে

কোনো খবর দিই নি! তা ছাড়া দেশের লোকে কৃষি-ঋণের জন্যে পাগল হ'য়ে ছুটে বেড়াচ্ছে—চার-চাকলায় অজন্মা, এক-ছটাক ফসল হয় নি—অথচ রাত-দুপুরে এই রাজভোগ তোমার ঘরে!

মানদা ধীর কণ্ঠে বললে—রাণীর কল্যাণে এ-গাঁয়ের আর কারুর কোনো অভাব নেই। কৃষি-ঋণ তো হাজারে-হাজারে দেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া কাকাকে তিনি বড় চাকুরি দিয়েছেন, আমাদের খোঁজ-খবর চব্বিশ ঘণ্টাই নিয়ে থাকেন।···আমাদের বাড়ী আসা তো তাঁর একদিনও কামাই নেই কিনা।···কিন্তু ভোর হ'য়ে এসেচে, আর দেরী করবেন না।

হরলাল আসনে বসে বললে—এত সব খাবার তৈরী করেছ, আমি যদি না আসতাম!

মানদার দেহ ক্রমশঃ ক্লান্ত হ'য়ে আসছিল, তবু সে হাসিমুখে বললে—ভালোই হ'ত, আমরা খেয়ে বাঁচতাম। কতকাল এমন খাবার পেটে পড়েনি।

হরলাল খেতে সুরু ক'রেই হঠাৎ দেখতে পেলে সুমুখের 'তাকে' একটা ওষুধের শিশি, তাতে আধ শিশি লাল রঙের ওষুধ, আর তারই পাশে একটা সরু কাচের নলে অনেকগুলো কুইনাইনের বড়ি। জিজ্ঞাসা করলে—ও-সব কার জন্যে?···কাকীমার না তোমার?···কিন্তু চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন তোমারই!···

মানদা মাথা হেঁট করলে, কথা কইলে না।

হরলাল বললে—পুরুষগুলো কত বড় স্বার্থপর হয় দেখতে পাচ্ছো তো?···অসুখ হ'য়েচে নড়তে পাচ্ছো না, তবু তোমাকে খাটিয়ে-খাটিয়ে নিজে সেবা ভোগ করছি।

—বেশ করছেন।···রাত-দুপুরে বকর-বকর ভালো লাগে না কিন্তু। শীগ্‌গীর খেয়ে নিন। ঘুমে আমার চোখ জুড়ে আস্‌চে।

—তুমি ঘুমোও না। আমি থালাখানা গুছিয়ে ঢেকে রাখবো। শোও গে, যাও।···কিন্তু জ্বর হ'য়েচে ক'-দিন থেকে?

মানদা তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—ও কিচ্ছু না। দিন-দুই হ'য়েছিল একটু-আধটু। আপনা-আপনি সেরে গেছে।

—ওষুধ আন্‌লে কে?

—রাজবাড়ীতে নতুন একজন ডাক্তারবাবু এসেচেন। তিনি গাঁয়ের ঘরে-ঘরে ঘুরে বেড়ান। অসুখ হোক্ আর না হোক্ ওষুধ যেন দিতেই হবে।···পয়সা লাগে না কিনা! তা ছাড়া মোটা মাইনে খাচ্ছেন,—কাজ দেখাতে হবে তো।

হরলালের মুখখানা হর্ষ ও গাম্ভীর্য্যের সংমিশ্রণে নতুন এক শ্রী ধারণ করলো।

বললে—তোমার যখন সত্যিই জ্বর হ'য়েছিল, তখন ওষুধটা না খাওয়া অন্যায় হয়েচে।

মানদা বললে—রাণীদিদিও তাই বলছিলেন, কিন্তু আজ দুপুর-বেলায়, এক-কথাতেই তাঁর মুখ বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

হরলাল হাসতে লাগলো।

মানদা কুপিত হ'য়ে বললে—আপনার তো কথায়-কথায় হাসি। নিজের বেলায় ঠিক আছেন, পরের বেলাতেই ঠাট্টা! বিলিতি ওষুধ আপনি খেয়েছিলেন? কুইনিনের বদলে শিউলিপাতার রস—আরো কত-কি সব খেতে হয়—সেবারে বলেন নি?···তবে?

হরলাল আহারের পর, আচমনান্তে বিছানায় এসে বসলো। মানদা বললে—রতন কব্‌রেজ মশায় ও-বেলা এসে খুব দুঃখ করছিলেন।... তাঁর ব্যবসা নাকি এ-কয়দিনে অচল হ'য়ে পড়েছে। সবাই ডাক্তারবাবুর ওষুধ খায়, তাঁর বাড়ীতে আর কেউ যায় না। কিন্তু আপনার রঘুনাথপুর—মোল্লাপাড়ার লোকে একটা কচি ছেলেকেও কুইনিন খাওয়ায় না। তারা বলেছে—ভাস্কর হুকুম দিয়ে গেছে, সে ফিরে এসে যদি বলে, তবেই খাবো, নইলে নয়।

হরলাল মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—তোমারও কি সেই পণ মানু? তাই ওষুধের শিশিটাকে হাত দিয়েও একবার ধন্য করো নি বুঝি? বেচারী ডাক্তারেরও কু-তপস্যা বলতে হবে।

মানদা আস্তে-আস্তে বললে—কু-তপস্যা ডাক্তারের কি আমার,—সে মীমাংসা এখনো হ'য়ে ওঠে নি।

—তার মানে?

—যিনি উপদেশ দিয়ে বেড়ান, বে-আইনী যদি তাঁরই দ্বারা ঘ'টে যায়, তাহ'লে দোষ দেব কাকে?

রহস্যচ্ছলে হরলাল বললে—কিন্তু জানো—এটা আইন-ভঙ্গের যুগ?

—জানি, কিন্তু মনের আইন ভাঙা যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ!—তার কি আবার যুগ-অযুগ আছে না কি? আপনারই মুখে শুনেছিলাম—বাইরের এই আইন—শৃঙ্খল, বিনা দোষে বন্দীর তা ছিঁড়বার অধিকার আছে। কিন্তু মনোরাজ্যের আইন আলাদা, গড়া জিনিস সেখানে ভাঙে না কখনো।

—তুমি তো বেশ কথা জানো মানদা! শিখলে কি করে?

—বনের পাখী রাধাকৃষ্ণ আওড়ায় যেমন ক'রে।···কিন্তু পায়ে পড়ি আপনার, ভোরের পাখী ডাক্‌ছে, আপনি না চান, আমি কিন্তু বিশ্রাম চাইছি।

হরলাল পাশ-বালিশটা টেনে নিয়ে, বিপরীত দিকে পাশ ফিরে বললে —দুর্গা-দুর্গা !···আচ্ছা···

মানদার অসুস্থ দেহ হ'লেও, এত শীঘ্রই বিদায় নিতে ইচ্ছা ছিল না, অথচ হরলালের বিশ্রাম-উপভোগ একান্তই দরকার বিবেচনায় সে গৃহান্তরে চলে গেল।

একাদশীর চাঁদ কখন অস্তাচলে নিভে গেছে। ভোরের হাওয়ায় হরলাল ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ পাশের ঘরে গোলমাল হওয়ায় তার ঘুম ভেঙে গেল। দাওয়ায় আলো জ্বলছিল—ক্ষীণরশ্মি তার হরলালের ঘর থেকেই দেখা যাচ্ছিল। হরলাল শুন্‌লে—মানদা বলছে—ওঘর থেকে বড় দু'খানা কম্বল নিয়ে এসো কাকী, শীতে কাঁপিয়ে দিচ্ছে আমাকে।

হরলাল লাফিয়ে উঠে, দরজা খোলা দেখে ভিতরে ঢুক্‌লো।

মানদা জ্বরে কাঁপছে, রাইচরণের স্ত্রী তাকে চেপে ধরে বসে রয়েচে ;

হরলাল মানদার বিছানায় বসে বললে—যাও কাকী, আমার দু'খানা কম্বল আর ব্যাগখানা নিয়ে এসে চাপিয়ে দাও।···

রাইচরণের স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ব্যাগ ও কম্বল নিয়ে এলো ; হরলাল মানদার আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে বললে—শীত ভাঙ্‌লো মানু ?

মানদা কাঁপতে কাঁপতে বললে—আপনি আবার কেন এলেন ? রাত জাগলে আপনারও অসুখ হবে। শীত ভেঙেচে, আপনি যান।

হরলাল তো গেলই না, বরং ভালো ক'রে বসে বললে—যাচ্ছি,… কাকীমা! এক বাটী জল গরম ক'রে আনতে হবে। খেলেই কাঁপুনিটা থাকবে না আর।

মানদা অনুযোগ করতে লাগলো—যান আপনি। ম্যালেরিয়া জ্বরে এমন হ'য়েই থাকে। সকালতক্ এ-টুকু থাকবে না,—আপনি শুয়ে পড়ুন গে যান।

হরলালের চোখ দুটো জলে টল্ টল্ ক'রে উঠলো। কী নিবিড় শ্রদ্ধা, কত সুন্দর আন্তরিকতা!

হরলাল মানদার কপালে হাত রেখে বললে—বেদনা আছে?

—হ্যাঁ।

—টিপে দেব?

মানদা আরামে চোখ বুজলো।…তারপর বললে—ঘুম নেই চোখে?

—না।…তুমিই বলো মানু! ঘুম থাকা কি উচিত?

মানদা আর তর্ক করতে চাইলো না, বললে—তবে থাকুন। কিন্তু বড্ড পিপাসা, গরম জল আমি খেতে পারবো না, বমি হ'য়ে যাবে। কাকীকে বলুন,—একটুখানি ঠাণ্ডা জল…

হরলাল মানদার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। স্নিগ্ধস্বরে বললে—একটিবার যে খেতেই হবে লক্ষ্মীটি!…কাঁপুনি হচ্ছে কিনা!…কিন্তু এত অসুখ, অথচ লুকিয়ে-লুকিয়ে এতক্ষণ আমার সেবা করছিলে তুমি।…মনে করচো আমার খুব সুখ হ'ল?

মানদা চোখ বুজে রইলো। কোনো কথা কইলে না।

হরলাল ও রাইচরণের স্ত্রী বিনিদ্র থেকে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিলে।

প্রাতঃকাল হ'তে-হ'তেই সদর-দোরে ডাকাডাকি—দরজা খুলুন দিদিমণি!—ডাক্তারবাবু এসেচেন।

মানদা তখন জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য।

হরলাল দরজা খুলে দিলে।

ডাক্তারবাবু ভিতরে এসে রোগী দেখলেন। তারপর জ্বর-পরীক্ষা করে বললেন—খুব বেশী অসুখ। টাইফয়েড্ হ'তে পারে।

হরলাল মূক-বেদনায় চেয়ে রইলো।

ডাক্তার "শিশি পাঠিয়ে দিন" বলে বিদায় নিলেন।

হরলাল ডাকলে—মানু!

মানদা চোখ মেলে চাইলো। চোখ দু'টো রাঙা করমচা!

হরলাল জিজ্ঞাসা করলে—ডাক্তারবাবু ওষুধ দিতে চাইলেন। বড্ড অসুখ, এক শিশি খাও,...আমি বলছি।

মানদা সহসা হরলালের হাত দু'খানা চেপে ধ'রে, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলে উঠলো—তোমার পায়ে পড়চি,…গুরুর আদেশ অমান্য করতে আমি পারবো না।…পায়ে পড়চি তোমার। বলেই জোরে-জোরে হাঁপাতে লাগলো।

হরলাল আর কিছু বললে না। প্রগাঢ়-স্নেহে মানদার হাত দু'খানা চেপে ধ'রে তার রোগক্লিষ্ট মুখ-পানে একান্ত তন্ময়তায় চাইতে লাগলো। সামান্যক্ষণ এইভাবে থাকার পর রাইচরণের স্ত্রীকে বললে—ধনাই ঘোষের ছেলেটাকে বলে এসো তো কাকীমা! রতন কব্‌রেজ মশায়কে একবারটি খবর দিয়ে আসতে।…

মানদা চোখ চেয়ে বললে—জল! জল খাবো।

হরলাল জল দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখতে রাখতেই মানদা তার ডান-হাতখানা চেপে ধ'রে বললে—একবারটি কপালে হাত বুলিয়ে দাও!···কী ঠাণ্ডা হাত তোমার···আঃ···

হরলাল ডাকলে—মানু!

মানদা মাথা নেড়ে বললে—কখ্খনো খাবো না আমি। ও বিলিতি ওষুধ।···দেশের গাছ-গাছড়ায় যা তৈরী হয়,—তাই তো আমাদের আসল জিনিস।···

এম্‌নি সময় ডাক্তারী ওষুধের শিশিটা নিয়ে একজন লোক এলো এবং শিশি রেখে, ছোট্ট একখানা কাগজ হরলালের হাতে দিলে।

হরলাল পড়লে—"সাক্ষাৎ-প্রার্থিনী অরুন্ধতী"—

লোকটি অপেক্ষা করছিল। হরলাল তাকে বললে——আচ্ছা যাও।

মানদা জিজ্ঞাসা করলে—কে লিখেচে? রাণীদিদি?

—হ্যাঁ। কিন্তু রাণী আবার—রাণী—'দিদি' হ'লেন কবে থেকে?

—আপনার ক'ল্‌কাতা যাওয়ার পর থেকেই।···তিনিই বলেছিলেন।

—কি বলেছিলেন—'দিদি' বল্‌তে?

—হ্যাঁ। কিন্তু কি লিখেচে—আপনাকে যাওয়ার জন্যে বুঝি?

—হ্যাঁ।

—তবে যান না। দেখা ক'রে আসুন।···

—যাবো এখন।···তোমাকে এ-অবস্থায় ফেলে, আমি তো কোনোখানেই যেতে পারি না মানু!

মানদা আবার চোখ বুজলো। আস্তে-আস্তে বললে—কর্ত্তব্যহানি হবে বুঝি?···কিন্তু ওটাও কর্ত্তব্য।

হরলাল দু'খানা হাতে মানদার মুখখানা চেপে ধ'রে হর্ষ ও উদ্বেগের সঙ্গে বলে উঠলো—শুধু কর্ত্তব্যই কি সংসারে আছে মানি?…আর কিছু থাক্‌তে নেই? তুমিও আজ কর্ত্তব্যকেই বড় ভাবচো?

—কিন্তু রাণীদিদি আপনাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসেন। জগন্নাথের চেয়েও বেশী।

হরলাল ব্যগ্রকণ্ঠে বললে—তা আমি জানি মানু!—কিন্তু তোমার চেয়েও কি বেশী?

—"যাও…একে নিজের জ্বালায় ম'রে যাচ্ছ!"…ব'লে মানদা মুখখানা গম্ভীর ক'রে তুললে।

রতন কব্‌রেজ এসে মানদার নাড়ী-পরীক্ষান্তে অভিমত প্রকাশ করলেন—ভয়ের কারণ নেই। তিন-দিনেই আরাম হ'য়ে যাবে।

হরলাল ডাক্তারের অভিমতটা প্রকাশ করলে না। বললে—কিন্তু কুইনিন দিয়ে তো?

দাঁতে জিভ্‌ কেটে, কব্‌রেজ মশায় বললেন—পাগল!……কুইনাইন ছোঁব না আর—জীবনে না।

—তাহ'লে শীগ্‌গীর ওষুধটা পাঠিয়ে দেবেন।…ও-বেলায় আসা চাই কিন্তু।

কব্‌রেজ মশায় "নিশ্চয়ই আস্‌বো" বলে চলে গেলেন। মানদা বললে—ভাগ্যিস্‌ ডাক্তারী ওষুধ জোর ক'রে আমাকে খাওয়াতে পারেন নি; নইলে বেশী-বেশী ভুগ্‌তে হ'ত।

আবার লোক এলো—পত্র নিয়ে।

হরলাল পড়লে—

—"আমি বিপন্না,—দয়াক'রে একবারটি দর্শন দেবেন।"

মানদা জুলুম করতে লাগলো—যান বলচি এক্ষুণি।···দিদি হয়তো ভয়ানক বিপদে পড়েছেন। নইলে আপনার আসা-সংবাদ পেয়েও তিনি নিজে এলেন না কেন?

হরলাল স্মিতমুখে বললে—তিনি যে রাণী।

মানদা বললে—সে-কথা একশোবার,...অন্যের কাছে না হলেও আপনার কাছে।

হরলাল বললে—তার মানে?

মানদা বললে—সব কথার মানে ক'রে দেওয়া আমার ব্যবসা নয়। আপনিই বুঝে দেখুন না।···কিন্তু আমি জ্বরে পড়েছি বলে তোমাদেরও যে রান্নাবান্না সব মাথায় উঠলো কাকী!···কাল থেকে ইনি না খেয়ে রয়েচেন।···

প্রায় পনের মিনিটকাল কারুর সাড়াশব্দ মিললো না। যে-যার ভাবনায় বিভোর হ'য়ে ছিল।

হঠাৎ এক-সময় মানদা বলে উঠলো—সে বেচারীকে আর কত শাস্তি দিতে হবে?···যান-না একবারটি।

হরলাল আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে—তোমায় একলা ফেলে রেখে?

—কেন আমার কি অন্তিম উপস্থিত নাকি?

হরলাল বললে—যা-তা বকো না মানদা!···বিশেষ আবশ্যক থাকলে সে নিজেই হাজির হ'ত।...আমি কারুর ডাকাডাকির ধার ধারি না।

—"এই সাদা কথাটুকুই বুঝিনি আগে। কিন্তু বিশেষ আবশ্যকই বটে,—তাই হাজির হ'তেও বাধ্য হ'লাম।"···

হরলাল অভিনন্দন জানিয়ে বললে—এসো রাণী।...তোমার মুখে ভর্ৎসনা শুন্‌তে আমার ভারি ভালো লাগে।...তাইতো সাধ ক'রে অপরাধ করি।

অরুন্ধতী, মানদার অপর-পার্শ্বে বসে, তার কপালে হাত দিয়ে বললে—ডাক্তারবাবু বললেন—ভুগ্‌তে হবে কিছুদিন।

হরলাল হেসে উঠে বললে—আর কব্‌রেজ মশায় বললেন—তিনদিনে আরাম হবে।...দিশী-বিলিতীর তফাৎ তো এইখানেই।...ওসব ডাক্তারী মতটা বিদেশী ভাবে না চালিয়ে দিশীর অনুকরণে চলতে দাও রাণী।...দেশের দশের সকলকারই উপকার বেশী হবে। কিন্তু আমি এসেচি—এখবর তুমি কার কাছে পেলে ?

অরুন্ধতী বললে—আমার চরের কাছে। আসামীর গতি-বিধির দিকে নজর রাখা শান্তিরক্ষকের কর্ত্তব্য। কিন্তু বাজে কথা থাক। এবারে যা বলবো, সেটাকে নিছক ঠাট্টা ভেবে যদি অন্য কথা বলেন, তাহ'লে তুনিয়ায় বেঁচে থাকাটাই আমার পক্ষে প্রকাণ্ড এক বিড়ম্বনা হ'য়ে উঠবে।—কথা আর অন্য কিছু নয়, আমার সেই ম্যানেজারবাবুর বিরুদ্ধে অনেক রকম নালিশ এসেচে।

'হো হো' শব্দে হেসে, হরলাল বললে—আমার মৃত্যু হবে কবে—এই কথাটাই খালি জানতে পারিনি রাণী,—বাকী যা—সব আমার জানা হ'য়ে গেছে।...গরীবের কথা টাট্‌কা-টাট্‌কা বড়লোকদের মনে লাগে না কিনা।

অরুন্ধতী গম্ভীর হ'য়ে বললে—আপনার সেকথা যদি ফলতো, তাহলে যতই করি, অন্ততঃ আজকের এই নির্লজ্জতা থেকে আমি আমাকে

মুক্ত ক'রে রাখতাম। যেচে আপনাকে আপন কৃতকর্ম্মের দুর্গতি জানাতাম না। ম্যানেজারকে সেখানকার প্রজারা চায় না।

—কিন্তু তার তো কারণ আছে একটা?

—হ্যাঁ তা আছে বই কি।...তিনি প্রজাপীড়ন ক'রে অর্থ সঞ্চয় করছেন। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করেননি, একথা আমি ভালোই জানি।

—কেমন ক'রে জান্‌লে?...ষড়যন্ত্রের এ-ও যে একটা প্রমাণ!

—হ'তে পারে, কিন্তু পীড়ন করা অর্থ—তিনি কড়ায়-গণ্ডায় আমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন এবং পত্রে আরো ভরসা দিচ্ছেন—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, টাকার জন্য চিন্তা নাই।"...বাইরের অবস্থা দেখলে—তিনি যে আমার হিতৈষী—তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।...এখন আপনার আদেশ চাই—এক্ষেত্রে কি আমার কর্ত্তব্য?

হরলাল গম্ভীরভাবে জবাব দিলে—রাজার কর্ত্তব্য রাজা জানে। প্রজার এ-বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া দুঃসাহসিকতা।

অরুন্ধতী মলিন হ'য়ে গেল। একান্ত অপ্রতিভভাবে বললে—আপনার মুখেও কি এই কথাই শুনতে হবে আমাকে? হতভাগীর কি কেউ নেই তাহ'লে—আজ তাই বুঝে রাখবো?

হরলাল অত্যন্ত ব্যথা বোধ করলে। আপন হাতে রাণীর হাত ধ'রে আদর ক'রে বললে—অশ্রু মুছে ফেলো অরুন্ধতী! সাধারণ মেয়েদের মতই যদি তোমার স্বভাব হবে, তবে অসাধারণত্ব লাভ করলে কেন? 'প্রজাপীড়ন' কথাটা রাজাদের সুনামের প্রধান ও প্রথম অন্তরায়। রাণী হয়েও যদি এরই জন্যে পরামর্শ চাও, তাহ'লে রাণী হওয়াটাই যে তোমার ঝকমারি।

অরুন্ধতী বললে—তিনি সত্যিসত্যিই প্রজাপীড়ন করছেন কি না করছেন সেটাও তো আমাকে জানতে হবে। সব কিছুরই ভালোমন্দ আছে। এক কথায় তাঁকে অবিশ্বাসী বা অত্যাচারী বলবার অধিকার থাকা আমার তো উচিত নয়।

আনন্দের উচ্ছ্বাসে হরলাল বলে উঠলো—অরুন্ধতী, স্বীকার করলাম আজ, তুমি সত্যিই রাণী। আমার বুদ্ধি আর তোমার বুদ্ধির তারতম্য ঠিক তেমনি,—রাজার আর প্রজার বুদ্ধির মধ্যে যে তারতম্য থাকে।... কিন্তু সেখানে একজন বিশ্বাসী লোক পাঠাতে হবে তো?

—তাও পাঠিয়েচি। আমি চাই ম্যানেজারকে সদরে নিয়ে এসে, যাকে পাঠিয়েচি, তাকেই সেখানকার কাজ দিই।

—ম্যানেজার যদি তাতে অপমানিত বোধ ক'রে কাজ ছেড়ে দেন?

—সেজন্যে ভাবনা নেই। যদিই দেন, আমাকে বেগ পেতে হবে না।—রাইচরণ কাকাকেই আমি ম্যানেজার তৈরী ক'রে নেব।

—তাহলে রাইচরণ কাকাকেই ম্যানেজারের কাছে তার কর্ম্মের পদ্ধতিগুলো গুপ্তভাবে দেখে আসার ভার দিতে হ'ত। অন্য লোক না পাঠিয়ে—

অরুন্ধতী হঠাৎ হরলালের পদধূলি নিয়ে বলে উঠলো—আপনার আশীর্ব্বাদে আমি তা'ও করেছি। কাল রাত্রেই রাই-কাকা এসেছিলেন,—বেচারীকে জোর ক'রে পাঠালাম, এক মিনিট বাড়ী আসতেও দিতে পারি নি।

হরলাল বললে—এমনভাবে তিলে-তিলে পরাজয় কোনোখানে

আমার হয় নি অরুন্ধতী।—তুমি যে এতবড় শক্তি রাখো, আমি তা একটুও আভাষ পাই নি। সামান্য এক-হপ্তার ভেতর জঙ্গল কেটে অমরাবতী বানিয়ে দিতে পারে যে,—বিশ্বকর্ম্মার আশীর্ব্বাদ আর বিশ্বেশ্বরের আশীর্ব্বাদ শুধু তারই পাওনা। কিন্তু সত্যি-কথা বলো রাণী,—অতগুলো ইট্ তৈরী হচ্ছে কেন?···আরো মন্দির হবে?

অরুন্ধতী হেসে বললে—সেই ভাবনাতেই বুঝি আপনার ঘুম হয় না মন্দিরকে আপনি বড্ড ভয় করেন—না?

হরলালও হাস্‌তে হাস্‌তে বললে—মন্দিরকে ভয় করিনা রাণী,—মন্দির-প্রতিষ্ঠাত্রীর খেয়ালকে বড্ড ডরাই। সুধা-সমুদ্রের তীরে ব'সে ন্যায়ালঙ্কারের সভা-সমিতি আর হোম-যজ্ঞকে বড্ড ভয় আমার।

নতমুখে অরুন্ধতী বললে—ইটগুলো তৈরী হচ্ছে কেন জানেন?···খুব বড়-রকমের একটা ডাক্তারখানা খুলবো। বড়-বড় পুকুরগুলোর পঙ্কোদ্ধার ক'রে পাকা ঘাট তৈরী করে দেব, ইন্দারা গড়তেও ইটের দরকার হবে।

হরলাল বিস্ময়ের উপর দারুণ বিস্ময় নিয়ে চাইতে লাগলো।

অরুন্ধতী বললে—আজকে ডাক্তারবাবুকে বলে দিয়েছি, কব্‌রেজী আর ডাক্তারী—দুটো এক সঙ্গে না জান্‌লে আমার এখানে সুবিধে হবে না। যেমন ভাবেই মতামত দিন, ওষুধটা দিশী হওয়া চাই।... খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

উচ্ছ্বসিত হ'য়ে হরলাল বলে উঠলো—একদিনে সব কথা শুনিয়োনা রাণী, দম্ ফেটে মারা যাবো।···মানদার অসুখ বলে তোমার চিঠির অপমান করেছিলাম, কিন্তু তুমি নিজে এসে তার দ্বিগুণ অপমান আমার ঘাড়ে চাপিয়েছ···